একাত্তরের রণাঙ্গন
অকথিত কিছু কথা

নজরুল ইসলাম

প্রকাশনার তিন দশক

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
প্রথম সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ
গৌতম চক্রবর্তী

বর্ণবিন্যাস
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
৩০০.০০ টাকা মাত্র

EKATTARER RANANGAN AKATHITA KICHU KATHA
by Nazrul Islam
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price : Tk. 300.00 only US$ 10.00.

ISBN 978-984-404-412-8

উৎসর্গ

উনিশ শ একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রসবিনী বাংলার যে সব বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নারীপুরুষ দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সব মুক্তিযোদ্ধাসহ জানা-অজানা অগণিত বীর শহীদদের মহান স্মৃতির উদ্দেশে——

মুখবন্ধ

পেশাগতভাবে সাংবাদিক, লেখক নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের অধীন মুক্তিবাহিনী সদর দপ্তরে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর জনসংযোগ কার্যক্রম দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

'একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা' বইটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর সংকলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপরে লেখা বইগুলোর সাথে আর একটি সংযোজন। এই বইটিতে লেখক মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যা দেখেছেন সততা এবং আন্তরিকতার সাথে তাই লিখেছেন। সব পাঠকই যে সকল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন, এমন দাবি তিনি করেননি এবং বাস্তবে সেটা সম্ভবও নয়। তবে বইটিতে জানা-অজানা অনেক তথ্য আছে যা পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

এই বইটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে জানবার জন্য পাঠকদের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের আরও উৎসাহিত করবে, এই আশা নিয়ে আমি বইটির সাফল্য কামনা করি।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকার
ডেপুটি চীফ অব স্টাফ
মুক্তিবাহিনী।

সবিনয় নিবেদন

একজন কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ কিংবা রাজনৈতিক প্রতিবেদন রচনা ছাড়া গল্প কিংবা সাহিত্য প্রবন্ধ রচনা করার অভ্যাস তেমন ছিল না। ভাষা এবং ভাষার ব্যবহার-জ্ঞান সম্পর্কে আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সদা সচেতন এবং ভীত ছিলাম। অর্থাৎ 'সদা ভয় সদা লাজ করিতে পারি না কাজ পাছে লোকে কিছু বলে' এমনই একটি ভয়-লাজ সর্বদাই আমার লেখালেখির উন্মুখ কামনা তাড়িত করেছে। অঙ্কুরিত হতে দেয়নি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক বা প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (পরবর্তীতে জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানীর দফতরে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার সুবাদে আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য তথ্য, নথিপত্র ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্যাদি, সংবাদ, ছবি এসেছিল—সেসব সেদিন যত্নসহকারে সংরক্ষণকরণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হতে পারতো। কিন্তু নির্বোধ আমি। সেদিন একটিবারও মনের কোণে এ ভাবনা উদিত হয়নি যে, মুক্ত স্বদেশে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করব। যাক এটা আমার অযোগ্যতা।

জেনারেল ওসমানীর দফতর থেকে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে আমার মূল পেশা সাংবাদিকতায় আবার যোগ দেওয়ার পর অনেক সহকর্মী বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে বার বার তাগিদ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি বই কিংবা কিছু একটা লেখার জন্যে। আমার চেতনার বরফ গলেনি।

দৈনিক বাংলার তৎকালীন সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আহমেদ হুমায়ূন, নগর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফজলুল করিম, তৎকালীন চীফ রিপোর্টার সুলেখক মনজুর আহমদ, উদীয়মান তরুণ কবি হাসান হাফিজ, সুযোগ্য সহকর্মী শওকত আনোয়ার, অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রী মিলন নাথ, তরুণ প্রতিভাবান সহকর্মী খায়রুল আনোয়ার মুকুল, *দৈনিক আজকের কাগজ*-এর রিপোর্টার আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মেজবাহ আহমেদ, সাপ্তাহিক *পরিবর্তন*-এর সম্পাদক আবু মোহম্মদ বাবুল, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ শাহজাহান (*দৈনিক ইত্তেফাক*), রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন বিশ্বস্ত সহচর প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা শ্রদ্ধেয় নুরুল

ইসলাম, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের তৎকালীন বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলী (বর্তমানে এম পি) ও নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা বহু গ্রন্থের প্রণেতা মোস্তফা সারোয়ারসহ আমার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে আমি চিরঋণী আমাকে তাগিদের পর তাগিদ দিয়ে এ বই লেখাবার জন্য।

একটি ঘটনা না বললে নয়। একদিন দৈনিক বাংলার রিপোর্টার্স মিটিংয়ে তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আহমেদ হুমায়ূন বললেন, নজরুল আপনি জেনারেল ওসমানীর পি আর ও হিসেবে কাজ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। অথচ এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছুই লিখলেন না, একটি বইও লিখলেন না! আপনাকে দৈনিক বাংলার সাহিত্য পৃষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু লিখতেই হবে এটা আমার নির্দেশ। আপনি যা লিখবেন আমি তা-ই ছাপাব। আগামী সপ্তাহ থেকেই আমি লেখা চাই। শুধু এটুকু বলেই তিনি থামলেন না। তাঁর বুকের পকেট থেকে একটি দামী বলপেন খুলে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, এ কলম পকেটে থাকলে লেখার কথা মনে থাকবে। এ রকম একটি প্রচণ্ড অনুরোধ ধাক্কা ও অনুপ্রেরণা না দিলে কোনোদিন আমার দ্বারা হয়ত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বই লেখা সম্ভব হতো না।

মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ শ্রদ্ধাভাজন এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকার পরম ধৈর্যসহকারে আমার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে তাঁর মূল্যবান মতামত রেখেছেন যা আমার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

আমার অসাবধানতা কিংবা অজ্ঞতাবশত কোনো ভুল তথ্য কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারো প্রতি কোনো পীড়াদায়ক মন্তব্য বা শব্দ উল্লেখ করে থাকলে তার জন্য আমি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী। শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী মনজুর আহমদ, শওকত আনোয়ার, কবি হাসান হাফিজ, রফিকুল ইসলাম রতন প্রমুখের প্রেরণা ও সহযোগিতায় প্রগতিশীল ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার অনেক গ্রন্থের স্বনামধন্য প্রকাশক শ্রী মিলন নাথ আমার বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

নজরুল ইসলাম

॥ এক ॥

১৯৭১ সালের মে মাস। হয়তো মাসের মাঝামাঝি সময় ছিল তখন।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় আমার কর্মস্থল *দৈনিক ইত্তেফাক* ভবনের উপর দখলদার বাহিনীর ট্যাংকের গোলাবর্ষণে ভবনের কিছুটা অংশ বিধ্বস্ত হয়েছিলো। সারাদেশ তখন তছনছ, উৎক্ষিপ্ত সকল মানুষ। এমন একটি পরিস্থিতিতে বৃদ্ধা মা, আমার স্ত্রী এবং মাত্র ঊনচল্লিশ দিন বয়সের শিশু পুত্রসন্তানকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করছিলাম। ২৫ মার্চ ভয়াল রাতের বিভীষিকাময় স্মৃতি নিরন্তর আমাকে পীড়িত করে তুলতো। এক গভীর বেদনা, উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম।

গ্রামের লোকজন আমাকে ঘিরে ধরতো। চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতো খবর কি? জানতে চাইতো কোনো প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে কিনা। প্রতিদিন স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী আর বিবিসি'র খবর শুনতাম। সকালে-বিকেলে আমাদের বাজারে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞজনদের বিশ্লেষণ শুনতাম।

১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে পাকিস্তান থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য ও আর্মি এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন বাঙালি সেনা অফিসারকে জেনারেল ওসমানী স্বাগত জানান।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সরকারকে বলা হতো স্বাধীন বাংলার সরকার—আমাদের সরকার। বাজারে এখানে-ওখানে লোকের জটলা। পরিচিত-অপরিচিত কোনো লোক কোনো দিক থেকে এলেই বাজারের লোক তাকে ঘিরে ধরতো, জিজ্ঞেস করতো কোত্থেকে এলেন, খবর কি বলুন। এমনই আশা-নিরাশার এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে আমার দিনগুলো কাটছিল গ্রামের বাড়িতে। প্রতিদিনই একটি নিত্যনতুন গুজব শুনতাম। ... দিন পাক বাহিনী আসবে। মেয়েদের উপর নির্যাতন চালাবে।

এলাকার পাকিস্তানপন্থী লোকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ছিল প্রচণ্ড আস্থাহীনতা। এদের সম্পর্কে সবাই নিজ নিজ কৌশল অনুযায়ী সতর্ক থাকতো,

এদেরকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতো, এদের সামনে তেমন কোনো কথা বলতো না। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলতো, এরা পাক বাহিনীর দালাল, রাজকার। পাক বাহিনীর কাছে এরা স্বাধীন বাংলার সমর্থকদের সম্পর্কে গোপন খবর দেয়। এরা পাক বাহিনীর স্পাই। সময় এলে এরা স্বাধীন বাংলার সমর্থকদের পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেবে।

লোকজন শুনেছিল মুজিবনগর সরকার সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈন্য, সাবেক ইপিআর-এর বাঙালি জওয়ান, বাঙালি পুলিশ নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেছেন। গ্রামের তরুণ যুবক ছেলেরা দলে দলে যাচ্ছে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্যে। এরই মধ্যে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে।

গ্রাম এবং হাট-বাজারগুলোতে প্রতিরোধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আমরা জনগণকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আগমন, অবস্থান, থাকা-খাওয়া, যোগাযোগ গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। এমনি অবস্থায় একদিন বিকেলে আমাদের বাড়ির রাস্তায় ছোটাছুটি ও হৈ চৈ শুনে বের হয়ে দেখলাম লোকজন আগুন আগুন বলে চিৎকার করে দক্ষিণ দিকে ছুটছে। কিছুদূর গিয়ে দক্ষিণ দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকেরা বলাবলি করছে—নরসিংদীতে আগুন জ্বলছে, পাটকল, খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দিচ্ছে।

নরসিংদীর আকাশে কালো ধোঁয়া। মাঝে মাঝে আগুনের লেলিহান শিখা ঝিলিক দিয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল নরসিংদী থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল উত্তরে আমাদের এ গ্রামে দাঁড়িয়েও।

লোকজন বলাবলি করছিল, এর পরই মনোহরদী-চালাকচরে আসবে পাক আর্মি। রাস্তার পাশের বাড়িঘরের লোকজন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র, সোনাদানা, খাদ্যদ্রব্য, হাঁড়িপাতিল, কাপড় ইত্যাদি যোগাযোগবিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলোয় বসবাসরত পরিচিতজনদের বাড়িতে সরিয়ে রাখতে শুরু করলো। এসব গ্রামের মানুষগুলো ছিল এই ঘোর বিপদের দিনে খুবই সহানুভূতিশীল। বাড়ি ছেড়ে আসা লোকজনকে তারা অত্যন্ত আদরের সাথে গ্রহণ করেছিলো। শোনা যায়, মানুষের বিপদে সাপও নাকি কামড় দেয় না গায়ের উপর মানুষের পা পড়লেও। তখন মানুষের মধ্যে শত্রু-মিত্র বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সকলের কমন শত্রু ছিল একমাত্র পাকিস্তানী আর্মি আর তাদের এদেশীয় দোসররা।

আমি গ্রামে খুব নিরাপদ বোধ করতাম না। কারণ আমি ছিলাম একজন সাংবাদিক এবং কাজ করতাম *দৈনিক ইত্তেফাকে*। আর তখনকার দিনে *ইত্তেফাক* মানেই আওয়ামী লীগ—এ ধারণা ছিল সকলের মাঝে। সে হিসেবে লোকজন আমাকেও চিহ্নিত করতো আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক বা একনিষ্ঠ কর্মী বলে। মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রামের বাড়িতে

আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে কিংবা আমার গ্রামে পাক আর্মির আক্রমণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং আর্মি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। লোকজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে বলতেন, তুমি দেশ ছেড়ে কোথাও নিরাপদ স্থানে চলে যাও। তুমি না হয় মুজিবনগরে চলে যাও।

আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কেমন করে যাব, টাকা পাব কোথায়? ওখানে গিয়ে থাকা-খাওয়ার টাকা পাব কোথায় ইত্যাদি ভাবছিলাম। তদুপরি আমার স্ত্রী ও তার কোলে প্রায় দেড় মাস বয়সের শিশুপুত্র এবং আমার বৃদ্ধা বিধবা মায়ের কি হবে—এও ছিলো এক ভাবনার বিষয়।

আমার কিন্তু আপন মা ছিলেন না। আমার জন্মের ছয় মাস পর আপন মার মৃত্যু হলে আমার নিঃসন্তান জেঠিমা আমাকে লালন-পালন করে বড় করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি আমার মা ছিলেন। এই বৃদ্ধা বিধবা মা এবং দেড় মাসের শিশুপুত্রসহ স্ত্রীকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে গেলে তাঁদের অবস্থা কি হবে—একথা ভেবে মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তাম। একই সঙ্গে হৃদয়ে ছিল পরাধীনতার জ্বালা। ভাবতাম, যে কোনো মূল্যে পাক আর্মিকে তাড়াতেই হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে।

এমনি পরিস্থিতিতে একদিন সন্ধ্যায় তদানীন্তন ইপিআর-এর অফিসার মেজর হারুনের নেতৃত্বে ইপিআর-পুলিশ মিলিয়ে আট-দশ জনের একটি দল এসে উপস্থিত হয় চালাকচর বাজারে। তারা একটি ট্রাকে করে নরসিংদীর দিক থেকে এসেছিল। পরে শুনেছিলাম এরা পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে পিছু হটে যায়। এরপর সুবিধাজনক এলাকায় অবস্থান নেয়ার জন্যে এ দলটিকে পাঠানো হয় মনোহরদীর চালাকচর এলাকায় ভৈরব বাজার, কটিয়াদী, মঠখোলা, টোক ও কাওলাইদের মধ্যে নদীপথে পাকিস্তানী আর্মির সম্ভাব্য চলাচল প্রতিরোধ করার জন্যে।

সন্ধ্যার আঁধারে চালাকচর বাজারের অদূরে ট্রাক থামিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল এবং একটি ছোট চিঠি দিয়ে একজন লোক পাঠানো হয়েছিলো আমার কাছে। আমার নাম উল্লেখ করেই চিঠিটি লেখা। চিঠির নিচে লেখকের নাম ছিল না। ধারণা করেছিলাম শরপুরের মান্নান ভূঁইয়া (বিএনপি সরকারের শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী) কিংবা অন্য কোনো পরিচিতজনের লেখা। চিঠিতে লেখা হয়েছিলো এই দলের নিরাপদে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং শত্রু বাহিনী চলাচলের প্রতিরোধ-কাজে সহযোগিতা করার জন্যে। এদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি রাইফেল ও বন্দুক। এ সময় আমি হাফিজপুর গ্রামের আবদুর রশীদ (মরহুম), ডাক্তার রমিজ উদ্দীন ও অন্যান্য স্থানীয় রাজনৈতিক যুব-কর্মীদের সঙ্গে বাজারে বসে গল্প করছিলাম।

চিঠি পড়ার পর মাথায় বাজ পড়েছিল। এতগুলো লোককে কোথায় জায়গা দেয়া হবে? তাদেরকে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ারই বা ব্যবস্থা করা হবে কিভাবে? শেষে স্থির হলো চালাকচর বাজার থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে সাগরদীর রাজ্জাক মোড়লের বাড়িতে অন্তত সে রাতের মতো থাকার ব্যবস্থা করা হোক। পরে স্থির হবে কোথায় তাঁরা থাকবেন। রাজ্জাক মোড়ল ছিলেন সে অঞ্চলের একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক।

এ বাহিনীকে চালাকচর বাজারে চা খেতে বসিয়ে রেখে আমি ও রশীদ ভাই একটি মোটর সাইকেলে চড়ে রাজ্জাক মোড়লের বাড়ি গিয়ে তাঁর বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর দলকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে সম্মত করাই।

দরাজ-দিলের মানুষ রাজ্জাক মোড়ল রাজি হন মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিতে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দশ-বারো জনের জন্যে রান্না চড়াতে অন্দরমহলে নির্দেশ দেন। বড়ো বাংলাঘরে বিছানারও ব্যবস্থা করা হয়। এরপর চালাকচরে ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীকে নিয়ে আমরা আবার সাগরদী রাজ্জাক মোড়লের বাড়িতে যাই এবং তাঁদেরকে রাজ্জাক মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

এদের খাবার যোগানোর জন্যে আমরা স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এরই মধ্যে একজন স্থানীয় বামপন্থী নেতা এ বাহিনীকে হাত করে তার অধীনে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। এলাকার কিছু সংখ্যক ডাকাত সংগ্রহ করে এ দলের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীকালে কটিয়াদী ও মনোহরদী থানা আক্রমণ করে পুলিশের বন্দুক-রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। তবে এই দল নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি। মুক্তিযুদ্ধের পরিবর্তে মঠখোলা, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া ও হোসেনপুর, বাহাদিয়া, মির্জাপুর ইত্যাদি হিন্দু ব্যবসায়ী প্রধান এলাকায় যে সব কাজ করা হয়েছিলো—তার বিরুদ্ধে মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে মঠখোলা, কাওরাইদ এলাকার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এই বামপন্থী নেতাকে ধরে আটকিয়ে রাখার জন্যে। জানা যায়, ওই বামপন্থী নেতা তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এ সুযোগে এই বাহিনীকে দিয়ে শেষ করে দেয়ার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। আর এ তালিকায় আমিসহ অনেকেরই নাম ছিল বলে জানতে পেরেছিলাম।

॥ দুই ॥

এমনি এক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির হন শ্রীপুরের রহমত আলী (বর্তমানে এমপি)। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদের একজন অতি বিশ্বস্ত রাজনৈতিক কর্মী। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ছায়ার মতো থাকতেন। মুজিবনগর সরকার গঠনের সময়ও তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেই ছিলেন। সেই রহমত আলী কেমন করে মুজিবনগর বা কলকাতা থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে প্রবেশ করে ঢাকায় খোঁজ নিয়ে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির! আমার কাছে তাঁর এই উপস্থিতি অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার গভীর পূর্বপরিচয় থাকলেও তিনি এর আগে কোনোদিন আমাদের বাড়ি আসেননি কিংবা তাঁর কাছে আমার বাড়ির ঠিকানাও ছিল না। বাড়িতে তিনি আমার সঙ্গে কুশল বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো কথা বলেননি। পরদিন চলে যাওয়ার সময় বাজারে যাওয়ার পথে এক বড় পুকুরের পাড়ে আমাকে নিয়ে বসে একান্তে বললেন এতদূর থেকে এই ভয়াবহ বিপদের

মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের বাড়ি আসার কারণ। বললেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব পাঠিয়েছেন আমাকে। *ইত্তেফাকে*র সিরাজউদ্দীন হোসেন, সৈয়দ শাহজাহান ও আপনাকে মুজিবনগরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচার কাজের জন্যে আপনাদের একান্ত দরকার। সিরাজউদ্দীন হোসেন ও সৈয়দ শাহজাহানের সঙ্গে আমার তেমন জানাশোনা নেই। আপনি ঢাকায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগরতলায় চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাদেরকে মুজিবনগরে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এ কথা পৌঁছে দিয়ে রহমত আলী সাহেব মিলিয়ে গেলেন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে মনের দিক থেকে আনন্দ ও গর্ববোধ থাকলেও ভাবনার অন্ত ছিল না। ওই একই চিন্তার কালো মেঘ মনের আনন্দ-আকাশকে অজানা আশংকায় আচ্ছন্ন করে দেয়। স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধা বিধবা মায়ের কি হবে? বাড়িতে মা ও স্ত্রীকে একথা বললাম না। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এই মেহমান এমন বিপদের দিনে কোথা থেকে কেন এসেছিলেন। বলেছিলাম, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইত্তেফাক ভবনে বোমা ও ট্যাংক হামলার পর আমার আর কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে আমার সন্ধানে বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন। বেঁচে আছি নিজ চোখে দেখে চলে গেছেন।

মা ও বউ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আক্ষেপ করে বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে দিলে কেন? না হয় আর ক'টা দিন বেড়িয়ে যেতেন।

বললাম, এখন বেড়াবার সময় নয়। তারও তো বাড়ি, বউ-ছেলেমেয়ে আছে। বলে গেছেন ঢাকায় গিয়ে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে।

মা এবং আমার স্ত্রী একসঙ্গে আঁতকে উঠে বললেন, এ পরিস্থিতিতে ঢাকা যাবে কেমন করে? ঢাকায় গিয়ে দরকার নেই। বাড়িতে না খেয়ে বসে থাকো। মরতে হয় সবাই একসঙ্গে মরবো।

বললাম, তা হয় না। ঢাকা একবার যেতেই হবে। কারণ বাসায় ট্রাংক রয়ে গেছে। ট্রাংকের ভেতর বহু মূল্যবান রাজনৈতিক কাগজপত্র, নানা খাতাপত্র রয়েছে। এতে আমার বাড়ির ঠিকানা সবই আছে। এসব পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে পড়লে ওরা বাড়ি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে। সবাইকে মেরে ফেলবে।

একথায় ভীত হয়ে শেষ পর্যন্ত মা এবং স্ত্রী রাজি হলেন আমার ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে।

মে মাসেই ঢাকায় এসে শাহজাহান ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি সেগুনবাগিচাস্থ তৎকালীন মহিলাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র *ললনা*র অফিসে। শাহজাহান ভাইয়ের কাছে রহমত আলীর বক্তব্য খুলে বললাম। শাহজাহান ভাই একবাক্যে রাজি হলেন মুজিবনগর যেতে, সঙ্গে সাপ্তাহিক *ললনা*র কর্মাধ্যক্ষ আখতার হোসেনও। স্থির হলো আমি ও শাহজাহান ভাই সিরাজ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাঁকে তাজউদ্দীন সাহেবের আমন্ত্রণের কথা জানাবো।

তাই করলাম। পরদিন সকালে আমি ও শাহজাহান ভাই *ইত্তেফাকে*র সে সময়কার বার্তা ও নির্বাহী সম্পাদক সিরাজউদ্দীন হোসেনের চামেলীবাগস্থ বাসায় গিয়ে

তাজউদ্দীন সাহেবের ইচ্ছের কথা জানালাম এবং অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গে মুজিবনগর যাওয়ার জন্যে। সিরাজ ভাই আমাদের কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। কোনো কথা বললেন না। অভ্যেস অনুযায়ী সিগারেট টেনে চললেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে বাইরে কেউ কোথাও আছে কিনা তা দেখে নিয়ে শেষে কিছুটা গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যাব কেমন করে? তোদের একজন ভাবী আছে পূর্ব-পশ্চিম চেনে না। আট'ন জন ছেলে আছে। আমার চাকরি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি চলে গেলে এদের কোথায় রেখে যাব, এরা কি করে বাঁচবে? তোরা চলে যা। আমার যাওয়া হবে না। তাজউদ্দীন সাহেবকে গিয়ে আমার অবস্থার কথা বলিস। তাঁকে বলিস আমি সর্বান্তঃকরণে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আছি। সবাই এখান থেকে চলে গেলে চলবে কেমন করে? এখানেও তো অনেক কাজ আছে। খবরাখবর সংগ্রহ করা, যারা আছে এবং থাকবে তাদের সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করার কাজ। তাজউদ্দীন সাহেবকে বলিস, এখান থেকে আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব আমি সবই করবো। তাঁর সঙ্গে যেভাবেই হোক যোগাযোগ রক্ষা করবো। খবরদার এসব কথা যেন আর কাউকে বলিস না। দেয়ালেরও কান আছে। জানাজানি হলে এখানে থেকেও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে তোর ভাবী ও ছেলে-সন্তানসহ।

আমরা অনেকটা হতাশ হয়েই চলে এলাম।

এরপর সাপ্তাহিক *ললনা* অফিসে গিয়ে আমি, শাহজাহান ভাই ও *ললনা*র আখতার সাহেব একত্রে বসে স্থির করলাম যে, শাহজাহান ভাই ও আখতার সাহেব আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের গ্রামের বাড়ি আসবেন এবং আমাদের বাড়িতে থেকে একসঙ্গে আমরা আগরতলার উদ্দেশে রওনা হব। আগরতলা যাওয়ার পথের সন্ধান আমি খুঁজে বের করবো।

শাহজাহান ভাই বেশ খুশি। আমি চলে এলাম বাড়িতে। এসে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আগরতলা যাওয়ার পথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলাম। তখনকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্যে গোপনে আগরতলা লোক পাঠাতেন। আগরতলা যাওয়ার পথঘাট সম্পর্কে তাঁদের কাছে নির্দেশনা ছিল। এছাড়া, আগরতলায় লোক যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে তৈরি কতগুলো গোপন ক্যাম্প ছিল, যেখানে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা প্রয়োজনে রাতে থাকা যেত। ওই সব গোপন স্টেশনে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ওই স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে পাঠানো হতো। এভাবেই এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন হয়ে আগরতলায়।

আমাদের এলাকার লোক পাঠানোর স্টেশন ছিল বড়চাপা গ্রামে। তদানীন্তন সাহসী যুবক আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম (বর্তমানে মরহুম) আগরতলায় লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন।

সব খবরাখবর নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে। শাহজাহান ভাইয়ের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু নির্ধারিত দিন-তারিখে শাহজাহান ভাই ও আখতার সাহেব আমাদের বাড়ি এলেন না। তাঁদের জন্যে আরো দুদিন অপেক্ষা করার পর আমি আবার ঢাকা গেলাম তাঁদের

সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। ঢাকা গিয়ে শাহজাহান ভাই ও আখতার সাহেবকে পেলাম। শাহজাহান ভাই তারিখ মতো না যেতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, নানা অসুবিধা তদুপরি সাংসারিক কিছু ঝামেলা সময় মতো গুছাতে না পারায় যেতে পারেননি। এবার দৃঢ়ভাবে তারিখ দিলেন যাবেনই। বললেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে যে কোনো দিন যাবেন আমাদের বাড়ি। এতে কোনো অন্যথা হবে না। তবে এ-ও বললেন যে, এই নির্ধারিত সাত দিনের মধ্যে যদি তাঁরা না যেতে পারেন তাহলে তাঁদের জন্যে আর অপেক্ষা না করে আমি যেন চলে যাই।

দেশ ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্তের পর থেকে বাড়িতে মা ও স্ত্রী প্রায়ই অলক্ষ্যে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতেন। যাত্রা বিলম্ব হওয়ায় তাঁরা আনন্দবোধ করছিলেন। মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, শাহজাহান সাহেবরা যাবেন না। অথচ খালি খালি তুমি ব্যস্ত হচ্ছো। মনে হয় তোমার যাওয়ার আগ্রহটাই বেশি।

ঠিকই নির্ধারিত সাত দিনের মধ্যে শাহজাহান ভাই আসেননি আমাদের বাড়ি। এরপর আরো দু'দিন অপেক্ষা করে আমি রওনা হয়ে গেলাম। বাড়িতে কান্নার রোল, অশ্রুর বন্যা। বাড়ির পেছন দিয়ে খেতের আইল ধরে পূর্ব-উত্তর দিকে হেঁটে চললাম বড়চাপার নূরুল ইসলামের বাড়িতে। সঙ্গে ছিল কয়েকজন ছাত্র ও যুবক। তারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে যাবে আগরতলায়।

বড়চাপা নূরুল ইসলামের বাড়িতে যাওয়ার পর ওখান থেকে পরবর্তী স্টেশনে আমাদেরকে পাঠানো হবে। বড়চাপায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি দুই জওয়ান গোলাম মোস্তফা ও মতিউর রহমান। এদের পোস্টিং ছিল পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে। ছুটিতে এরা দেশের বাড়িতে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় তারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কর্মস্থলে যেতে পারেনি।

গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাদেরকে রাজি করান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে। তাদেরকে বলা হলো যে, ছুটি শেষ হওয়ার পরও কর্মস্থলে না যাওয়ায় পাকিস্তান আর্মি তাদেরকে সন্দেহ করবে। পাকিস্তানী আর্মি এই সুশিক্ষিত বাঙালি জওয়ানদের সন্ধান করতে পারে তাদের বাড়িতে এবং তাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলবে।

এসব কথা বলার পর বাড়ির লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশী তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে চাপ দিল। তারা রাজি হলো। এ দু'জন ছিল তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোক। মাইন পোতা সম্পর্কে ছিল তাদের বিশেষ ট্রেনিং।

দু'জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সামরিক লোককে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারায় আমরা খুব আনন্দিত হলাম এবং গর্ববোধও করলাম।

নূরুল ইসলাম তাদের বাড়িতে ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে একটি চিরকুট হাতে গুঁজে দিয়ে আমাদেরকে পাঠালেন বেলাবো আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে। বেলাবো বাজারে গিয়ে রাতে হোটেলে খাওয়ার পর পাটুলী গ্রামের এক বাড়িতে নেয়া হলো আমাদেরকে। ওই বাড়ির লোকজন আমাদেরকে পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন।

কারণ, তাদের বাড়ি থেকেও কয়েকজন যুবক আমাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যাবে। পরিবারের লোকজনের ধারণা ছিল, মুক্তিবাহিনীতে গেলে এসব ছেলের সামরিক বাহিনীতে চাকরি হবে। তাই বাবা-মায়ের আগ্রহ ছিল ছেলেদেরকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানোর।

রাতে সেই বাড়িতে মুরগি জবাই করে আমাদের সবাইকে খাওয়ানো হলো। শেষরাতে আমরা রওনা হলাম বর্তমান বেলাবো থানার বিন্নাবাইদ গ্রামে জনৈক শামসুল হক মাস্টারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তিনি ছিলেন সে সময় বিন্নাবাইদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দুপুরে গিয়ে পৌছলাম শামসুল হক মাস্টার সাহেবের বাড়ি। তাঁর বাড়ি থেকে ভৈরবের রেল সেতু এবং আশুগঞ্জের আকাশচুম্বী সাইলো খাদ্য গুদাম দেখা যায়। বিশ-পঁচিশ জন লোকের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করলেন মাস্টার সাহেব তাঁর বাড়িতে। আমরা সবাই মাইলের পর মাইল হেঁটে আসার কারণে খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলাম। খাওয়ার পর কিছু বিশ্রাম নিলাম। পড়ন্ত বেলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে মাস্টার সাহেব একটি চিরকুট হাতে দিয়ে আমাদের পথনির্দেশনা দিলেন। বললেন, লালপুর বাজারের পাশ দিয়ে মেঘনা নদী ফেরী নৌকা দিয়ে পার হয়েই কুমিল্লা জেলা। খুব সাবধানে যেতে হবে। লালপুর বাজারে পাকিস্তানী আর্মি কিংবা রাজাকারদের ক্যাম্প এবং মেঘনা নদীতে পাকিস্তানী গানবোটের টহল থাকতে পারে।

মাস্টার সাহেবের এসব সতর্কবাণীতে আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো। সাবেক সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক আমাদের সঙ্গী মোস্তফার তো কথা বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। মেঘনা নদী পার হওয়ার সময় মাঝনদীতে এসে আশুগঞ্জের সাইলো গুদাম দেখে সে বলেছিল, ওই গুদামের উপর পাকিস্তানী বাহিনীর টহল থাকতে পারে। কারণ ওই বিশাল সাইলো গুদামের উপর থেকে কয়েকমাইল ব্যাপী মেঘনা বক্ষ দেখা যায়।

মেঘনা পার হয়ে ডানদিকে যেতে হয়েছিলো নির্দেশ মতো। মেঘনার ওপার দিয়ে প্রায় তিন-চার মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছলাম অধ্যাপক ইয়াকুব আলী নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে। তিনি ছিলেন নরসিংদী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর গ্রামের নামটি মনে নেই। ছোট বিলের পাড়ে বিরাট বাড়ি অধ্যাপক ইয়াকুব আলী সাহেবের। আঙ্গিনা ভর্তি ছিল বোরো ধানের টিবিতে। চারপাশে সারি সারি নারকেল গাছ। বাড়ির সামনের বিলে বাঁধানো ঘাট। সারকারী বাংলোর মতো ছিল তাঁর বাংলাঘর। মেঝে পাকা। উপরে টিনের চৌচালা।

চিরকুটটি লোক মারফত ভেতর বাড়িতে অধ্যাপক সাহেবের কাছে পাঠানোর পর পত্রবাহককে বলা হলো আমাদেরকে সমাদরের সাথে গ্রহণ করার জন্যে।

আমাদের তখন ছিল প্রচণ্ড তৃষ্ণা। ক্লান্তিতে প্রায় অবশ শরীর। বাংলাঘরে ঢুকেই চৌকির উপর শুয়ে পড়লাম। সবার জন্যে ডাব-নারকেল এনে কেটে পানি দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর গামছা, সাবান ও তেল পাঠিয়ে অধ্যাপক সাহেব খবর পাঠালেন ঘাট থেকে গোছল সেরে ফেলতে। খাবার আসছে। মনে হয় খাবার যেন আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিলো।

বিকেলে অধ্যাপক সাহেব একটি চিঠি দিয়ে আমাদেরকে পাঠালেন তাল শহরে আবুল বাশার মৃধার কাছে।

অধ্যাপক সাহেব নিজে কখনো আমাদের সামনে আসেননি। তিনি বাড়ি থেকে বের হননি। আমরা তাঁর চিঠি নিয়ে রওনা হলাম তাল শহরের উদ্দেশে। বলা হলো, রাতে তাল শহর থেকে বাশার মৃধা সিএন্ডবি রোড পার করে দিলে পরে সম্পূর্ণ পথ নিরাপদ।

সিএন্ডবি রোড দিয়ে পাকিস্তানী আর্মির নিয়মিত টহল চলতো রাত-দিন। এই সিএন্ডবি রোড পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের সময় পাকিস্তানী টহল বাহিনীর গুলিতে বহু হতাহত ও ধৃত হয়েছে। তাল শহর এলাকায় রাজাকার এবং শান্তিবাহিনীর উপদ্রবও রয়েছে। ধরা পড়লে উপায় নেই। আমাদের কারো পরনে পায়জামা বা প্যান্ট ছিল না, সবাই ছিলাম লুঙ্গি পরিহিত। পত্রিকার কাগজ দিয়ে প্যান্ট-পায়জামা ও ভালো জামাকাপড় মোড়ানো ছিল। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বাঙালি নিয়মিত সৈনিক মোস্তফা থাকত সবার পেছনে। মোস্তফা ভীষণ ভয় পেত—না জানি ধরা পড়ে যায়। যাওয়ার পথে সামনে লোকজনের আনাগোনার শব্দ পাওয়া গেলে মোস্তফা পেছন থেকে কেটে পড়ে পাটক্ষেতে গিয়ে মাথা গুঁজে লুকিয়ে থাকত। পেছনে ফিরে দেখতাম মোস্তফা নেই। পরে পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে এসে বলতো সে লুকিয়ে ছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা তাল শহর দিয়ে বাশার মৃধার বাড়ির সামনে হাজির হয়েছি। বাড়ির কাছে মসজিদে তখন এশার নামাজের আযান হচ্ছিল। পাকা বাড়ি, চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল। বাড়িটি ছিল নির্জন। বাড়িতে লোকজন ছিল বলে মনে হয়নি। বাড়ির সামনে পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়েই পাকা মসজিদ। এশার নামাজ পড়ার জন্যে দু'একজন করে বৃদ্ধ মুসল্লী মসজিদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বাশার মৃধার বাড়ির গেটে আস্তে করে টোকা দিলাম। কেউ কোনো শব্দ করেনি বাড়ির ভেতর থেকে। মাঝ বয়েসী একজন লোক কেবল আস্তে করে গেট খুলে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন আমরা কাকে চাই, কোথা থেকে এসেছি? মুখে কোনো জবাব না দিয়ে অধ্যাপক ইয়াকুব আলীর ক্ষুদ্র চিরকুট তাঁর হাতে দিলাম। অধ্যাপক ইয়াকুব আলীর স্বাক্ষর দেখেই দরজা খুলে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ঢুকুন ভেতরে। বাড়িতে কেউ নেই। কোনো কথা বলবেন না। চুপ করে বাড়ির ভেতরের ঘরে গিয়ে বসে থাকুন। কাছাকাছি রাজাকার ও শান্তি কমিটির ক্যাম্প আছে।

শুনে আমাদের সবার গায়ে জ্বর এসে গিয়েছিলো। প্রদীপবিহীন বন্ধ ঘরের ঘন অন্ধকার যেন তখন রাজাকার ও শান্তি কমিটি রূপ ধারণ করে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। তিনি কোথায় যেন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আমাদের বললেন, বাড়িতে কোনো মহিলা নেই। তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়িতে। শুধু একজন বিশ্বস্ত কাজের লোক আর তিনিই বাড়িতে আছেন প্রহরী হিসেবে।

তিনি বললেন, আপনারা বসে থাকুন চুপ করে। আমি মসজিদ থেকে এশার নামাজ পড়ে আসি। আর খোঁজ-খবরও নিয়ে আসি দালালরা কেউ আশপাশে আছে কিনা।

তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বাড়ির দিকে আসার সময় কেউ আমাদের দেখে ফেলেছে কিনা।

বললাম, না। এ সময় কোনো লোক ছিল না এদিকে। কেউ দেখেনি।

আশ্বস্ত হয়ে তিনি ঘরের বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ করে মসজিদে নামাজ পড়তে চলে গেলেন। আমরা বন্ধ ঘরে মেঝের উপর গোল হয়ে বসে আল্লাহর নাম করতে লাগলাম।

নামাজ পড়ে বেশ কিছুক্ষণ পর, বোধহয় তখন রাত দশটার দিকে বাশার মৃধার বড় ভাই এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। তিনি নিবু নিবু একটি হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে কাজের লোকটিকে বললেন আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতে। কাজের লোকটি সদ্য রাঁধা গরম ভাত নিয়ে এল। ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খেতে দিল। বাশার মৃধার ভাই দুঃখ করে বললেন, বাড়িতে কোনো মেয়েলোক নেই। খাবারেরও কিছু নেই। কষ্ট করে খান।

এরপর বললেন, রাতে কিন্তু আপনাদের আমাদের এখানে থাকা হবে না।

একথা শুনে আমরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হলাম। তিনি ফিসফিস করে বললেন, এদিকে রাতে শান্তি কমিটির টহল আছে। বাড়ি বাড়ি চেক করতে পারে। আমাদের বাড়ির উপর এদের কড়া নজর। কাজেই আপনাদের এখানে রাতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। এছাড়া এখান দিয়ে গত কয়েকদিন যাবত সিএন্ডবি রোড পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। সিএন্ডবি রোড দিয়ে পারাপারের সময় একটি দল ধরা পড়ার পর থেকে কড়াকড়ি টহল চলছে। খেয়ে রাতেই আপনারা চলে যান।

মসজিদে নামাজ শেষে ঘরে ফেরার পথে একজন কট্টর মুসল্লী আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, মৃধা তোমাদের বাড়িতে কোনো লোকজন এসেছে নাকি কোথাও থেকে? নামাজে আসার সময় যেন কিছুটা ভারভার মনে হয়েছে। লোকজনের আনাগোনার আভাস পেলাম।

আমি বলেছি, না তো! বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। শুধু একটি কাজের লোক আছে। তাছাড়া এরকম দিনে কারা আসবে কোত্থেকে? যাহোক একটা ধামাচাপা দিয়ে চলে এসেছি। সুতরাং খেয়ে আপনারা অন্য দিকে সরে পড়ুন।

রাত তখন প্রায় দেড়টা। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভদ্রলোক নিজেই কাজের লোকটিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে লোকজন আছে কিনা দেখে এসে আমাদেরকে বললেন বের হয়ে পড়তে। আমরা বুকভরা শঙ্কা নিয়ে প্রফেসরের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদেরকে বের করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাশার মৃধার বড় ভাই। তারপর আস্তে করে বাড়ির গেট বন্ধ করে দিলেন।

আমরা আবার খুব ভোরে এসে হাজির হলাম ইয়াকুব প্রফেসরের বাড়ি। সারারাত অনিদ্রা আর হাঁটার ক্লান্তি দেহকে অবশ করে দিয়েছিল। সঙ্গী মোস্তফা আর আসেনি আমাদের সঙ্গে। পেছন থেকে কেটে পড়েছিল। ইয়াকুব প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে বাংলাঘরের চৌকির উপর শুয়ে পড়েছিলাম। কেউ কেউ বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়েছিল। সকালে নাশতার ব্যবস্থা করা হলো।

নাশতার পর আমাদের সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠানো হলো প্রায় দশ মাইল দূরে প্রফেসরের অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ি। সারাদিন হেঁটে বিকালে গিয়ে হাজির হলাম সেই বাড়িতে। প্রফেসর সাহেবের সেই আত্মীয় সেখানকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। পরে জেনেছিলাম এটা শ্রীপুর ইউনিয়ন। তিনি একজন মুসলিম লীগার। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতারও সমর্থক।

বাড়িতে খাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন নিকটস্থ শ্রীপুর বাজারে। বাজারে হিন্দুদের অনেক পুরাতন মঠ চোখে পড়েছে। বাজারের পাশেই এক বাড়ির চেয়ারম্যান সাহেবের এক পরিচিত লোককে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে ডেকে এনে বলে দিলেন যেন আমাদেরকে সীমান্ত পার করে দেয়। সব ব্যবস্থা করে তিনি আমাদেরকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন। সন্ধ্যারাতে আমাদের খাওয়ানো হলো। এরপর আবার নিজেই আমাদেরকে নিয়ে গেলেন শ্রীপুর বাজারের ওই লোকের কাছে। তার হাতে আমাদেরকে সমর্পণ করে তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। কোনো অসুবিধা হবে না। ও আমার লোক। আপনাদেরকে নিরাপদে বর্ডার পার করে দেবে। আমাকে বললেন বর্ডার পার হয়ে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন, নিরাপদে বর্ডার পার হয়েছেন কিনা। তা না হলে টেনশনে থাকবো। চিঠি ওর কাছে দিয়ে দেবেন।

লোকটিকে তিনি ভালো করে বলে দিলেন বর্ডার পার হওয়ার পর যেন আমার কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আসে চেয়ারম্যান সাহেবের জন্যে। আমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।

ওই লোকটি সে রাতেই আমাদেরকে নিয়ে রওনা হলো গন্তব্য স্থানের দিকে। আমাদের সঙ্গে নরসিংদী এলাকার একটি হিন্দু পরিবারও ছিল। ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিএন্ডবি রোডের কাছের এক গ্রামে ওই লোকের খামারবাড়িতে নিয়ে গেলো। বাড়ির উঠানে চাটাই ও পাটির বিছানা পেতে দিয়ে বলল বিশ্রাম করতে এবং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। শেষ রাতের দিকে জাগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা ক্লান্ত দেহ নিয়ে বালিশ ও বিছানা ছাড়া খালি পাটির উপর ঘুমিয়ে পড়লাম। কথামতো শেষরাতে জাগিয়ে তুলে আমাদেরকে নিয়ে চলল আগরতলার দিকে। ওই লোকের মামার বাড়ি থেকে সিএন্ডবি রোড খুব দূরে ছিল না। সোবেহ ছাদেকের সময় সিএন্ডবি রোড নিরাপদে পার হয়ে আমরা উন্মুক্ত জমিনের উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদেরকে বলা হলো, এখন আপনারা স্বাধীন বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলছেন। এই এলাকা দখলদার বাহিনীমুক্ত। এটা মুক্ত এলাকা।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মুক্তভাবে শ্বাস-নিশ্বাস নিলাম। নয়ন ভরে দেখলাম মুক্ত স্বদেশভূমিকে। জমিতে ধান পেকে রয়েছে। কেটে নেয়ার লোক নেই। বাড়ি-ঘরে লোকজন নেই। খালি বাড়ি-ঘর পড়ে রয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে নাকি মুক্তিযোদ্ধারা থাকে। দু'দিক থেকেই গোলাগুলির মাঝখানে পড়ায় এই সীমান্ত এলাকার লোকজন বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

নিরাপদ এলাকায় গিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। তাঁর মহানুভবতার জন্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেলো। চিঠিতে এবার আমার

পুরো পরিচয় দিলাম। সব মুসলিম লীগারই যে পাকিস্তানের দালাল তা সঠিক নয়। শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান .ছিলেন তার এক বিরল দৃষ্টান্ত। এভাবে অনেক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে চার-পাঁচ দিন পর আমরা বিশালগড় দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সীমান্তে পৌঁছি।

॥ তিন ॥

সীমান্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর চেকপোস্টে আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে দেয়। কাগজপত্র বলতে যা পরীক্ষা করা হয় তা হচ্ছে বাংলাদেশের স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের সিলযুক্ত স্বাক্ষর সংবলিত একটি সার্টিফিকেট।

আগরতলা আউট পোস্ট থেকে অতঃপর আমাদেরকে ছাড়পত্র দেয়া হয়।

আগরতলায় গিয়ে কর্নেল চৌমুহনীতে নাম তালিকাভুক্ত করি। এখানে নাম তালিকাভুক্ত করার পর আমার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি চলে যাই কর্নেল চৌমুহনীস্থ কংগ্রেস ভবনে। এই ভবনে থাকতেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এবং ৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় এমএনএ ও এমপিএগণ। রায়পুরা থানার তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা বজলুর রহমান এই বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার ছিলেন। এখানে রান্না করা হতো। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং এমএনএ, এমপিএরা এখানে প্রতিদিন তিন বেলা সরকারি খানা খেতেন এবং রাতে ঘুমোতেন। বেশির ভাগই ফ্লোরিং করতেন। রান্নার দায়িত্বে ছিলেন আশুগঞ্জের তৎকালীন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা শফিউদ্দিন। তিনি খুব চমৎকার রান্না করতেন। মার্কেটিং এবং এমএনএ, এমপিএ বাদে অন্যান্যের জন্যে খাওয়ার স্লিপ বিতরণের দায়িত্ব ছিল রায়পুরার বজলুর রহমানের উপর। সবাই ডাকতো বজলু ভাই বলে। তিনি অন্নদাতা—তাঁকে অনেকেই তোষামোদ করতো।

এই ভবনে মাননীয় এমএনএ, এমপিএদের ফায়-ফরমাশ করার জন্যে কিছু বয়-বেয়ারা ছিল। এরা অধিকাংশ সময় বজলু সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত থাকতো। তা না হলে অন্ন জুটতো না। এই খবরদারী নিয়ে মাঝে মাঝে রাতে এমএনএ, এমপিদের মুখে নানা রকম সমালোচনা শোনা যেত। আমি ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা এবং তাঁর এক সহচর, যাঁর নাম মনে নেই, এই ভবনের দোতলার উপর সিঁড়ির কাছে ফ্লোরিং করতাম। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে গাজী গোলাম মোস্তফার অবস্থান ও প্রভাব ঈর্ষার বিষয় ছিল। বলতে গেলে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত সচিব। তাঁকে মনে করা হতো বঙ্গবন্ধুর অন্যতম পরামর্শক। কাজেই দলের কেন্দ্রীয় নেতারা পর্যন্ত গাজী ভাইকে সমীহ করতেন।

কিন্তু আগরতলার কংগ্রেস ভবনে মাননীয় এমএনএ, এমপিদের এই হোস্টেলে গাজী ভাইয়ের তেমন খোঁজ-খবর কেউ বড় বেশি নেয়নি। যদিও তিনি ছিলেন একজন এমএনএ। আগরতলায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত সার্বিক সমন্বয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আমাদের মনোহরদী এলাকার এমএনএ এডভোকেট ফজলুর রহমান

ভূঁঞা। তিনি ছিলেন খুবই স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তবে ব্যবহারে ছিলেন সরল-সোজা মানুষ। তার হাত দিয়ে এই কংগ্রেস ভবনের হোস্টেলের যাবতীয় ব্যয়ের মঞ্জুরি বরাদ্দ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই ভবনে আমি তাঁর কাছেই থাকতাম। অথচ কোনো দিন তিনি আমার কোনো খোঁজ-খবর নেননি। খেয়েছি কিনা, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা একটিবারও জিজ্ঞেস করেননি। শুনেছি হোস্টেল ম্যানেজার বজলু সাহেবের রুমে বয়-বেয়ারারা রাতদিন তাঁর সেবায় ব্যস্ত থাকতো। কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলমূলসহ বহু রকমের খাবার মওজুদ থাকতো তাঁর ঘরে। তাঁর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কংগ্রেস ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সদা তটস্থ থাকত। সর্বদা গ্লাস ভরে দুধ যেতো তাঁর ঘরে। চা-বিস্কুটের অভাব ছিল না। তাঁর ঘরে সীমিত কিছু লোক ছাড়া কেউ ঢুকতে পারতো না। নূরে আলম সিদ্দিকী আগরতলায় গেলে তার রুমে থাকার জায়গা পেতো। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অবস্থানরত অনাহূত অবহেলিত গাজী গোলাম মোস্ত ফা সবকিছুই আঁচ করেছিলেন। ভেতরে ভেতরে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রাতে তাঁর পাশেই আমি শুতাম। একদিন রাতে গাজী ভাই বললেন, কিছু বুঝতেছ নজরুল? তোমার-আমার দরকার নেই। চলো আমরা ঢাকা চলে যাই।

গাজী ভাইকে কোনো কাজেই জড়িত করা হয়নি। তিনি এতে তুষ্ট থাকেননি। সার্বক্ষণিক একজন রাজনৈতিক নেতা এবং উচ্চ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের একজন অন্যতম ব্যস্ত নেতা হিসেবে গাজী ভাই আগরতলায় বোঝা হয়ে শুয়ে-বসে খেতে চাননি। তাঁকে স্বাধীন বাংলা সরকারের কোনো কাজে নিয়োজিত করা হয়নি। এমনকি তাঁর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সেবা গ্রহণের প্রয়োজন সেদিন আগরতলায় অনুভূত হয়েছে বলে মনে হয়নি।

একদিন সকালে দেখা গেলো গাজী ভাই তাঁর সুটকেস গুটিয়ে রেডি হচ্ছেন। তিনি কলকাতা চলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন, তাজউদ্দীন ভাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, এখানে কি হচ্ছে? সব লোক আগরতলায় ঘুরঘুর করছে। ছেলেরা কোথায় ট্রেনিং দিচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা, কোনো অসুখ -বিসুখ হচ্ছে কিনা কে রাখে এ খবর? এভাবে কাজ হলে তো দেশে ফিরে যেতে পারবো না। তাজউদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা কিছু করবো।

গাজী ভাইয়ের এই অসন্তুষ্টির কথা কংগ্রেস ভবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি রাগ করে চলে গেলে ঢাকায় আওয়ামী রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা সবাই আঁচ করতে পেরেছিলেন। পরে ওখানকার নেতৃবৃন্দ এসে গাজী ভাইয়ের কাছে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। বলেন, গাজী ভাই আপনি চলে গেলে আমরা থাকবো কি জন্যে? গাজী ভাই ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দেন।

কংগ্রেস ভবনের মহাজনরা কাচুমাচু হয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। সে যাত্রায় গাজী গোলাম মোস্তফা থামলেন। তারপর বাবুর্চিখানার কর্মকর্তা মালেক সাহেব সকাল-বিকাল প্রায়ই এসে গাজী ভাইকে সালাম দিতেন। খাওয়ার সময় আগে তাঁকে ডেকে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ার তদারক করতেন।

আমি ছিলাম ভাসমান বেওয়ারিশ। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন লোক পাঠিয়ে আমাকে সেখানে নিয়েছিলেন। কিন্তু আগরতলা গিয়ে একেবারে লাপাত্তা হয়ে পড়লাম। কোনো সূত্র পেলাম না কোথায় কি করতে হবে। ওখানে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে আমার মতো একজন তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখিনি। নেতাদেরকে জানিয়েছিলাম আমার আগরতলা উপস্থিত হওয়ার পটভূমি। কিন্তু কেউ কোনো পাত্তা দেননি। একদিন উঁচু স্তরের ব্যক্তি আমিনুল হক বাদশা এলেন কলকাতা থেকে। সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তাঁর প্রভাব ও গুরুত্বের হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। মনে করেছিলাম হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমার জন্যে কোনো বাণী রয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি। দেখা হলে শুধু বললেন, আরে নজরুল সাহেব যে—এপর্যন্তই। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি কেন আমি এলাম।

আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আগরতলায় দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনরত মিজানুর রহমান চৌধুরী (বর্তমানে জাতীয় পার্টির নেতা) এবং আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিলের সঙ্গে আগরতলায় তাঁর দফতরে গিয়ে দেখা করলাম। কেউ কিছু বলেননি। তাঁরা মাঝে মাঝে টেলিফোনে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে কথা বলতেন। আমার সম্পর্কে কিছু বলেননি তাঁকে। যাঁরা কলকাতা যেতেন তাঁদেরকে বলেছি কলকাতায় গিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবকে জানাতে যে আমি আগরতলায় এসে পৌঁছেছি। কলকাতা যেতে পারছি না। কিভাবে যাবো বুঝতে পারছি না। কেউ কান দেননি আমার কথায়। সবাই নিজ নিজ গুরুত্ব রক্ষার জন্যে সতর্ক। কয়েকজন নেতা আমাকে উপদেশ দিলেন আগরতলা থেকে ট্রেনে করে কলকাতা চলে যেতে। আগরতলায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দূত রহমত আলীর দেখা পাইনি।

একদিন আগরতলাস্থ আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এম. আর. সিদ্দিকীর দফতরে গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে বাংলাদেশের লোকদের খুব ভিড় দেখলাম। শুনেছি ওখান থেকে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করা, পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচারপত্র তৈরি করে বিলি-বন্টন করা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তখন মুক্তিযুদ্ধের অংশ বলে গণ্য করা হতো। এসব খাতেও নাকি অর্থ বরাদ্দ দেয়া হতো এম. আর. সিদ্দিকীর ওই দফতর থেকে। তাই ওখানে এত ভিড়।

একদিন ওখানে গিয়ে আমাদের নির্মলদার দেখা পাই। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি আর কাঁধে ঝোলানো মোটা কাপড়ের এক ব্যাগ। খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা নির্মলদা। আগে না চিনলে কেউ ধরতে পারবে না নির্মলদা হিন্দু না মুসলমান। নির্মলদার মধ্যেও কি যেন একটা ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিলাম। তবে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়নি সেখানে। ছাত্রলীগ নেতা আসম আবদুর রব, স্বপন কুমার ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং সাংগঠনিক কাজে রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন। এদের সাক্ষাৎ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন কাজ। নূরে আলম সিদ্দিকী মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আগরতলা এসে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং শিবিরগুলোতে আবেগময় ভাষণ দিয়ে আবার চলে যেতেন।

একদিন রাতের ঘটনা।

রাত বোধ হয় তখন তিন-চারটা হবে। আগরতলার কর্নেল চৌমুহনীর এমএনএ হোস্টেলের দোতলায় সবার সাথে ঘুমিয়েছিলাম। শেষরাতে লোকজনের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। কাঁথা উঠিয়ে আমার পাশের এক এমপিএ জানতে চাইলেন কি হয়েছে। যিনি ডাকতে এসেছিলেন তিনি বড় গলায় বললেন, রাতে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে পাকিস্তানী আর্মির সাথে সংঘর্ষে আমাদের ত্রিশ-চল্লিশ জন ছেলে আহত হয়েছেন। দু-তিন জন মারা গেছেন। আহতদের আগরতলা হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাদের জন্যে রক্ত লাগবে। হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দিতে হবে । কে কে যাবেন আমাদের সঙ্গে চলুন।

হোস্টেলে স্তব্ধতা নেমে এলো। কেউ কেউ মাথা বালিশে গুঁজে গভীর নিদ্রায় বিভোর হলেন। কেউ কেউ গায়ের উপর চাদর টেনে চাদরের নিচে মাথা লুকিয়ে দেহটা বাঁকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইলেন। সত্য কথা গোপন করতে চাই না—আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বইকি। না জানি আমার দিকে এসে বলে যে, আপনাকে হাসপাতালে রক্ত দিতে যেতে হবে।

দোতলা থেকে কেউ বিছানা ছেড়ে হাসপাতালে গিয়েছিলো এমন কোনো কথা শুনিনি। হোস্টেলের অধিকর্তা বজলু সাহেব তাঁর রুমের দরজাই খোলেননি। ছেলেরা চলে গেলে সবাই নির্বিঘ্নে বাকি রাতটুকু ঘুমিয়েছিলেন। পরে শুনেছি আগরতলা কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীরা হাসপাতালে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল রক্ত দেয়ার জন্যে।

এর মধ্যে একদিন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী (তখন তিনি কর্নেল ছিলেন) আগরতলায় এলেন। ঢাকায় একদিন তাঁর সঙ্গে একজন সাংবাদিক হিসেবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম। এই নূরুল ইসলাম সাহেব কর্নেল ওসমানীকে আওয়ামী লীগে যোগদানে সম্মত করিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মিরপুরের এক বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। আওয়ামী লীগ মহলে কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে ওসমানী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শুধু সালাম বিনিময় ছাড়া আমার কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তা সত্ত্বেও আগরতলায় ওসমানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা ছিল। তাঁর আগমনের খবরও গোপন রাখার ব্যবস্থা ছিল। বড় বড় নেতারা সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার। একবুক হতাশা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম আগরতলায়। মে মাস শেষ হতে চলল। যে টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তা প্রায় নিঃশেষ। এদিকে যুদ্ধ আরোও জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেতর থেকে লোকজনের আগরতলায় আগমন আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থার দেশে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না।

মাঝে মাঝে আগরতলা শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে যেতাম নেতাদের সঙ্গে। নেতারা বাংলাদেশের ট্রেনিংরত যুবকদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে—জীবন উৎসর্গ করতে।

এভাবে দিন আর কাটছে না। মে মাসের শেষ দিকে ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান সিরাজ এলেন কলকাতা থেকে। কর্নেল চৌমুহনীর এমএনএ হোস্টেলে তাঁর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই বললেন, আরে নজরুল, আপনাকে তাজউদ্দীন সাহেব খুঁজছেন। আমাকে বলেছেন আপনি আগরতলায় থাকলে পাঠিয়ে দিতে।

আমি হাতে আকাশ পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি এখানেই থাকুন। আমি কাজ সেরে আপনাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার পরদিন শাহজাহান সিরাজ একখানি খোলা জীপ নিয়ে কর্নেল চৌমুহনীতে এলেন। ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার নিজে জীপ চালাচ্ছিলেন। আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন আগরতলা এয়ারপোর্টে। সেখানে বিএসএফ-এর ঘাঁটিতে গিয়ে তাদের কলকাতা ফ্লাইটে আরোহীদের তালিকায় আমার নামও ঢুকিয়ে দিলেন। বিএসএফ-এর এই সামরিক বিমানে সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজীসহ আরো কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও দলীয় এমএনএ, এমপিএ কলকাতা যাচ্ছেন।

আগরতলা এয়ারপোর্টে শাহজাহান সিরাজ আমাকে ব্রিফিং দিলেন, কলকাতা বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে যেন বালিগঞ্জগামী বাসে উঠি। তিনি আমাকে বালিগঞ্জের একটি গলির নাম এবং বাড়ির নম্বর দিলেন। বললেন, বাস থেকে বালিগঞ্জ নেমে ওই গলি দিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখবেন ওই বাড়ি। বাড়ির গেট ভেতর থেকে বন্ধ। তবে কড়া নাড়লে দারোয়ান গেট খুলে জানতে চাইবে আপনার পরিচয় এবং কার কাছে এসেছেন। আপনি মান্নান সাহেবের নাম বলবেন। ওখানে টাঙ্গাইলের মান্নান ভাই থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই তিনি আপনাকে তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন।

এসব বুঝিয়ে বলে শাহজাহান সিরাজ আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে চলে গেলেন। সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজীর সঙ্গে আমার আগে থেকেই ভালো পরিচয় ছিল।

॥ চার ॥

বিএসএফ-এর কয়েকজন অফিসার ছিলেন ওই বিমানে। অনেক উপর দিয়ে বিমানটি ত্রিপুরা পার হয়ে আসামের গৌহাটি বিমানবন্দরে গিয়ে সাময়িক যাত্রাবিরতি করে। সামরিক বিমানে ভীষণ গরম লাগছিল। তদুপরি পাহাড়ী অঞ্চলের উপর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং ঝড়-বাতাসের কারণে বিমান খুবই বাম্পিং করছিল। আমার বমি বমি ভাব হয়েছিলো। জানালা দিয়ে নিচে দেখলাম আসামের ছোট-বড় পাহাড়, পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে হ্রদ, পাহাড়ী ঝর্না আর অনেক নদ-নদী।

গৌহাটি বিমান বন্দরে সাময়িক বিরতি ও চা-নাশতার পর আবার বিমান গৌহাটির আকাশে উড়লো। আসামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিচে ভারতের কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটি চোখে পড়লো। বাংলাদেশের চারপাশে পরিবেষ্টিত ভারতের অনেক ছোট-বড় বিমান ঘাঁটি রয়েছে।

আসাম পার হয়ে জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার চোখ ছিল জানালা দিয়ে নিচের দিকে। সুন্দর করে সাজানো গুচ্ছ সবুজ বন-জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাঠ চোখে পড়ছিল। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম ওটা জলপাইগুড়ি। এরপর গঙ্গা নদীর উপর

পাহাড়ের মতো এক বিশাল ইমারত মনে হলো। বিএসএফ-এর একজন অফিসার বললেন, এটি ফারাক্কা বাঁধ। আরো কিছুক্ষণ উড়ে চলার পর বিমান চালক বললেন, সামনে দমদম বিমানবন্দর। গুছিয়ে শক্ত হয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরই দমদম বিমানবন্দরে বিএসএফ-এর বিমান অবতরণ করলো। বিমান বন্দরে বিএসএফ-এর শাখা দিয়ে বের হওয়ার সময় তেমন কোনো চেক করা হয়নি, শুধু একটি তালিকা বের করে নাম ডেকে মিলিয়ে নিচ্ছিলো।

দমদম বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে দেওয়ান ফরিদ গাজী ও অন্যান্য নেতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বালিগঞ্জের বাসে উঠলাম। কলকাতার মাটিতে আমার প্রথম পা রাখা। পরনে সাধারণ প্যান্ট ও গায়ে সাধারণ জামা। হাতে পত্রিকা দিয়ে প্যাকেট করা লুঙ্গি ও অন্য কয়েকটি কাপড়।

শাহজাহান সিরাজের পথ-নির্দেশিকা মোতাবেক বালিগঞ্জের গলি দিয়ে অগ্রসর হলাম। বড় বড় দালান-কোঠা কলকারখানা। সামনে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড় নিতেই ওই নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়িটি চোখে পড়লো। দরজায় ধাক্কা দিতেই গেট খুলে দারোয়ান বিস্তারিত জানতে চাইলো। সব খুলে বলার পর ভেতরে যেতে দিলো এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে বলল। উপরে গিয়ে ওখানে আপেল মাহমুদ, আবদুল জব্বার, রথীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ শিল্পীকে একটি বড় ঘরে দেখতে পেলাম। এর পরের ঘরেই দরজার কাছে আওয়ামী লীগ নেতা মান্নান ভাই একটি খাটের উপর শুয়ে আছেন দেখলাম। একটি ছোটখাট হাসি দিয়ে তিনি বললেন, আরে নজরুল, কোথা থেকে এসেছ? তারপর অন্য সব খবর কি?

হাতের কাপড়ের প্যাকেটটা রেখে খাটের উপরই বসলাম। বিস্তারিত সব বললাম। তাঁর পাশের খাটেই আমিনুল হক বাদশার সীট। ওই ভবনের সবার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব মান্নান ভাইয়ের উপর ন্যস্ত। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা।

এখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং রুম ছিল। এ রুমে থাকতেন কামাল লোহানী, চট্টগ্রামের বেলাল মোহাম্মদ, সাদেকীন, আবুল কাশেম সন্দীপসহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পী, সাংবাদিক ও প্রতিবেদকবৃন্দ। এম. আর. আখতার মুকুল সাহেব তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় চরমপত্র অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে আসতেন এখানে। প্রথম দিকে তিনি সস্ত্রীক ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন এই ভবনেরই একটি ঘরে। পরে অবশ্য অন্যত্র বাসা করে থাকতেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের তদানীন্তন প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ টি হোসেনও এই ভবনের একটি ঘরে সস্ত্রীক থাকতেন। এখানে সবার জন্যে যে রান্না হতো তা থেকেই তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ খেতেন। তাঁর স্ত্রী পারভীন হোসেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ইংরেজি খবর পড়তেন।

মান্নান ভাই বললেন, থাকার কোনো সীট নেই। এখানে থাকলে ফ্লোরিং করে থাকতে হবে। সবাই এখানে ফ্লোরিং করছেন। আমি মান্নান ভাইয়ের খাটের পাশেই ফ্লোরে বিছানা পেতে নিলাম।

মান্নান ভাই বললেন, আপাতত এখানেই থাকো আর জয়বাংলা পত্রিকার কাজকর্ম করো। তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তোমার ব্যাপারে আলোচনা করে ঠিক করা হবে

তোমাকে কোথায় কাজে লাগানো হবে। এখন প্রধানমন্ত্রী খুব ব্যস্ত। অন্তত আগামী চার-পাঁচ দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ মিলবে না।

মান্নান ভাই ছিলেন মুজিবনগর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। আহামরি ভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রাণখোলা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডিং রুমে যাঁরা থাকতেন ও যেতেন তাঁদের যে কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা যেত। তিনি সবার সঙ্গে আলোচনা করে সব সমস্যার সমাধান করতেন। তাঁর কোনো আচরণে কেউ সেদিন আহত হয়েছেন এমন কথা শুনিনি। তিনি সবার কাছেই ছিলেন অতি আপনজন। মন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন মান্নান সাহেবের মধ্যে সেদিন কোনো অহমিকা বা অহংকারবোধ দেখা যায়নি। সবার সঙ্গে একত্রে বসে খেতেন তিনি।

একটি জীপ গাড়ি ছিল তথ্য দফতরের জন্যে। মান্নান ভাই কদাচিৎ এ গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পেতেন। কারণ এটা ছিল আমিনুল হক বাদশার দখলে। বাদশা নিজেই ড্রাইভ করতেন। সকালে বের হয়ে যেতেন। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে রাতে ফিরে আসতেন বালিগঞ্জের এই ভবনে। মান্নান ভাই গাড়ির অভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে ভয়ানক অসুবিধায় পড়তেন। তাঁকে প্রতিদিন অন্তত একবার সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* অফিসে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হতো জরুরী কাজে। তাঁকে রাস্তায় এসে ট্যাক্সী ভাড়া করে কাজে যেতে হতো। মাঝে মাঝে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন এই অসুবিধার জন্যে।

মান্নান ভাইয়ের সঙ্গেই যেতাম বালুহককক লেনে *জয় বাংলা* অফিসে। আমাকে ওখানে রেখে তিনি চলে যেতেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে।

জয়বাংলা অফিসে আরো যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান, এডভোকেট গাজীউল হক, সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেবের পুত্র আবুল মনজুর, ফজলুল হক প্রমুখ।

একদিন মান্নান ভাই আমাকে বললেন, তুমি প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে যে যে খবর প্রকাশের যোগ্য তা জয়বাংলায় রিপোর্ট করবে। তিনি তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলেছি, আমার কাছে আছে। চলো, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই।

আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম প্রতিদিন *জয়বাংলা* অফিসে আসতেন। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ধরনের ছবির ভাণ্ডার ছিল তাঁর কাছে। *জয়বাংলা* পত্রিকায় এসব ছবি তিনি দিতেন ছাপার জন্যে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্লোগান ও বঙ্গবন্ধুর বিরাট ছবিসহ বিচিত্র পোস্টার তৈরি করে ছাপিয়ে তা বিভিন্ন সেক্টরে পাঠাতেন। কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে এসব পোস্টার টানিয়ে দিতেন। মান্নান ভাই এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন।

মান্নান ভাই একদিন সকালে আমাকে নিয়ে গেলেন তাজউদ্দিন সাহেবের দফতরে। আমাকে দেখে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন খুশি হয়েছিলেন। তবে অনুযোগ করেছিলেন দেরিতে আসার জন্যে। বিলম্বের কারণ তাঁকে খুলে বললাম। তিনি বলেন,

এখন আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারবো না, একটু অবসর হয়ে নিই। আপনাকে আমার খুব দরকার। অন্যদিন এ সম্পর্কে কথা হবে।

তারপর পিএস-কে ডেকে একটি ফাইল এনে আমার সামনে দিয়ে বললেন, দেখুন এটাতে দেশের ভেতরে যুদ্ধের খবরাখবর আছে। এটা দেখে লিখে নিয়ে সংবাদ তৈরি করে *জয়বাংলায়* ছাপান।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ডক্টর ফারুক আজিজ খান, সহকারী একান্ত সচিব ছিলেন দুর্গাদাস নামক এক ভদ্রলোক। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দফতরের সামনের রুমে তাঁরা বসতেন। তাঁদের পেছনের রুমে ছিল মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীর দফতর।

কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের দোতলা ভবনটি ছিল স্বাধীন বাংলা বা মুজিবনগর সরকারের অঘোষিত সচিবালয় এবং সশস্ত্রবাহিনীর সদর দফতর। এই ভবনের নিচতলার একটি বড় ঘরে অফিস করতেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি এ ঘরে খাট ফেলে রাতেও থাকতেন। ঘুমোতেন এবং খেতেন। প্রথম দিকে, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম. কামরুজ্জামান এ ভবনে থাকতেন এবং অফিস করতেন। পরে কেবল প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যদের অফিস সিআইটি রোডে তাঁদের নিজ নিজ বাসায় স্থানান্তর করা হয়। কেবল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানী সাহেবের সদর দফতর ছিল ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের এই বাড়ি। অবশ্য কাগজে-কলমে, মুখে এবং অফিসিয়েলি মুজিবনগর সরকারের সদর দফতর ছিল রাজধানী মুজিবনগরে। সবার উপর নির্দেশ ছিল বিদেশীদের কাছে বলতে হবে সরকারের সদর দফতর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুজিবনগরে। আসলে মুজিবনগর ছিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর থানার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত সংলগ্ন বৈদ্যনাথতলার নাম। ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল এই বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিলো। এদিন এর নামকরণ করা হয়েছিলো মুজিবনগর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারত সীমান্ত সংলগ্ন এই বৈদ্যনাথতলা বা মুজিবনগরে প্রবেশ করতে পারেনি। এটা ছিল সেদিন এক যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এলাকা। মুজিনগর ছিল মুক্ত এলাকা। এখানে সাবেক ইপিআর বাহিনীর বাঙালি অফিসারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধার একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিলো। প্রয়োজনে বিদেশী কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের এই মুজিবনগরে নিয়ে এসে অফিসিয়েলী কথাবার্তা বলা হতো। অফিসিয়েল মুজিবনগর ছিল কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর পর এটা এখন আর কোনো গোপনীয় বিষয় নয়।

কলকাতার ৫ নম্বর বালু হক লেনে সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* অফিস। প্রতিদিন যুদ্ধের খবর সংগ্রহের জন্যে আমাকে যেতে হতো ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোনো খবর পাওয়া যেতো না। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ পাওয়া যেতো না। এতে যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে বিলম্ব

হতো এবং কোনো কোনো দিন খবর সংগ্রহ করা সম্ভবও হতো না। কারণ যুদ্ধ সংক্রান্ত যে খবর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আসতো, তা আসত মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর দফতর থেকে। এসব খবর সরকারের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি তবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে দেয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবর ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত কার্যক্রম না থাকায় কলকাতাসহ বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো নিজেদের সূত্র অনুযায়ী খবর প্রচার করতো। অনেক সময় এসব খবর মুজিবনগর সরকারের নীতি কিংবা কৌশলের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হতো। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো। কেমন করে একটি উৎস থেকে সরকারের নীতি ও কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমন্বিত আকারে মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার সম্পর্কিত যাবতীয় খবর সরবরাহ করা যায় এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গভীরভাবে ভাবছিলেন।

বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর ও তথ্যগুলো ওসমানী সাহেবের দফতরে আসতো বিএসএফ ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড থেকে। এগুলো আসতো অবিন্যস্ত আকারে। যেভাবে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে টাইপ হয়ে আসতো সেভাবেই তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রদান করা হতো। এগুলো দেখে সাজিয়ে গুছিয়ে, কাটছাট করে দেয়ার মতো এত সময় প্রধানমন্ত্রীরর হাতে ছিল না। এছাড়া দেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল দ্রুততার সাথে।

একদিন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে খবর সংগ্রহ করতে গেলে তিনি কিছুটা রাগতস্বরেই বললেন, নজরুল সাহেব এভাবে আর চলবে না। সব কিছু সমন্বিত আকারে করতে হবে। আমার একার পক্ষে সবকিছু দেখা সম্ভব হবে না। একটু বসুন, কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলবো এ সম্পর্কে। ওসমানী ও মান্নান সাহেবের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা হয়েছে।

বিকেলের দিকে তাজউদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে তাঁর অফিসে বসে বললেন, নজরুল সাহেব বিশ্বাসী ও কর্মী লোকের বড় অভাব। এ কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর গোপনীয়তা খুব বেশি। এর সঙ্গে জড়িত শুধু স্বাধীন বাংলা সরকারের নীতি ও কৌশলই নয়, আমাদের সাহায্যকারী দেশ হিসেবে ভারতের নীতি এবং কৌশলও। এটা খুবই সেনসেটিভ বিষয়। বেশি চোখমুখ খোলা লোক দিয়ে এ কাজ হবে না। খুবই ধৈর্যশীল শান্তশিষ্ট ও স্বল্পভাষী এবং কম পরিচিত লোক লাগবে। দরবারী লোক দিয়ে হবে না। আমার মনে হয় আপনি পারবেন। এ কাজে একান্তই নিজের বিশ্বস্ত লোক দরকার এ জন্যেই রহমত আলীকে পাঠিয়েছিলাম ইত্তেফাকের সিরাজ আর শাহজাহান সাহেব এবং আপনাকে নিয়ে আসার জন্যে। তো তাঁরা এলেন না। তাহলে আপনিই শুরু করুন। *জয়বাংলার* অফিসে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই। আমি মান্নান সাহেবকে বলবো। আপনি ওসমানী সাহেবের অফিসে নিয়মিত বসবেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত যে খবর ও তথ্য সরকারিভাবে দেশের ভেতর থেকে আসবে সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি বুলেটিন আকারে তৈরি করে আমাকে ও ওসমানী সাহেবকে দেখিয়ে নেবেন,

প্রয়োজনে সংশোধিত আকারে বুলেটিন করে সাইক্লোস্টাইল করে সকল প্রচার মাধ্যমকে সরবরাহ করার দায়িত্ব আপনি পালন করবেন। তাহলে আমি নিশ্চিত হতে পারি। ওসমানী সাহেবের সঙ্গে আপনার ব্যাপারে বলেছি। তিনিও আপনাকে ভালো জানেন। তিনিও এতে রাজি আছেন।

তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বসিয়ে রেখে পাশের ঘর থেকে ওসমানী সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, নজরুল সাহেব, আপনি এসেছেন ভালো করেছেন। এখন দেশের জন্যে কিছু কাজ করুন। এতদিন দেশে শুধু শ্লোগান আর বক্তৃতা দিয়েছেন। এখন আসুন কাজ করি। আগামীকাল থেকে আপনি আমার অফিসে বসবেন। কি করতে হবে সব বুঝিয়ে বলে দেবো। আপনার সঙ্গে এ কাজে আরও অভিজ্ঞ লোক থাকবেন।

সেদিন এ পর্যন্তই কথা! প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বের হয়ে এসে আমার মাথা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। নিজের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। মুজিবনগর বা কলকাতায় আমার চেয়ে বয়সে, যোগ্যতায় ও অভিজ্ঞতায় বড় এবং ঝানু বাঙালি ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। আমার মতো অতি নগণ্য ও কাঁচা লোকের উপর এত আস্থা কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

সাংবাদিক হিসেবে *দৈনিক ইত্তেফাকে* আমি স্বাধীনতার মাত্র কিছুদিন আগে সিনিয়র রিপোর্টার পদে উন্নীত হয়েছিলাম। সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পাইনি। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একজন মফস্বল সাংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিলো।

আমি আওয়ামী লীগের কোনো উঁচুস্তরের কর্মী নই। *দৈনিক ইত্তেফাকে* জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্র লীগ ও কৃষক লীগের যাবতীয় এসাইনমেন্ট আমার ঘাড়ে চেপেছিল। কারণ, আমি ছিলাম তখন একমাত্র তরুণ ও ব্যাচেলর রিপোর্টার।

তাহের উদ্দীন ঠাকুর, সৈয়দ শাহ্জাহান, মিজানুর রহমান এঁরা সবাই ছিলেন সিনিয়র রিপোর্টার এবং বিবাহিত। বজলুর রহমান এবং চীফ রিপোর্টার খন্দকার আবু তালেব ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।

শেখ সাহেব ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। দেশব্যাপী গ্রেফতার, প্রতিবাদ, আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলছে। শেখ সাহেব গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার পর দলীয় নেতারা দেশব্যাপী সফর করেন। গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, আমেনা বেগম, পরবর্তীকালে বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম বদরুনেছা প্রমুখ নেতা-নেত্রী দেশময় সভা-সমাবেশ ও মিছিল করতেন। তাঁদের সঙ্গে ইত্তেফাক থেকে রিপোর্টার হিসেবে এসাইনমেন্ট পড়তো আমার উপর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে বের হওয়ার পর, পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এবং ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে শেখ

মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ নেতা দেশের আনাচেকানাচে ছুটে যান উল্কার মতো। জনসভা আর জনসভা। সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। নেতারা কখনও বিমানে, কখনও গাড়িতে, লঞ্চে কিংবা নৌকায়, রিকশা, কিংবা গরুর গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে গেছেন মিটিং করতে। তাঁদের সঙ্গে *ইত্তেফাকের* রিপোর্টার যেতে হয়েছে। বড় রিপোর্টাররা এত ধকল সইতে পারবেন না। ঢাকায় তাঁদের সাজানো সংসার, স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। রাতে ঢাকার বাইরে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামেগঞ্জে নেতাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটা, দীর্ঘক্ষণ নৌকা কিংবা গরুর গাড়িতে আটকে থাকা, তাঁদের সইবে না। এসব এসাইনমেন্ট আমাকেই করতে হয়েছে। নেতাদের পেছনে ছায়ার মতো আমাকে লেগে থাকতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, কখনও একজন অনুগত দলীয় কর্মীর মতো নেতাদের জুতার বোঝাও বইতে হয়েছে। নৌকায় উঠলে উরু বিছিয়ে দিয়ে বালিশ হতে হয়েছে। আবার হাঁটতে হাঁটতে যখন পা কিংবা মাথা ব্যথা করতো নেতাদের, তখন নৌকা কিংবা গরুর গাড়িতে বসে পা এবং মাথা টিপে দিতে হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই কোনো সাংবাদিকের কাজ বা দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু তবু করতে হয়েছিলো। এভাবেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। তাঁদের আস্থা এবং বিশ্বাসভাজন হয়েছিলাম। একান্ত আপনজনে পরিণত হয়েছিলাম। তাঁদের কাছে সেদিন আমার পরিচয় শুধু একজন সংবাদিক নয়। মুজিবনগরে অর্থাৎ কলকাতায় ডেকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় এত বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমার মতো একজন নিরীহ গোবেচারা লোকের উপর অর্পণ করার জন্যে আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততাই হয়তো আমার যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছিলো। তা না হলে এ কাজ করার জন্যে এত বড় যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি ভালো ইংরেজী জানতাম না, খুব ভালো করে ইংরেজী বলতে পারতাম না, কঠিন ইংরেজী বুঝতেও পারতাম না। সাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসারদের এবং তদপুরি কলকাতায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারদের দাঁতভাঙ্গা চৌকস ইংরেজী ভাষা আমার নাগালের বাইরে ছিল। এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এতবড় দায়িত্ব সেদিন আমার উপর পড়েছিল।

এই ব্যাপক কাজের জন্যে আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন ছিলাম। এজন্যে আমার ভয়ও ছিল বেশি। ক্ষমতা, পদবী, আরোপিত যোগ্যতা, নিজ কিংবা অন্য কারো স্বার্থে অপপ্রয়োগ কিংবা অপব্যবহার সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা এবং অদক্ষতাও হয়তো এঁদের কাছে আমার যোগ্যতার আরেকটি নেপথ্য কারণ বলে বিবেচিত হয়েছিলো।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের এবং দুইটি ভিন্ন দেশের সামরিক ব্যক্তিবর্গের মাঝখানে থেকে কাজ করার সময় কোনো প্রকার নীতিগত বৈপরীত্য কিংবা মতদ্বৈধতা, দলীয় বা উপদলীয় কোন্দল এ সবের ব্যাপারে আমার নির্লিপ্ততাও হয়তো আমার যোগ্যতার আরো একটি মাপকাঠি ছিল।

॥ পাঁচ ॥

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং জেনারেল ওসমানীর কথা অনুযায়ী পরদিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কের সদর দফতরে। তাঁর রুমের সামনের রুমে বসেন তাঁর এডিসি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চৌকস ও সুদর্শন যুবক ক্যাপ্টেন নূর। বাড়ি সিলেট। জেনারেল সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নূরের সঙ্গে। বললেন, তাঁর এক বন্ধুর ছেলে ক্যাপ্টেন নূর।

সামরিক ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন নূর খুবই স্মার্ট। অনর্গল ইংরেজী বলেন। সাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর টেবিলের সামনেই আমার বসার ব্যবস্থা করা হলো।

৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ির কম্পাউন্ডে লম্বা ব্যারাক। ব্যারাকে থাকেন ক্যাপ্টেন নূর ও সদর দফতরের অন্যান্য কর্মকর্তা। দুপুরে ওখানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হলো আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া উপলক্ষে। জেনারেল সাহেবও সেখানে অংশ নেবেন। তিনি সাধারণত তাঁর অফিস কক্ষেই প্রতিদিন দুপুরের খাবার সেরে নেন। সেদিন দুপুরে ওই ব্যারাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হলেন মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি স্টাফ প্রধান কর্নেল এম. এ. রব, সাবেক পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি অফিসার এয়ার কমোডর বাশার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত)। এ কে খন্দকার সদর দফতরের ওসি মেজর এম. আর. চৌধুরী, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর মনজুর (পরে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত), মেজর বাহার, কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে এমপি), ভারতীয় সেনাবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার প্রমুখ। সামরিক আবহে মধ্যাহ্নভোজ। মধ্যাহ্নভোজের আগে জেনারেল সাহেব আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের কাছে। বললেন, 'মিস্টার নজরুল ইসলাম, এ ইয়ং এন্ড বাডিং জার্নালিস্ট অব আওয়ার কান্ট্রি। হি উইল ওয়ার্ক উইথ আস এজ মাই পাবলিক রিলেসন্স অফিসার। আই উইশ ইউ অল টু কোঅপারেট।

ব্যারাকেই আমার রাতে থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তি যোদ্ধারা চব্বিশ ঘণ্টায় যে সব কর্মকাণ্ড করেছে, হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর বিশেষ করে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী, শান্তি কমিটির লোকদের হত্যা, আহত গ্রেফতার কিংবা এদের কোনো অপকর্ম বানচাল করে দেয়া, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যাতে ওরা চলাচল করতে না পারে, এদের ব্যবহৃত যানবাহনের উপর হামলা, এদের সরবরাহ লাইন, এদের সহায়ক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল করে দেয়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিরস্ত্র নিরীহ জনগণের উপর এদের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্মম হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ডসহ পৈশাচিক কর্মকাণ্ড এবং হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও তাঁদের প্রতিরোধ, জনগণের মনোবল, মুক্তিযোদ্ধার দুর্জয় অভিযানের সাফল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে প্রতিদিন সাইক্লোস্টাইল করে ওয়ার বুলেটিন প্রকাশ করতাম। ওয়ার বুলেটিন সকল দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্রকে দিতাম। এছাড়া, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য,

সশস্ত্রবাহিনী প্রধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহির্বিশ্ব বিষয়ক প্রচার বিভাগকে এই ওয়ার বুলেটিনের কপি দিতাম। এতে বিগত চব্বিশ ঘন্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যেতো। বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার তাঁদের সেক্টরের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের খবর ও বিভিন্ন তথ্য তাঁদের নিকটস্থ ওয়্যারলেস স্টেশনে প্রেরণ করতেন। ওয়্যারলেস স্টেশন সে সব তথ্য ও খবর সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতরের স্টেশনে পাঠাতো। সামরিক টেলিপ্রিন্টারযোগে যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য ও খবর পাঠানো হতো। টেলিপ্রিন্টারে প্রাপ্ত তথ্য ও খবরকে ভিত্তি করে আমরা এই ওয়ার বুলেটিন তৈরি করতাম। সে সময় ফটোস্ট্যাট কিংবা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার মেশিন ছিল না। আমরা এই ওয়ার বুলেটিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, মুজিবনগর ও কলকাতা থেকে প্রবাসী বাঙালিগণ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন সাপ্তাহিক *জয়বাংলা, বাংলার বাণী, স্বদেশ, খবর, মাতৃভূমি,* কলকাতার *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, লোকসেবক, দি স্টেটস্‌ম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা এবং পিটিআই, ইউএনআই সংবাদ সংস্থাকে সরবরাহ করতাম। মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের ব্যারাকে একটি কক্ষে সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও টাইপরাইটার ছিল।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের তদানীন্তন সশস্ত্র ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসার এবং যে সব ছাত্র, যুবক, শ্রমিকসহ বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে এই সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছিলো। তবে প্রশাসনিক দিক থেকে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর পৃথক সাংগঠনিক সত্তা যথাযথ শৃংখলা ও প্রশাসন ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। মুক্তিযুদ্ধে যেসব তরুণ ও যুবক যোগদান করেছিলো তাদের মধ্যে থেকে প্রতিভাবান যুবকদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়ে পরিপূর্ণ সামরিক ট্রেনিং দেয়া হতো।

ওয়ার বুলেটিন তৈরিতে আমাদের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর স্ট্যানোটাইপিস্টরা সাহায্য করতেন। যে ষ্টোনোটাইপিষ্টটি আমাদেরকে ওয়ার বুলেটিন তৈরিতে সাহায্য করতেন তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের দফতরে স্ট্যানো হিসেবে কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম সুযোগে তিনি কেটে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

মিত্র বাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত বুলেটিন তৈরিতে আমাকে সাহায্য করতেন। আমাদের সদর দফতর থেকে ওয়ার বুলেটিন বের হওয়ার পর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণীসহ সকল প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবর মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর থেকে প্রকাশিত ওয়ার বুলেটিনের বরাত দিয়ে পরিবেশন করতো। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচার কাজে একটি সমন্বয়, শৃংখলা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। মোটামুটি সকলের প্রশংসা পরামর্শ পেতে লাগলাম। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেলো।

মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে গণসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হলো সাইকোলজিক্যাল

ওয়ার- ফেয়ার সম্পর্কে আমাকে একটি কোর্স করতে হবে। নির্দেশ দেয়া হলো প্রতিদিন সকালে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে আমাকে ট্রেনিং কোর্সে হাজির হতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টায় এই কোর্স শুরু হবে।

মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে ট্রেনিং কোর্সে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে তাঁর দফতরে একান্তে ডেকে নিয়ে খুব উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন। তিনি সব সময়ই আমাকে নাম ধরে ডাকতেন এবং আপনি বলতেন। তিনি বললেন, 'নজরুল সাব, জীবনে এক বিরল সুযোগ পেয়েছেন দেশের কাজ করার। এ সুযোগকে পুরোপুরি করায়ত্তকরণ এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগই এই মুহূর্তের একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধার কাজ। আপনার সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী।'

তাজউদ্দীন সাহেবের বাড়ি আমাদের পার্শ্ববর্তী থানা কাপাশিয়ায়। আর আমার বাড়ি মনোহরদী থানায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সূচনাপর্বে আমাদের এলাকা ছিল তাজউদ্দীন আহমদের চারণক্ষেত্র। আমি তখন গ্রামের হাই স্কুলের ছাত্র। ছাত্র লীগের একজন সাধারণ কর্মী। সেই সুবাদেই তাঁর সাথে সম্পর্কের এই নিবিড়ত্ব ও গভীরতা সৃষ্টি হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর দফতরে আমাকে বললেন সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্সের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে। তিনি আমাকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমি যেন একজন আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক কর্মীর মতো সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করি। এ প্রসঙ্গে তিনি এদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রয়োজনে বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কর্মীদের সুইসাইড করার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

এরপর জেনারেল ওসমানীর পালা। তিনি বললেন, 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার যুদ্ধের প্রচারের কৌশল হিসেবে অনেক গোপন তথ্য নিয়ে ডিলিং করতে হবে। যুদ্ধের সময় এ ধরনের কোনো তথ্য শত্রুপক্ষের কাছে পাচার হওয়ার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের কোর্ট মার্শাল করে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে। মনে রাখবেন, আমাদের জন্যে এটা একটা অগ্নিপরীক্ষা। আমরা বাঙালিরা কোনোদিন জাতি হিসেবে কোনো যুদ্ধে জড়িত হইনি। তাই এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। আজ জাতি হিসেবে আমরা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত। আজ আমরা ইতিহাসের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। জাতি হিসেবে আমদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার সময় এটা। আপনাকে এসব বুঝতে হবে।

থ হয়ে নীরবে বসে শুধু শুনছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। জীবনে কোনোদিন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। মাথা ভারী হয়ে গিয়েছিলো, এ কোন ফাড়া কলে এসে পড়লাম! পরিচিতজনদের কেউ কেউ কলকাতা, দিল্লী, বোম্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি এসে পড়েছি যেন এক বন্দীশালায়! মনে মনে এ সব ভাবছিলাম। সেদিনের মতো রেহাই পাওয়া গেলো।

পরদিন সকাল দশটায় হাজির হলাম ইন্ডিয়ান আর্মির ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে। দোতলায় তাঁর অফিস। কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। আমার পরনে সাদামাটা প্যান্ট-শার্ট। ভেতরে ঢুকে ইংরেজীতে গুড মর্নিং বলে তাঁর সামনে গেলাম। চেহারা-সুরত, পোশাক-আচরণ, দুই কাঁধ ও পকেটের ওপর সামরিক ব্যাজ ইত্যাদি দেখে তাঁকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। সাইজে আমার দ্বিগুণ। সামরিক ব্যক্তি তিনি। আমি সম্পূর্ণ আনস্মার্ট এক অজ পাড়াগাঁয়ের সিভিলিয়ান। তিনি ভিন ভাষায় কথা বলেন, সামরিক কায়দায় ইংরেজী, হিন্দী কখনো উর্দুতে। আমি ইংরেজীতে কথা বলায় পারদর্শী নই। উর্দু-হিন্দী জানি না— বুঝিও না।

রিখীর চেহারা ছিল পাকিস্তানের পাঞ্জাবী সেনা অফিসারের মতো। ভাবলাম এক উর্দুভাষীদের অত্যাচার হতে বাঁচতে এসে আবার কোন ভাষীদের হাতে পড়লাম। কিন্তু উপায় ছিল না। বুঝবার জন্যে আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। কর্নেল রিখীর অফিসে কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাও ছিলেন সাদা পোশাকে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা। তিনি আমাদের বরিশাল জেলার অধিবাসী ছিলেন এক সময়। উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় গিয়ে পুনর্বাসিত। খুব খুশি হলেন তিনি নিজ মাতৃভূমির লোক পেয়ে।

কর্নেল রিখীর অফিসে গিয়ে আমাকে আরেক দীর্ঘ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। সেখানে আমার সম্পর্কে বলতে গেলে এক কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট হলো। এখন এসব বলা ঠিক হবে কি না তা-ও বুঝতে পারছি না। আমাকে আপদমস্তক জরিপ করে বসতে বললেন কর্নেল রিখী। সেখানে সেদিন ছিলেন কর্নেল বুরাহ। শুনেছি তিনি ভারতীয় ডিফেন্স ইন্টিলিজেন্সের লোক। পরবর্তীতে বোধহয় জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো আমার নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বাপ-দাদার নামধাম, পেশা ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে। এরপর চা-পর্ব।

জিজ্ঞেস করলেন, টি অর কফি?

ভারতের দার্জিলিং-এর কফির লোভ সংবরণ করে বললাম, টি।

হোয়াইট অর ব্ল্যাক?

থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইলাম, বুঝলাম না। এর আগে কোনোদিন টি হোয়াইট অর ব্লাক—একথা শুনিনি। দূরে বসা বরিশালের বাঙালি দিদিমণি মুচকি হেসে সাহায্যে এগিয়ে এলেন, বাংলায় বললেন লিকার চা না দুধ চা।

বললাম, যে কোনো একটা হলেই চলবে। হাল্কা পাতলা লেবুর চা এলো।

কর্নেল রিখী কিছু কিছু বাংলাও বলতে পারতেন। চা-পর্বের পর কর্নেল রিখী ও সাদা পোশাকধারী কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তা শুরু করেন। প্রশ্ন করলেন, মিস্টার নজরুল, তোমরা কেন দেশ ছেড়ে মা-বোন সহায় সম্পত্তি ফেলে রেখে আমাদের দেশে এলে?

বিস্তারিত খুলে বললাম। বললাম, ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা। এখনো তো নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড চলছে।

তোমরা এখন কি চাও?

বললাম, স্বাধীনতা চাই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা আর থাকতে চাই না। সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যেতে চাই।

ভালো কথা। কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যও মুসলমান। এক মুসলমান ভাই আরেক মুসলমান ভাইকে মারবে কেন, হত্যা করবে কেন? কেন, তোমরা কি ইসলাম ধর্ম মানো না? তোমরা কি মুসলমান নও?

বললাম, আমরা সত্যিকারের মুসলমান। আমাদের দেশে প্রতি গ্রামে মসজিদ আছে। সেখানে নিয়মিত আজান হয়, নামাজ হয়, বাড়িতে কোরান পাঠ হয়। আর এই যুদ্ধও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়।

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে আমাদের পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ, সীমাহীন শোষণ, পূর্ব বাংলার মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখা, এমন কি বাংলা ভাষার পরিবর্তে আমাদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়া, এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর দলের এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর বছরের পর বছর নির্যাতন নিপীড়ন ইত্যাদি ইতিহাস বর্ণনা করলাম। তাঁরা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তাহলে তোমাদের যুদ্ধটা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়? ন্যয়ের জন্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাই বলছ? নারী নির্যাতন, মা-বোনের উপর নির্যাতন, নির্বিচারে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি অপকর্ম কি ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে? এসব কাজ কি মুসলমানের কাজ হতে পারে?

বললাম, না। ইসলাম ধর্ম এসব অপকর্ম সমর্থন করে না। এগুলো অধর্মের কাজ। অনৈসলামিক কাজ।

আমার কথা শেষ না হতেই রিখী বলে উঠলেন, তাহলে তোমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমান ভাইয়েরা পূর্ব পাকিস্তানে যে সব কাজকর্ম করছে তা অনৈসলামিক ও অর্ধমের কাজ করছে—তুমি একজন মুসলমান হয়ে একথা বলছো? তুমি বলতে চাচ্ছো ওইসব অধার্মিক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ? ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে বরং তোমরা যুদ্ধ করছো?

বললাম—জ্বি হ্যাঁ।

নজরুল, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কথা জানো কি? সে সময় তুমি কি করতে?

বললাম, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আমি আমার গ্রামের হাই স্কুলে পড়তাম।

তুমি কি চেয়েছিলে?

বাংলা ভাষার পক্ষে ছিলাম।

তুমি কি আন্দোলনে যোগদান করেছিলে? সে সময় কি তোমাদের দেশে কোনো ছাত্র সংগঠন ছিল? তুমি ছাত্র সংগঠনে ছিলে?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন। বললাম, হ্যাঁ, আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে থানা পর্যায়ে যোগদান করেছিলাম। সে সময় ছাত্র লীগ ছিল ছাত্রদের সংগঠন। আমি সেই ছাত্র সংগঠনের থানা পর্যায়ের একজন সদস্য ছিলাম।

আচ্ছা বলো তো রাষ্ট্রভাষা বাংলা চেয়েছিলে কেন তুমি?

বললাম, বাংলা ভাষা মায়ের মুখের ভাষা। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মায়ের কাছ থেকে এ ভাষাই শিখেছি। সেই থেকে এ ভাষায়ই কথা বলছি, লেখাপড়া শিখছি। ইংরেজদের আমলে আমরা মুসলমান ইংরেজি শিখিনি বলে চাকরি পাইনি। এখন

আবার উর্দু শিখতে না পারলে আমরা বাঙালিরা চাকরি পাবো না পাকিস্তানে। এছাড়া আমরা মায়ের মুখের ভাষার অমর্যাদা হতে দেবো কেন? মায়ের ভাষার অমর্যদা হতে আমরা বেঁচে থাকতে দিতে পারি না।

বড় রকমের হাসি দিয়ে তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন, ঠিক বলেছো, তুমি ঠিক কথা বলেছো। তুমি বলেছো মায়ের ভাষার অমর্যদা হতে দেবে না, অর্থাৎ তোমার মায়ের অমর্যাদা হতে তুমি একজন সন্তান হয়ে দিতে পারো না। তেমনি তোমার বোনের অমর্যাদা হতেও তুমি দেবে না। এখন তোমার দেশে তোমার মা-বোনকে তোমাদের পাকিস্তানী মুসলমান ভাইয়েরা নির্যাতন করছে—তাদের ইজ্জত নষ্ট করছে—অর্থাৎ তোমার দেশ বা মাটির উপর পাকিস্তানীরা হামলা করছে, অত্যাচার করছে—তোমার মা বোনকে বন্দীশালায় আটকিয়ে রেখেছে—এরই বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করতে এসেছো। তোমাদের মা-বোনকে উদ্ধার করতে, তোমার মাতৃভূমিকে দখলদার হানাদার বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করতে তোমরা আমাদের সাহায্য চাচ্ছ। তোমাদের নিরাপত্তা দরকার, অস্ত্র দরকার, অস্ত্র চালনা শিক্ষা দরকার, দরকার বিশ্বের সব মানুষ ও সকল রাষ্ট্রের সমর্থন—এই তো মোটামুটি তোমার বক্তব্য, তাই না?

ঠিক আছে। তোমাকে তোমার সরকার আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন সাইকোল-জিক্যাল ওয়ারফেয়ার শিক্ষা করতে। অর্থাৎ তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কিভাবে করবে, কোন কৌশলে করলে তোমরা জয়ী হতে পারবে, বিশ্ববাসীর সহানুভূতি, সমর্থন ও সাহায্য পাবে সেই কৌশলগুলো শিক্ষা করার জন্যে তোমার সরকার তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কাজেই বুঝতে পারছো তোমার দায়িত্ব ও কাজ কি?

এরই মধ্যে তুমি কিন্তু আমাদের কাছে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছো। কেন তোমরা যুদ্ধ করছো, কি তোমরা চাও, তোমরা কি ধর্মের বা ইসলাম বিরোধী? তোমরা ইসলাম ও ধর্ম রক্ষার জন্যে, মা-বোনের মান-ইজ্জত, মর্যাদা রক্ষার জন্যে, মা-বোনকে বলতে পারো মাতৃভূমিকে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে আনার জন্যে এ যুদ্ধ করছো। সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের মূল কথা—বিষয়বস্তুগুলি কিন্তু তুমি অলরেডি বলে ফেলেছো। বুঝলে? তুমি যে কথাগুলো এখানে বলেছো সে কথাগুলোই সুন্দর করে লিখে তোমার দেশের পত্র-প্রত্রিকা, ম্যাগাজিন, তোমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভারতের আকাশবাণী ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পত্র-প্রত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমে প্রচারের জন্যে পাঠাবে। তোমার দেশের কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক যাঁরা যেখানে আছেন তাঁদেরকেও বলবে সব কথা লিখতে। বুঝলে? এটাই হচ্ছে প্রাথমিক সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার।

মনে রাখবে, অসির চেয়ে মসি শক্তিশালী। অর্থাৎ তোমাদেরকে কলমের যুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের নবীজীরও শিক্ষা রয়েছে। তোমাদের নবীজী (সাঃ) বলে গেছেন, একজন শিক্ষিত লোকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও বেশি পবিত্র। নজরুল, আজ তোমাদের সময় উপস্থিত তোমাদের প্রিয় নবীর একথা প্রমাণ করার। তোমার দেশ তোমার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা, বন্দীশালা থেকে মা-বোনকে উদ্ধার করার জন্যে, বিশ্ব বিবেককে তোমাদের কাজের প্রতি জাগ্রত করার জন্যে তোমরা কলম ধরো, তোমরা কলমের যুদ্ধ শুরু করো। তোমাদের ভাষা-আন্দোলনের

চেতনা, মাতৃভাষা রক্ষা করার চেতনা—অস্ত্রের দান নয়। কামান বন্দুক মেশিনগানের দান নয়। অসির দান নয়। কলমের দান, মসির দান। আজ তোমাদের স্বাধীনতার যে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এ চেতনা সৃষ্টি কোনো সেনাপতি করেননি, করেছেন তোমার দেশের কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরাই লিখতে লিখতে তোমার দেশবাসীকে জাগ্রত করেছেন। আজ সেই জাগ্রত বিবেক শক্তি হয়ে মাথা উঁচু করেছে। এই জাগ্রত শক্তির সার্ভেন্ট বা হাতিয়ার যা-ই বলো, সে হিসেবেই অস্ত্র আজ কাজ করবে। অস্ত্র ক্রয় করা যায়, ধারও করা যায়। কিন্তু চেতনা ক্রয় করা যায় না—ধারও করা যায় না। অতএব, বুঝতে পারছো তোমাদের বিজয় শতকরা ৮০ ভাগ নির্ভর করবে তোমাদের লেখনীর উপর, তোমাদের বক্তব্যগুলো বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপনের ভাষা ও কৌশলের উপর। আর ২০ ভাগ নির্ভর করবে অস্ত্রের উপর।

তোমাদের প্রতি বিশ্ববাসীর নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন–সাহায্যের মনোভাব সৃষ্টি, হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেয়া, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর মনে ঘৃণা ও নিন্দা সৃষ্টি করা এ সবই নির্ভর করবে তোমাদের লেখনী ও প্রচারকৌশলের উপর। এটাকেই বলে সামরিক ভাষায় সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। তোমরা আজ এই কলমের যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধের পেছনে যাবে অস্ত্র। অস্ত্র সাহায্য তোমরা পাবে। অস্ত্র সাহায্য পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। প্রচার এবং প্রচারের কৌশল হচ্ছে যুদ্ধ জয়ের আসল অস্ত্র এ কথা মনে রেখে কাজ করবে। আমরা কেবল সাহায্য করতে পারবো। কিন্তু আসল কাজ তোমাদেরকে করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা, মেধা, কৌশল ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যেতে, তোমাদের মা–বোনকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে পারবে কিনা? আজ এ পর্যন্তই থাক। এরপর শুরু হবে আসল কাজ।

এত বাণী শুনে আমার মাথা ধরে গিয়েছিলো। মাথা ভারী হয়ে গিয়েছিলো। মাথা ফেটে এ সব কথা বের হয়ে পড়বে কিনা তাই চিন্তা করছিলাম।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যাদেরকে মনে করে এসেছিলাম চরম শত্রু আজ এই ঘোর বিপদের দিনে এক চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সেই শত্রুর এই বাণী কি গ্রহণ করবো? এই বাণী কি বিশ্বাস করবো? এই বাণী কি মিথ্যা? এমনই নানা অন্তর্দ্বন্দ্বে আমি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলাম ভেতর থেকে।

আজ কে শত্রু আর কে মিত্র তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বারবার বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। কর্নেল রিখীর অফিসকক্ষে চার দেয়াল জুড়ে বাংলাদেশের এক পূর্ণদৈর্ঘ্য মানচিত্র। রেলপথ, নদীপথ, সড়কপথ, থানার সঙ্গে মহকুমার, মহকুমার সঙ্গে জেলা সদরের যোগাযোগের ব্যবস্থা, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির অবস্থান রয়েছে এই বিশাল মানচিত্রে। বিচিত্র রঙের বড় আকারের আলপিন দিয়ে মানচিত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত। সাদা পোশাকধারী কর্মকর্তা তাঁর হাতের লম্বা ছড়ি দিয়ে এক নিমেষের মধ্যে আমার মনোহরদী থানা এবং ঢাকা থেকে মনোহরদী এমনকি মনোহরদী হয়ে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা বের করলেন। যেন এসব রাস্তাঘাট তাঁদের কত পরিচিত! বাংলাদেশের ভেতরের রাস্তাঘাট, রাস্তার উপরকার সেতু, কালভার্ট ও কালভার্টের বহনক্ষমতা, নদ-নদী-খাল-বিল, কোন মওসুমে কত পানি থাকে এসব নদনদী ও খাল বিলে, সবই এদের নখদর্পণে। তিনি

আমাকে বললেন, নজরুল, তোমাদের বাড়ি থেকে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ যেতে হলেও একটি নদী পার হতে হবে মঠখলা নামক একটি বড় বাজারের কাছে, তাই না?

বললাম, হ্যাঁ।

আচ্ছা বলো তো ডিসেম্বর মাসে ওই নদীতে মাঠখলার কাছে কত পানি থাকে? তখন কি গাড়ি পার করা যাবে ওখান দিয়ে?

ডিসেম্বর মাসে মঠখলার কাছে কত পানি থাকে তা তো কোনোদিন চিন্তা করিনি, প্রয়োজন হয়নি জানার। বললাম, তখন বেশ পানি থাকে। গাড়ি পারাপার করা যাবে না—ইঞ্জিন ডুবে যাবে।

ডিসেম্বর মাসে তো ফেরী দিয়েও গাড়ি পার করা যাবে না—তাই না?

বললাম, হ্যাঁ।

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্সের দ্বিতীয় দিন আমাকে বলা হলো আমরা যেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ধর্মীয় অনুভূতির পরিপন্থী কোনো কিছু প্রচার না করি, আকারে ইঙ্গিতে কোনোভাবেই যেন ধর্মের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ কোনো কিছু না করি। পরামর্শকরা বললেন, তোমাদের জনগণ খুবই ধর্মপ্রাণ। তাদের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগে এমন কিছু যেন না করে প্রচার মাধ্যমে।

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের পশ্চিম পাকিস্তান, তোমাদের বাংলাদেশ, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচার করছে মুসলিমপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ধ্বংস করে ওটাকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এক করে ফেলার চক্রান্ত করছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। এই চক্রান্ত বানচাল করে দেয়ার জন্যে ইসলামের সৈনিক ও রক্ষক পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান শুরু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে এ কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। তাই তোমাদের প্রচারণার লক্ষ্য হবে পাকিস্তানী মিথ্যা প্রচারণা খণ্ডন করে একথা বলা যে, এই যুদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বরং বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মুসলমান নারীদের উপর যে পৈশাচিক নির্যাতন করেছে, মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে এবং মসজিদে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, ইসলাম ও ধর্ম বিরোধী যে সব কাজ-কর্ম করছে এ সবের বিরুদ্ধেই তোমাদের এ যুদ্ধ। এ ধরনের কোনো ছবি থাকলে তা কপি করে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ছাপাতে দাও।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কোরান পাঠ, কোরান-হাদিসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালা জোর প্রচার করবে। প্রয়োজনে উর্দু ভাষাতেও প্রচার করবে। তুমি তো প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের লোক। তাঁকে বলবে এসব কথা।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি বিভাগ পাকিস্তান সরকারের প্রচারিত সবকিছু মনিটরিং এবং বিশ্লেষণ করে। মাঝে মাঝে পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকার কাটিংগুলো পড়তে দেয়া হতো। এরপর বলা হতো এর কাউন্টার বক্তব্য লিখে প্রচার মাধ্যমে সরবরাহ করতে। লক্ষ্য করলাম ভারতীয় বাহিনী পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ আগরতলার সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি বাংলাদেশের ভেতরে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা কোনো কর্মতৎপরতা না চালায় সে

ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিল। তারা বলতো, ওদিক দিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত করলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আগরতলার দিকে কামানের গোলা বর্ষণ করতে পারে। কাজেই যুদ্ধ পূর্ব দিকে না নিয়ে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের দিকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল বরাবর।

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্সের আলোচনার নীতিমালার ভিত্তিতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করার জন্যে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে গণসংযোগ বিভাগে কিছু বিশ্বস্ত সাংবাদিক ও ভালো লেখক নিয়োগ করতে তাঁরা পরামর্শ দিলেন আমাকে। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং জেনারেল ওসমানী সাহেবকে একথা জানালাম। এ সুযোগে আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম সাহেব বিশ্বস্ত আওয়ামী লীগ কর্মী ও ঢাকার খিলগাঁও বেসরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক নুরুর রহমানকে ঢুকিয়ে দিলেন আমার দফতরে প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল ওসমানীকে বলে। এ সময় সুজিত কুমার নামক ঢাকার একজন ফটোগ্রাফারকেও আমার দফতরে নিয়োগ করা হয়। এছাড়া ছাত্র লীগ নেতা দৈনিক *ইত্তেফাকের* সাহিত্য পাতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আল মুজাহিদী, কবি আল মাহমুদ প্রমুখকে আমার দফতরে নিয়োগ দেয়া হয়। জোরেসোরে প্রচার কাজ চলছিল। এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বহির্বিশ্ব বিষয়ক প্রচার বিভাগ সংগঠিত করা হলো *ইত্তেফাকের* তৎকালীন শক্তিশালী রিপোর্টার তাহের উদ্দিন ঠাকুরের নেতৃত্বে। ওখানে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ (বর্তমানে বিএনপি নেতা), আমিনুল হক বাদশা প্রমুখ তাহের উদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে কাজ করতেন। ওখান থেকে ইংরেজী ভাষায় বাংলাদেশ নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করা হতো। তাহের উদ্দিন ঠাকুরের চেষ্টায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বহির্বিশ্ব বিষয়ক প্রচার বিভাগ এবং মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের গণসংযোগ বিভাগের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের একটা নিয়মিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

জেনারেল ওসমানী শুধু মুক্তিবাহিনীর প্রধানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নবাগত রাজনীতিকও। ৭০-এর নির্বাচনের আগে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সিলেটের বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হঠকারিতার জন্যে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ আর বসতে পারেনি। এরই অনিবার্য পরিণতিতে এই যুদ্ধ। জেনারেল ওসমানী একজন কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তান সেনাবহিনীতে বাঙালি সৈনিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অবহেলিত বাঙালি সৈনিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নেতৃত্ব দেয়ায় বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন। এজন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বঙ্গশার্দুল কর্নেল ওসমানীর ভাগ্যে আর পদোন্নতি জোটেনি। বরং তাঁর উপর চলেছিল মানসিক নির্যাতন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাহোর দখলের মোকাবিলায় ব্যর্থ তথাকথিত মার্শাল জাতি পাকিস্তানের পাঞ্জাবী সেনাদের পলায়নের মুখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুর্ধর্ষ বঙ্গশার্দুলদের অপরিমিত শৌর্য-বীর্য ও দুঃসাহসিক

প্রতিরোধযুদ্ধ দেখে ঈর্ষান্বিত পাকিস্তানী সেনানায়কদের মনে বাঙালি সৈনিকদের সম্পর্কে ধুকধুকি শুরু হয়েছিলো। তাই ৬৫ যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বালুচ ও ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের সৈনিক ঢুকিয়ে একটি মিশ্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুনর্গঠন করতে তারা উদ্যোগ নিয়েছিল। কর্নেল ওসমানীসহ অন্যান্য বাঙালি সেনানায়কের বিরোধিতার মুখে তাদের সে প্রচেষ্টা সেদিন সফল হতে পারেনি। এ কারণে রুষ্ট পাকিস্তানী সেনানায়করা কর্নেল ওসমানীকে প্রমোশন দেয়া তো দূরের কথা, আগেই অবসর দান করে। মুজিবনগর সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণের পরও তিনি কর্নেলের উপরের কোনো পদে উন্নীত হননি। স্বাধীনতার পর তাঁকে পূর্ণাঙ্গ জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। জেনারেল পদে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কর্নেল ওসমানী নামেই অভিহিত হতেন।

মুজিবনগর বা কলকাতায় মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে আমরা যারা ওসমানীর সঙ্গে কাজ করতাম, তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যথিত হতাম যখন ভাবতাম যে, যিনি একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক—তাঁর পদবী শুধু একজন কর্নেল! আমাদের অনেকের মতে মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক বা প্রধান সেনাপতি হিসেবে তাঁর পদবী হওয়া উচিত অন্তত মেজর জেনারেল।

আমি যখন সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্স করার জন্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের একজন কর্নেলের কাছে যেতাম, তখন আমি খুব লজ্জাবোধ করতাম। কারণ, আমার দেশের প্রধান সেনাপতি মাত্র একজন কর্নেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী মিলে গঠিত হয়েছিলো জয়েন্ট কমান্ড বা যৌথ কমান্ড। যৌথ কমান্ডে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর যে স্টাফপ্রধান প্রতিনিধিত্ব করতেন তাঁর সামরিক পদবী ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল। এমন কি, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধানও ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। অর্থাৎ জেনারেল। আমি যখন মিত্র বাহিনীর কোনো সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ করতে যেতাম তখন মনের দিক থেকে এবং নৈতিকতার দিক থেকে নিজেকে দুর্বল মনে করতাম ভীষণভাবে।

যৌথ কমান্ডে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও কোনো সময় যৌথ কমান্ডের কোনো বৈঠক হতে দেখিনি। কিংবা যৌথ কমান্ডের দুই নায়ককে এতবড় একটা যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে একত্রে মিলিত হয়ে পরামর্শ বা আলোচনা করতেও দেখিনি। এমনকি ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরাকেও কোনোদিন দেখিনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান এবং যৌথ কমান্ডের বাংলাদেশের প্রতিনিধি ওসমানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে! তবে সকলের অজান্তে কিংবা অতি গোপনে তাঁদের মধ্যে এ ধরনের কোনো বৈঠক কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা তা অবশ্য বলতে পারবো না। আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে এমন কথাও শুনিনি।

মুজিবনগর অবস্থানকালে ওসমানী সাহেব তাঁর অফিস থেকে কদাচিৎ বাইরে যেতেন। বড়জোর তাঁর নিজ ঘরের পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে গিয়ে পাশের ঘরে

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের কক্ষে যেতেন। এছাড়া সারাক্ষণই তিনি অফিসে বসে কাজ করতেন। শুধু রাতে অফিসের পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমোতেন।

হয়তো সামরিক প্রটোকলে অবস্থানগত দূরত্বের কারণেই মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল ওসমানী এবং ভারতীয় বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মানেকশ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. এস. অরোরার মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ হয়নি। বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়নি যে যৌথ কমান্ডের দুই নেতার বৈঠকে মিলিত হওয়ার মাঝখানে সামরিক প্রটোকলগত এক বিশাল প্রাচীর বিদ্যমান ছিল।

আমার কাছে মনে হয়েছে, কর্নেল ওসমানী হয়তো এ কারণেই নিজেকে মুজিবনগরে আড়াল করে রাখতেন। কর্নেল রিখীর দফতরের কোনো এক ভারতীয় কর্মকর্তা আমার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের সরকার তোমাদের চীফকে প্রমোশন দিয়ে আমাদের জেনারেলের সমপর্যায়ে নিয়ে এলেই তো যৌথ কমান্ডের দুই প্রধানের প্রটোকলগত দূরত্ব চুকে যেতে পারে।

সিভিলিয়ান বলে সামরিক প্রটোকল সম্পর্কে আমার পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না। আমি বোকা কিংবা সরল-সোজা বলেই হয়তো ওসামনী সাহেব আমাকে স্নেহ কিংবা করুণা করতেন। আমি তাঁকে ভীষণ ভয় এবং দূর থেকে শ্রদ্ধা করতাম। অফিসিয়াল অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোনো কথা সরাসরি বলতেও ভয় পেতাম। তাঁর এবং আমার দূরত্ব সম্পর্কে সব সময়ই আমি সতর্ক এবং সজাগ ছিলাম। আমি জানতাম, ওসমানী সাহেব অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত কোনো কিছু ভালো চোখে দেখতেন না।

॥ ছয় ॥

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ভারতীয় লোকসভায় বিরোধী দলীয় সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ একদিন মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সমর গুহ তাঁকে একগুচ্ছ ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছিলেন। কর্নেল ওসমানীর এডিসি ক্যাপ্টেন নূর সে সময় অফিসে ছিলেন না। সমর গুহ চলে যাওয়ার পর ওসমানী সাহেব তাঁর রুমে সম্পূর্ণ একা। হয়তো একাকিত্ব দূর করার জন্যে আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। তখন তাঁর মুড ছিল চমৎকার। তিনি আমাকে আপনি করেই বলতেন। বললেন, নজরুল সাহেব, কি মনে হয়? দেশে কি শীঘ্র যাওয়া যাবে?

এ প্রশ্নের জবাব আমি কেমন করে দেবো? বললাম, স্যার আমারও তো এ প্রশ্ন।

তারপর বললেন, আপনি তো কর্নেল রিখীর কাছে যান। সেখানে ওদের বড় বড় অফিসার থাকেন। কিছু বুঝতে পারেন না?

না স্যার, ওঁরা তো আমার সঙ্গে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন না। তবে ওঁরা আপনার সম্পর্কে আমাকে একটা কথা বলেছেন। ওঁরা আমাকে বলেছেন, কেন আমাদের সরকার আপনাকে জেনারেল পদে উন্নীত করছেন না?

ওসমানী সাহেব তাঁর বিখ্যাত গোঁফ নাড়িয়ে সামান্য একটু হেসে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ওরা আবার কোনোদিন এ ধরনের কোনো কথা বললে বলবেন, আমরা

এখানে কোনো পজিশন একোয়ার করার জন্যে আসিনি। আমরা সবাই এখানে ফ্রীডম ফাইটার। যারা অন্য দেশে পরবাসী তাদের আবার পজিশন কিসের?

তারপর আমাকে উপদেশ দিলেন, ভালো করে কাজ করুন। মনে রাখবেন, আমরা এখানে ঘুরে বেড়াতে আসিনি।

একই ভবনের অন্য পাশের ঘরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব থাকতেন বলে মাঝে মাঝে রাত বারোটার পর আমি ও ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সাবেক কর্মী শাহাবুদ্দিন নিজাম তাঁর কাছে যেতাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবকে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। তিনি নিজে ইচ্ছে করে যা বলতেন, আমরা কেবল তা-ই শুনতাম। তবে তাঁর কাছে যাওয়ার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাঁর মুড দেখা। মুড ভালো দেখলে আমরা খুশি হতাম। ভরসা পেতাম। আর মুড খারাপ দেখলে আমাদের মুখও মলিন হয়ে যেত। তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে এসে পরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর মুডকে নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইতাম।

একদিন আমি একা রাতে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলাম। রাত বারোটা পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি খাটের উপর বসে সামনের টেবিলের উপর মাথা নুইয়ে ফাইল দেখছিলেন। খুব ভয়ে ভয়ে পা টিপেটিপে কাছে গিয়ে কোনো কথা না বলে একটি খালি চেয়ারে বসলাম। তাজউদ্দীন সাহেব মাথা নুইয়েই বললেন, কে, নজরুল? কি মনে করে? কোনো প্রবলেম?

বললাম, জ্বী না স্যার।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন লোকেরা কি বলে, কর্নেল রিখীর অফিসে ঠিকমতো ট্রেনিংয়ে যাই কিনা, ট্রেনিং কেমন লাগে, তারাই বা কি বলে ইত্যাদি। এসব কথার জবাব দেয়ার এক ফাঁক দিয়ে আমি বললাম, ওরা বলছে কেন আমরা আমাদের প্রধান সেনাপতিকে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের সমপর্যায়ে উন্নীত করি না।

তারপর আপনি কি বললেন?—প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, এটা সরকারের ব্যাপার, আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী ললেন, ঠিকই বলেছেন। তবে আপনারও তো এ সম্পর্কে কৌতূহল থাকতে পারে। শুনুন, ওসমানী সাহেব ভারতীয় সেনা প্রধানদের মতো পরিপূর্ণ সামরিক ব্যক্তি নন। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য। এসব বিষয় চিন্তা করতে হবে। যাক, এসব কথা যেন আর কোথাও আলোচনা না করেন। তবে এটা নয় যে আমি চাই না তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হোন। আগে দেশ স্বাধীন হোক।

এরপর এ প্রসঙ্গ ছেড়ে তিনি আমার সম্পর্কে কথা বলেন। বললেন, ওসমানী সাহেবের বক্তৃতা-ভাষণ ইংরেজী থেকে আপনার বাংলায় অনুবাদ দেখলাম। আপনি কমান্ডার ইন চীফ (সিএনসি)-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন সর্বাধিনায়ক। সিএনসির বাংলা তরজমা কিন্তু সর্বাধিনায়ক নয়—প্রধান সেনাপতি। আমাদের সরকার সামরিক নয়। সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সেনাপতি একই ব্যক্তি থাকেন।

এজন্যে প্রধান সামরিক শাসক ও প্রেসিডেন্ট তিন বাহিনীর পুরো দায়িত্বে থাকেন। এ জন্যেই তখন সেনাবাহিনী প্রধানকে সর্বাধিনায়ক বলা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তিন বাহিনীর তিন জন প্রধান থাকেন। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর সমনায়ক হিসেবে তিনি হন সর্বাধিনায়ক।

আমি খুব লজ্জিত হলাম।

মাসাধিককাল পর মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কর্নেল ওসমানী সাহেব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দেশবাসী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে সুশিক্ষিত সামরিক স্ট্যানোকে ডিকটেশন দিয়ে ইংরেজীতে ভাষণ প্রস্তুত করেন। পরে এ ভাষণ টাইপ ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন দিয়ে অনেকগুলো কপি করালেন। আমি কিন্তু এটা জানতাম না। কপি করার পর আমাকে ডেকে এনে ইংরেজী ভাষণের এক কপি দিয়ে বললেন, এটা বাংলায় অনুবাদ করে আমাকে দেখাবেন। আর এ ভাষণ উভয় ভাষায় রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে।

আমি তাঁর হুকুম তামিল করলাম। ভাষণের শিরোনামে 'কমান্ডার ইন চীফের' বাংলা অনুবাদ করলাম 'মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি'। ভাষণের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ করে তাঁকে দেখালাম। তিনি 'প্রধান সেনাপতি' শব্দ দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এটা প্রধান সেনাপতি হবে না। এটা হবে সর্বাধিনায়ক। আমি মহাবিপদে পড়লাম। কোনো কথা বললাম না। তাঁর কথা অনুযায়ী প্রধান সেনাপতি শব্দ কেটে সর্বাধিনায়ক লিখলাম। তিনি মোটামুটি শান্ত হলেন এবং ভাষণ রেকর্ড করার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁর ভাষণ রেকর্ডিং করার ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য আবদুল মান্নান সাহেবের পূর্ব অনুমতি লাগবে। আমি মান্নান ভাইয়ের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে সব কথা খুলে বললাম। প্রথমেই তিনি বললেন, ভাষণের কপি কোথায়? কপি নিয়ে এসো, আগে দেখে নিই? প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন কি?

বললাম, না।

নিয়ে গেলাম বাংলা অনুবাদ কপি এবং ইংরেজী কপি। বাংলায় অনুবাদ কপি দেখেই তিনি কমান্ডার ইন চীফ শব্দের বাংলা অনুবাদ সর্বাধিনায়ক করায় তীব্র আপত্তি করলেন এবং বললেন সর্বাধিনায়ক হবে না। প্রধান সেনাপতি লিখতে হবে। দ্বিতীয় কথা, ওসমানী সাহেবকে ভাষণ রেকর্ড করার জন্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে হাজির হতে হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার রেকর্ডিস্ট ওসমানী সাহেবের দফতরে যেতে পারবেন না।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কাকে কি বলবো? এক শাঁখের করাতের সম্মুখীন হলাম। অগত্যা ওসমানী সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে আমতা আমতা করে বললাম, স্যার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাকি মাত্র একটি রেকর্ডিং মেশিন। পরের দিনের প্রোগ্রাম রেকর্ড করার জন্যে মধ্যরাতেই এই মেশিনটির দরকার হবে। তাই তাঁরা বলেছেন যদি দয়া করে আপনি রেকর্ডিং কেন্দ্রে যান তাহলে সেখানেই আপনার ভাষণ রেকর্ডিং করতে তাদের সুবিধা হয়।

জেনারেল সাহেব থম মেরে রইলেন। কিছু বললেন না। একটা বিরক্তির ভাব দেখলাম তাঁর চোখেমুখে।

এরপর খানিকটা তাতানো কণ্ঠে বললেন, বাংলা অনুবাদ কপি করিয়েছেন কি?

আমি আমার হাতের লেখা বাংলা অনুবাদের কপি হাতে নিয়ে তাঁর সামনে রীতিমতো কাঁপছিলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোটরের চোখ কিছুটা বড় হয়ে উঠেছে। গোঁফগুলো কাঁপছে।

আমার কম্পিত হাতে বাংলা অনুবাদের কপিতে সর্বাধিনায়কের স্থলে প্রধান সেনাপতি লেখা। তদুপরি এখনো এটা সাইক্লোস্টাইল না করায় তিনি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, থাক, আমার ভাষণ রেকর্ড করার দরকার হবে না। এটা রেখে দিন।

তখন রাত প্রায় নটা কি দশটা হবে। আমি যে সেদিন কি মহাবিপদে পড়েছিলাম তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। যদি জেনারেল সাহেব রাতে বেতার কেন্দ্রে না যান ভাষণ রেকর্ডিং করতে তাহলে মান্নান ভাই মাইন্ড করবেন। আর এদিকে তো জেনারেল সাহেব রাগে লাল হয়ে দাঁতে দাঁত চুরে চোখ বড় বড় করে পায়চারি করছেন। বললেন, ঠিক আছে নজরুল সাহেব, ওসব কাগজ রেখে দিয়ে বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি দেশে গিয়েই দেশবাসীর কাছে ভাষণ দেবো।

আমি আর কোনো কথা বলার সাহস পেলাম না। কার কথা কাকে বলবো?

এ সময় আওয়ামী লীগের মোস্তফা সারোয়ারের গলার আওয়াজ শুনলাম প্রধানমন্ত্রীর অফিসের দিকে। উপায় না দেখে আমি মোস্তফা সরোয়ার ভাইয়ের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম। সরোয়ার ভাইও চিন্তায় পড়লেন। তবে আমার পক্ষ হয়ে জেনারেল ওসমানীকে সুপারিশ করতে গেলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন ভাষণ রেকর্ড করার জন্যে। তিনি নিজে গিয়ে রেকর্ডিং মেশিন এনে এখানে তাঁর অফিসেই রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করবেন—এই আশ্বাসও দিলেন। কিন্তু জেনারেল ওসমানী কিছুতেই আর রাজি হননি। এরপর তিনি নয় মাস যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আর কোনো ভাষণই দেননি।

জেনারেল ওসমানী ছিলেন একই সঙ্গে মাটির মতো নরম আবার ভীষণ জেদী প্রকৃতির মানুষ।

লন্ডন প্রবাসী সিলেটিরা মাঝে মাঝে লন্ডন থেকে ওসমানী সাহেবকে মূল্যবান কাপড়-চোপড় এবং ফলমূল পাঠাতেন। তিনি এসব কাপড়-চোপড় তাঁর গাড়ির ড্রাইভার, বয়-বেয়ারাকে দান করতেন। আর ফলগুলো তাঁর দফতরের ওসি সাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিলেটের এম. আর. চৌধুরী তাঁর কাছে রেখে দিতেন তিনি নাকি জেনারেল ওসমানী সাহেবের খুবই বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাই তাঁকে এনে হেডকোয়ার্টারের ওসি নিয়োগ করা হয়েছিলো। হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত অ-সিলেটি কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তা এই মেজর সাহেবের রগচটা আচার-ব্যবহারে খুশি ছিলেন না। ওসমানী সাহেবের জন্যে সিলেটবাসীদের পাঠানো ফলমূল সিলেটের কোনো লোক দেখা করতে এলে তাদেরকে খেতে দিতেন বৃদ্ধ মেজর। এ নিয়ে অধস্তন সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমালোচনার অন্ত ছিল না।

হেডকোয়ার্টারে দুটি গাড়ি ছিল। একটি গাড়ি ওসমানী সাহেবের জন্যে রিজার্ভ থাকতো। অন্য একটি টয়োটা জীপ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ওয়ার বুলেটিন বিতরণের জন্যে আমি ব্যবহার করতাম কোনো কোনো সময় হেডকোয়ার্টারের অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাগণও ব্যবহার করতেন। জেনারেল সাহেবের এডিসি ক্যাপ্টেন নূর মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে বাইরে যেতেন।

জুলাই আগস্টের দিকে মুক্তিযুদ্ধ আগের চেয়ে আরো বেগবান এবং জোরদার হয়। এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর মোটামুটি একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক আকার তৈরি হয়। পাকিস্তান থেকে বাঙালি সৈনিকরা পালিয়ে এসে মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার দুর্জয় প্রত্যয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে ছাত্র, যুবক, কৃষক, পুলিশ এবং সাবেক ইপিআর-এর সদস্য নিয়ে গঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা ও মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে অস্ত্রচালনা, আত্মরক্ষা এবং রণকৌশল সম্পর্কে মোটামুটি একটি ট্রেনিং নিয়ে বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

পাকিস্তান থেকে সুশিক্ষিত বাঙালি সৈনিকদের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ও শৃংখলা জোরদার হয়। একদিকে প্রবীণ সৈনিকদের শাণিত অভিজ্ঞতা ও সুনিপুণ দক্ষতা, অন্যদিকে টগবগে রক্তের তরুণ যুবকদের শত্রুহননের দুর্দমনীয় নেশা এক শক্তিশালী তরঙ্গমালায় রূপান্তরিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে বেগবান স্রোতের মতো প্রবেশ করতে থাকে। বহির্বিশ্বে ব্যাপক কূটনৈতিক অভিযান পরিচালিত হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে—বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। বিশ্বের যেখানেই সেদিন একজন বঙ্গসন্তান ছিলেন সেখানে নিজ অবস্থানে থেকেই তিনি গর্জে উঠতেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। কোনো কোনো দেশে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলোতে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দ মাতৃভূমির পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে সেসব দেশেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী নরপশুদের নৃশংস নরহত্যার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন।

বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বিভিন্ন দেশের সহানুভূতিশীল সরকারের বেসরকারি পর্যবেক্ষক দল আসতে থাকে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ড দেখার জন্যে। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন বের হয় বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অমানবিক হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে। ভারতীয় সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিদিন অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে আসতে থাকে নির্যাতিত নিপীড়িত গৃহহারা–স্বজনহারা বাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্রোত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয় শত শত শরণার্থী শিবির। এসব শরণার্থী শিবিরে অনাহারী ,অর্ধাহারী, রোগজর্জড়িত মানুষের আহাজারীতে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।

পার্শ্ববর্তী দেশের উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঠাঁই নেয়া বাংলাদেশের লাখ লাখ নারী-পুরুষ, শিশুর করুণ আর্তনাদ ও আহাজারীতে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়। বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক অধিকারের প্রশ্নে বিশ্ববিবেক সোচ্চার হতে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের এই উদ্বাস্তু মানুষের জন্যে নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী আসতে থাকে। কোনো কোনো দেশ থেকে কিছু অস্ত্র সংগৃহীত হয়। মুক্তিকামী বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোনো কোনো দেশ গোপনে অস্ত্র দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালিরা বিদেশী শহরে মিছিল বের করে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বিদেশের মাটিতে তারা শ্লোগান দেয়, অস্ত্র দাও না হয় মরতে দাও। বিশ্altবিবেক সাড়া দাও। বিশ্বের দেশে দেশে শহরে শহরে বাঙালিদের আহাজারীতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিসহ বিশ্বের মানবতাবাদী নেতারা ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানী সৈন্যদের বেয়নেট, বুলেট আর মেশিনগান দিয়ে অধিকৃত বাংলাদেশে মানবতাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করার নৃশংস ও লোমহর্ষক দৃশ্য দেখতে। আমাদের এগ্রেসিভ প্রচার-কৌশল ও প্রচারণা সেদিন বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, নিন্দা ও ঘৃণার ঝড় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। সাবেক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত গড়ে তুলতে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালান।

সাবেক এম.পিএ (মেম্বার অব দি প্রভিনসিয়েল এসেম্বলী) ও প্রখ্যাত আইনজীবী এডভোকেট ফকীর শাহাবুদ্দীন একদিন লন্ডন থেকে মুজিবনগর এলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলের শেষ নির্বাচনে অর্থাৎ ৭০-এর নির্বাচনে সাবেক প্রাদেশিক পরিষদে যাঁরা সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর তাঁরা সবাই এমসিএ বা মেম্বার অবদি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী (গণপরিষদ সদস্য) বলে পরিগণিত হন। এডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দীনের বাড়ি কাপাসিয়া থানার খিরাটি গ্রামে। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্যে ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া, সে সময় তাঁরা লন্ডনে *জনমত* নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কুশলাদি বিনিময়ের সময় ফকীর শাহাবুদ্দীন সাহেব আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাঁদের সাপ্তাহিক *জনমত* পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি করে প্রতিবেদন পাঠাতে। তিনি আমাকে লন্ডনে তাঁদের পত্রিকার ঠিকানা সংবলিত অনেকগুলো এয়ার ফ্লাই খাম এবং কয়েকটি প্যাড দিলেন। আমি নিয়মিত যুদ্ধের খবর পাঠাতাম লন্ডনে তাঁদের পত্রিকায়। এজন্যে আমি কোনো সম্মানী কিংবা পারিশ্রমিক চাইনি।

মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় স্থাপিত ছিল আসল মুজিবনগর এবং কলকাতাতে অর্থাৎ ভারতের যে কোনো স্থানে স্বাধীন বাংলা সরকারের কোনো কর্মকাণ্ড হলে তা সরকারিভাবে মুজিবনগরে হয়েছে বলে প্রচার করা হতো। বলতে গেলে সারা ভারতকেই আমরা সেদিন মুজিবনগর বানিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, বিশ্বের কাছে সেদিন আমাদেরকে বলতে হয়োছলো যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্তিত্ব বিদেশের বা ভারতের মাটিতে নয়—বাংলাদেশের ভেতরেই মুজিবনগরের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশ সরকারের সব কাজকর্ম মুজিবনগরে স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে সম্পন্ন করা হয়। তবে যেহেতু বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধ চলছে, গেরিলা ফাইটিং চলছে, তাই মাঝে মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও বিঘ্নিত হয়। এ কারণে ভারতের কলকাতা ও আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করা হয়েছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে।

মুজিবনগর গিয়ে মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর আমাকে এভাবেই পরামর্শ দেয়া হয়ছলো। কোনো বিদেশী প্রতিনিধি কিংবা বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বলতে হবে আমাদের সরকারের এবং মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার বাংলাদেশের ভেতরে অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে। কলকাতায় আমাদের লিয়াজোঁ অফিস। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্যে প্রতিদিন কলকাতা কিংবা আগরতলা লিয়াজোঁ অফিসে যাই।

বিদেশীদের কাছে আমাদের সঠিক পরিচয় বা ঠিকানা গোপন রাখার যুক্তি হিসেবে আমাকে বলা হয়েছিলো যে, গোটা মুক্তিযুদ্ধটাই একটি গেরিলা ফাইটিং। সব কিছুই গোপনে, শত্রুর অগোচরে করতে হবে। শত্রুপক্ষ যাতে আমার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। গোপন স্থানে থেকেই শত্রুর উপর আঘাত হানতে হবে, শত্রু খতম করতে হবে। এটাই হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের মূল দর্শন ও কৌশল। কাজেই কাজকর্মে সর্বক্ষেত্রে এই গেরিলা কায়দায় কাজ করতে হবে। এটাই ছিল আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বা অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। এই পদ্ধতির আলোকে কলকাতা শহরে কোনো পরিচিতজনের খোঁজ করতে গেলে ওই ব্যক্তির হিন্দু নাম বলতে হবে অপরিচিতজনের কাছে। যেমন কলকাতার নর্দান পার্ক এলাকায় এক বিশাল বাড়িতে আমার সুযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী *ইত্তেফাকে*র আমির হোসেন সাহেব থাকতেন। কলকাতায় বাংলাদেশেরই একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছে জনাব আমির হোসেনের ঠিকানা জানতে চাইলে তিনি আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ ঠিকানায় গিয়ে আমির হোসেন বললে বলা হবে ওই নামে এখানে কেউ নেই। আমি এই নির্দেশমতো ওই ঠিকানায় গিয়ে আমির হোসেন সাহেবকে পেয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে আমির হোসেন সাহেবের সঙ্গে আরো অনেককে পেয়েছিলাম। এর মধ্যে বর্তমানে *বাংলার বাণী*র সম্পাদক শফিকুল আজিজ মুকুল, সুব্রত বড়ুয়া (বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে একজন কর্মকর্তা) প্রমুখের সন্ধান পাই। ওই বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খান থাকতেন। তারা না থাকলে ওই রুম তালাবদ্ধ থাকত। ওখানে তখন ছাত্র লীগের বড় বড় নেতা, বিশেষ করে তোফায়েল আহমদ, আ স ম আবদুর রব যাতায়াত করতেন। পরে ওই ভবনের নিচের তলায় সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী*র অফিস স্থাপন করা হয়। আমার অতি প্রিয় সহকর্মী জনাব আমির হোসেনের অনুরোধে আমি সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী*তে যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতাম। আমির হোসেন সাহেবের সম্পাদনায় তখন সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী* প্রকাশ হতো। আমাদেরকে মোটামুটি সামান্য সম্মানী ভাতা দেয়া হতো। কলকাতা বা মুজিবনগরে বাংলাদেশের লোকদের পক্ষ থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা বের করা হতো, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও অতি অল্প সময়ে গ্রহণযোগ্য একমাত্র পত্রিকা ছিল *বাংলার বাণী*। কলকাতার

সংবাদপত্র জগতে সেদিন সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী* আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কলকাতার সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে *বাংলার বাণী* খুবই প্রশংসিত হয়েছিলো। এমনকি আকাশবাণীর সংবাদ পরিবেশনে এবং সংবাদ বিশ্লেষণেও মাঝে মাঝে *বাংলার বাণীর* উদ্ধৃতি বা বরাত দেয়া হতো।

॥ সাত ॥

বাংলাদেশের তরুণ সাংবাদিকদের প্রকাশিত *বাংলার বাণী* দেখে কলকাতার *আনন্দবাজার* গোষ্ঠী, *যুগান্তর*, পিটিআই, ইউএনআই, *হিন্দুস্তান টাইমস*, এমনকি *দি স্টেটসম্যান* পর্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল এবং *বাংলার বাণীর* তরুণ কর্মীদের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ ছিল। কলকাতায় পুনর্বাসিত সাবেক শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক, কলকাতার বাজারে বাঙালি তরুণদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকার জন্যে আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেতেন। কেউ কেউ বলতেন, এ পত্রিকার জন্যে কলকাতায় আমরা গর্ববোধ করি। এর মধ্যে কয়েকজন *বাংলার বাণীর* কর্মীদেরকে তাঁদের বাসায় দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছেন।

তবে *বাংলার বাণীর* প্রতি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ভীষণ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিলেন। কারণ, বাংলার বাণীতে বাংলাদেশের কোনো রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবরে মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিবাহিনী না লিখে লেখা হতো মুজিব বাহিনী।

বাংলার বাণীতে যেদিন প্রথম মুক্তিবাহিনীর স্থলে মুজিববাহিনী লেখা হলো, সেদিন জেনারেল ওসমানী আমাকে তাঁর একান্তে ডেকে নিয়ে খুবই কড়া ভাষায় বললেন, নজরুল সাহেব, মুজিববাহিনী কি? ওসব কারা লিখছে? কেন লিখছে? আপনি এ সম্পর্কে তদন্ত করে আমাকে জানাবেন। আর বলবেন যেন ভবিষ্যতে মুজিব বাহিনী আর না লিখা হয়। এতে আমাদের নিয়মিত বাহিনীতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আমিও *বাংলার বাণীতে* মাঝে মাঝে যুদ্ধের খবর লিখি, একথা জেনারেল সাহেব জানতেন না।

আমি মহা বিপদে পড়ে গেলাম। শেখ ফজলুল হক মণির পত্রিকা *বাংলার বাণী*। বিদেশের মাটিতে এ পত্রিকার উপর মুজিবনগর সরকারের কি নিয়ন্ত্রণাধিকার আছে? সেদিনের শেখ ফজলুল হক আর মুজিবনগর সরকারের মধ্যে তফাৎ কোথায়? একথাও কল্পনার বাইরে। এমনকি স্বয়ং মুজিবনগর সরকারও কি *বাংলার বাণীকে* নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো? না নিয়ন্ত্রণ করবে? কিন্তু একথা আমি কাকে বোঝাবো? যাহোক, জেনারেল ওসমানীর আজ্ঞা পালন করতে হবে। তাঁর আজ্ঞা অনুযায়ী আমি 'তদন্তকর্ম' সেরে দুদিন পর জেনারেল সাহেবকে মৌখিক রিপোর্ট দিলাম আমার মতো করে। বললাম, স্যার ওই পত্রিকা শেখ ফজলুল হক মণি সাহেবের।

একথা বলতেই জেনারেল সাহেবের উন্নত গোঁফগুলো নুয়ে গোলো। এরপর 'হু' বলে একটি গম্ভীর ধরনের শ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে। মনে হচ্ছে তাঁর সব রাগ যেন আমার উপর যেয়ে পড়ছিল। আমি আগেই বলেছি, জেনারেল ওসমানী সাহেবকে আমি কত ভয় করতাম, তা আমি নিজেই পরিমাপ করতে পারি না। সাক্ষাৎ যমকে

সামনে পেলেও বোধ হয় এভাবে ভয় করতাম না। আমি নীরব হয়ে তাঁর সামনে বসে রইলাম দৃষ্টি নিচে নামিয়ে। যেন আমি অপরাধী, কিন্তু আমার কি করার আছে? খোদ মুজিববাহিনীর সর্বাধিনায়কের পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের সামনে আমি তো অতি ক্ষুদ্র একটি তৃণখণ্ড ছাড়া আর কিছু নই।

তদন্ত? কিসের তদন্ত? কার তদন্ত? আর সেই তদন্ত করার আমি কে? ইত্যাদি প্রশ্নের ঝড় বয়ে চলছিল আমার ভেতরে। মনে হচ্ছিল, জেনারেল সাহেবের সামনে থেকে এ মুহূর্তে বের হয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম। কিন্তু তাঁর হুকুম ছাড়া এক পা নড়ারও উপায় ছিল না আমার। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জেনারেল সাহেব আবার মুখ খুললেন। ব্যক্তিগত জীবনে জেনারেল ওসমানী এক অনন্যসাধারণ অমায়িক ও বিনয়ী লোক। সত্যিকারের একজন ভদ্রলোক। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, এমন অমায়িক, বিনয়ী ও ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আমি আর কোনোদিন এসেছি বলে মনে পড়ে না।

স্বাধীনতার পর আমি তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্কুল রোডে আমাকে দেয়া এক ভবনে আমার স্ত্রী ও মা-সহ থাকি। আমার স্ত্রী হালিমা খাতুন তখন নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। রোজই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে শিক্ষকতা করতেন। আবার বিকেলে ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ফিরে আসতেন। মাঝে মাঝে আমি আমার আর্মি জীপ দিয়ে আমার স্ত্রীকে গুলিস্তান সাবেক বিআরটিসি বাস টার্মিনালে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসতাম।

একদিন সকালে আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে জীপে করে আমার স্ত্রীকে নারায়ণগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে গুলিস্তানের দিকে যাচ্ছিলাম। জীপের সামনে ড্রাইভারের আসনের পাশে বসা ছিলেন আমার স্ত্রী। আমিও সামনের আসনেই আমার স্ত্রীর বাঁ পাশে জীপের দরজার কাছে বসা ছিলাম। ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে আমার জীপ বের হতেই দেখলাম জেনারেল ওসমানী সাহেবের গাড়ি সামনে পড়ল। তিনি ঢাকা শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টে তাঁর অফিসের দিকে যাচ্ছেন। আমি ভেতরে চমকে উঠেছিলাম ঠিকই কিন্তু পাশে বসা স্ত্রীকে বুঝতে দিইনি। মনের ভেতরে তখন একটার পর একটা প্রশ্নের ঢেউ। আজীবন অবিবাহিত জেনারেল ওসমানী আমার পাশে একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে কি মনে করবেন। তিনি কি জানেন যে আমি বিবাহিত? আমার স্ত্রী আছেন, ছেলে আছে? নিশ্চয়ই জেনারেল সাহেব আমাকে তাঁর দফতরে ডেকে নিয়ে কৈফিয়ত করবেন। এমনই সব প্রশ্নের উথাল-পাথাল হচ্ছিল আমার মনের মধ্যে। একবার ইচ্ছে হয়েছিলো আমার অনুগত আর্মি ড্রাইভারকে বলি, জীপ ঘুরিয়ে আমার কান্টনমেন্টের অফিসের দিকে যেতে এবং আমার স্ত্রীকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রাস্তার উপর নামিয়ে দিয়ে বলি রিকশা কিংবা বেবী ট্যাক্সি করে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডে চলে যেতে। কিন্তু আনমনা অবস্থায় এসব চিন্তাভাবনা এবং স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ততক্ষণে জীপ এসে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে। জীপ থামলে আগে আমি নেমে আমার স্ত্রীকে নামতে দিই। আমার এই আনমনা ভাব ও উদাসীনতা কিন্তু পাশে বসা স্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত সারাটি পথে তার সঙ্গে আমার একটি কথাও হয়নি। জীপ থেকে নেমে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, তোমাকে ভীষণ চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছে। কি নিয়ে এত ভাবছো?

না তো তেমন কিছু ভাবনা নেই। জেনারেল সাহেব অফিসে অলরেডি বসে গেছেন। হয়তো গিয়ে আমাকে খোঁজ করতে পারেন। তাই তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হবে।

আমার স্ত্রী জীপ থেকে নেমে যাওয়ার পর ইউনিফর্ম পরা আর্মি ড্রাইভারকে বললাম সোজা ক্যান্টনমেন্ট অফিসে যাবো। শরীর আমার ঘামে ভিজে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে অফিসে নেমে জীপ ছেড়ে দিলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে নিলাম। তারপর অফিসের ভেতরে ঢুকেই পিয়নকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমায় খোঁজ করেছিলেন।

বলল, না।

হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। পিওনকে বললাম এক গ্লাস পানি দিতে। পানি খেয়ে বসে খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলাম আর ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করছিলাম জেনারেল সাহেব কখন ডাক পাঠান এবং মেয়েটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবো তার জন্যে। জবাবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যেই চট করে মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। আমার পিয়নকে ডেকে বললাম, জেনারেল সাহেবের ঘরের সামনে গিয়ে দেখ তো জেনারেল সাহেবের ড্রাইভার আছে কিনা? তাকে পেলে আমি ডাকছি একথা বলে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

পিওন আর দেরি করেনি, সেও একটু চা-পান খাওয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো। আমি তার পথপানে চেয়ে রইলাম। কখন জেনারেল সাহেবের ড্রাইভারকে নিয়ে আসবে। আমার সময় যাচ্ছিল না। পিওনের উপর ভেতরে ভেতরে আমার রাগ হয়েছিলো। বেটা চা-পান খাক। কিন্তু আগে তো ড্রাইভারকে আমার সামনে এনে হাজির করিয়ে যাবে।

চেয়ে থাকতে থাকতে অবশেষে সে ড্রাইভারেকে নিয়ে এলো। আর্মির চৌকস ড্রাইভার। তাও জেনারেল ওসমানীর ড্রাইভার। অত্যন্ত আদব কায়দার সঙ্গে স্যালুট দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। বললাম, অফিসে আসার সময় জেনারেল সাহেব আমাকে দেখেছিলেন, কিছু বলেছেন কি?

ড্রাইভার বলল, জ্বী স্যার, সারে আপনাকে চিনেছেন। আমাকে বলেছিলেন, জীপে পিআরও সাব না? আমি বলেছি, হ্যাঁ। আর কোনো কথা হয়নি। এ পর্যন্ত।

ওকে যেতে বললাম। ড্রাইভার চলে গেলে আবার মনের ভেতর উৎকণ্ঠার প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। আবার ঘামতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর এডিসি ফোন করলেন, পিআরও সাব। স্যার ডেকেছেন।

আমার অবস্থা তখন আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। কোনো হুঁশ-জ্ঞান ছিল না। দিনের পত্রিকার কাটিংয়ের ফাইল নিয়ে একমতো দৌড়েই গিয়ে হাজির হলাম সামনে। একজন খুনের মামলার ফাঁসীর আসামীর মতো। ফাইলটা তাঁর সামনে দিলাম। ওদিকে সামান্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, নজরুল সাহেব, সকালে ওদিকে, কোথায় যাচ্ছিলেন?

কম্পিতকণ্ঠে বললাম, স্যার একটু গুলিস্তানের দিকে যাচ্ছিলাম।

তারপরের প্রশ্ন : আপনার পাশে একজন মহিলাকে দেখেছিলাম। উনি কে?

আমি ঠিক জেনারেল সাহেবের কাছে এ প্রশ্নটিই চেয়েছিলাম। আল্লাহর অশেষ রহমত হিসেবে তাঁর এই প্রশ্নকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমার অজান্তেই আমার নিরুদ্বেগ মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ধীরস্থির ভাবে বললাম, স্যার উনি আমার স্ত্রী। তারপর ঢোক গিলে নিয়ে সত্য কথা বললাম। স্যার আমার স্ত্রী নারায়ণগঞ্জ গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে মাস্টারী করেন। আজ তার নারায়ণগঞ্জ যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো তাই তাকে জীপ দিয়ে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম।

জেনারেল সাহেব অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বললেন, নজরুল, মহিলাকে গাড়িতে কখনও ড্রাইভারের পাশে বসাবেন না। আপনি বসবেন ড্রাইভারের পাশে। আপনার পরে স্ত্রীকে বসাবেন। ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না হয়। আর আপনার স্ত্রীকে ঢাকায় কোথাও বদলী করে আনা যায় না? আপনি এডুকেশন মিনিস্ট্রির সঙ্গে পরিচয় দিয়ে কথা বলুন। না পারলে আমাকে জানাবেন।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মুখমণ্ডল ও ভেতরে যেন তীব্র গরমের পর বসন্তের দক্ষিণা বাতাস বয়ে গেলো। আল্লাহকে শুকরিয়া জানাতে জানাতে অফিসে চলে এলাম। ইনিই সেই অমায়িক, বিনয়ী, কোমল এবং এক স্নেহময় পিতাসম জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী।

একবার মুজিবনগরে সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ সস্ত্রীক জেনারেল ওসমানীর দফতরে যান। চা-পানের পর খালেদ মোশাররফের বিদায়ের পালা। বউকে নিয়ে অফিসের বাইরে গাড়ির দোরগোড়ায় এগিয়ে গেলেন। জেনারেল ওসমানী সাহেব নিজে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বেগম খালেদ মোশাররফকে গাড়ির ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করেন এবং বেগম খালেদ মোশাররফ গাড়ির ভেতর গিয়ে বসার পর বাইরে থেকে নিজে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইনিই সেই কোমলমতি এক মাটির মানুষ জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। কঠোর বদমেজাজী ক্রোধান্ধ জেনারেল ওসমানীর চেহারা কেমন?

কলকাতায় জেনারেল ওসমানীর দফতরে বাংলার বাণীতে মুজিববাহিনীর জয়জয়কারের খবরের রিপোর্ট নিয়ে আমি যেন আরেক জেনালের ওসমানীর সামনে বসেছিলাম। মুজিববাহিনীর খবর *বাংলার বাণী*তে প্রকাশ হওয়ার জন্যে যেন আমিই দায়ী, যেন সব দোষ আমার। ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রহর গুণছিলাম, কখন তিনি বলবেন, নজরুল সাহেব এখন আসুন। কিন্তু না। তিনি কিছু বললেন না। মাঝে মাঝে চুপে চুপে তাঁর চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে হয়েছিলো যেন জেনারেলের ক্রুদ্ধ দু'চোখ থেকে আগুনের ফুলকি বর্ষিত হচ্ছিল আমার উপর।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও পশুরাজ সিংহের ছবি বই-পত্রে দেখেছি। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও সিংহের হিংস্র চোখের অনেক গল্পও শুনেছি। কলকাতা চিড়িয়াখানায় খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে দেখেছি। বিরাট খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে খাঁচাবন্দী পশুরাজ হিংস্র সিংহ দেখার সুযোগ হয়েছিলো। ভয় পাইনি। কিন্তু সেদিনের রাগে ছটফট করার অসহায় জেনারেল ওসমানীর চোখে ক্রোধের যে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল, সে দৃশ্য মনে পড়লে এখনো ভয়ে শিউরে উঠি।

ক্রোধে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চেপে রেখে জেনারেল ওসমানী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সব কিছুতে একটা ডিসিপ্লিন আছে। এখানে আমরা রং-তামাশা করতে আসিনি। বিদেশের মাটিতে আমরা যে বিশৃংখলা ও অনৈক্য দেখাচ্ছি, তা জাতির জন্যে মঙ্গলজনক নয় নজরুল সাহেব। এতে আমাদের সম্পর্কে এদের ধারণা খুব খারাপ হবে। আর আমাদের এই অনৈক্য ও বিশৃংখলার কথা কি মনে করেন কলকাতার এই চার দেয়ালের ভেতরে বন্দী থাকবে। শত্রুপক্ষ এর সুবিধে নিশ্চয় নেবে। আপনি-আমি এখানে বসে বসে নানান বাহিনী গঠন করি, আর যে ছেলেটি বাংলাদেশের পথে-জঙ্গলে কিংবা নদীতে ট্রিগারে আঙ্গুল লাগিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে শত্রুহননের অপেক্ষায় বসে রয়েছে, তার কথা কি আমরা চিন্তা করি? বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনবো। আপনি আসুন নজরুল সাহেব।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জেনারেল সাহেবের ঘরে এ সময় আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। তাঁর রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজার বাইরে চৌকাঠে লালবাতি জ্বলছিল।

জেনারেল ওসমানী অত্যন্ত শৃংখলাপ্রিয়, নীতিবান এবং যুক্তিবাদী লোক ছিলেন। নীতি এবং যুক্তির প্রশ্নে তিনি খোদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও আপোস করেননি।

১৯৭৫-এর প্রথম দিকে যেদিন শেরে বাংলানগরস্থ তদানীন্তন গণভবনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একদলীয় বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, সেদিন এই অকুতোভয় সেনাপতি বঙ্গবন্ধুর সামনে বাকশাল গঠনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু' আপনাকে বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হিসেবে গ্রহণ করেন, শেখ মুজিবুর রহমান খান হিসেবে কেউ আপনাকে মেনে নেবে না।'

একথা হলভর্তি আওয়ামী লীগ নেতাদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের উপর বলে এই জেনারেল ওসমানী মন্ত্রিত্ব এবং জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে বিনাদ্বিধায় পদত্যাগ করে গণভবন থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরে তাঁর দফতরের কোনো এক ঘটনায় ক্যাপ্টেন পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন জুনিয়র সেনা অফিসারের যুক্তির কাছে এই জেনারেল ওসমানীই অকপটে হার মেনে নিয়েছিলেন।

॥ আট ॥

জেনারেল ওসমানীর দফতরের একপাশে ছিল মুক্তিবাহিনীর মেডিক্যাল কোরের সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর। এটার দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল ও মন্ত্রী) শামসুল হক। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশী ও বিভিন্ন বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত ঔষধপত্রসহ চিকিৎসাসামগ্রী গ্রহণ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরে মুক্তিবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতালে প্রেরণ করা ছিল মেডিক্যাল কোরের দায়িত্ব। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রলীগ নেতা, সম্ভবত মেডিক্যালের শেষ বর্ষের ছাত্র মোদাচ্ছের আলী, তাঁর এক মেডিক্যাল ছাত্রী-বান্ধবী (নাম তসলিমা কিংবা নাসিমা সঠিক মনে নেই); বর্তমান সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার জাফর উল্লাহ চৌধুরী তাঁর এক জার্মান

বান্ধবীসহ মুক্তিবাহিনীর এই মেডিক্যাল কোরে কাজ করতেন। মোদাচ্ছের আলী ও তাঁর ওই মেডিক্যাল ছাত্রী-বান্ধবীর মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো মধুর সম্পর্ক ছিল।

জেনারেল ওসমানীর ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের একজন সুদর্শন তরুণ স্টাফ অফিসারের সঙ্গে ওই তরুণী মেডিক্যাল ছাত্রীর বেশ ভাব জমে ওঠে। চেহারা ছুরতের দিক থেকে তেমন আকর্ষণীয় না হলেও ওই মেডিক্যাল ছাত্রীটি ছিল ভীষণ চটপটে, অনর্গল ইংরেজী বাংলা হিন্দী উর্দুতে কথা বলতে পারতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অফুরন্ত গল্প-গুজব করে আসর জমাতে পারতো। তার চোখেমুখে, চালচলনে, কথাবার্তায় চৌকসপনার আলো বিচ্ছুরিত হতো। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি ওই মেয়েটি খৃস্টান। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে সে মুসলমান। আমার সঙ্গেও তার সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

কালক্রমে ওই সুদর্শন তরুণ সেনা অফিসার ও ওই মেডিক্যাল ছাত্রীর সম্পর্ক মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে আলোচিত হতে লাগল। ওই সেনা অফিসার ও মেডিক্যাল ছাত্রী প্রায়ই বিকেলে একসঙ্গে কলকাতা শহরে বেড়াতে বের হতো। অথচ এর আগে কোনোদিন ঐ সেনা অফিসারকে তার দফতর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতে দেখাই যায়নি। এখন বিকেল হলেই তাকে আর দফতরে পাওয়া যায় না। প্রায়ই সদর দফতরের একটি গাড়ি নিয়ে তারা বেড়াতে যেত। বিষয়টি একদিন জেনারেল ওসমানীর কানে পৌঁছে।

ডাক্তার মোদাচ্ছের আলীর সঙ্গে আমারও খুব মধুর সম্পর্ক ছিল ঢাকায় থাকতেই। তাকে মাঝে মাঝে বিমর্ষ দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হতো।

এক সময় বেশকিছু দিন তাকে মুজিবনগর সদর দফতরে দেখতে না পেয়ে আমি ব্যথিত হয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম তিনি কিছুদিনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের কোনো একটি সেক্টরে ফিল্ড হাসপাতালে চলে গেছেন।

ওই সেনা অফিসার সদর দফতরের গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ফলে সদর দফতরের কাজকর্মে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হতে লাগল। একদিন স্বয়ং জেনারেল ওসমানী আবুল নামক ড্রাইভার ও তার গাড়ির খোঁজ করেন। এরপর তিনি জানতে পারেন যে, আবুল ড্রাইভারের গাড়িতে করে ওই সেনা অফিসার বেড়াতে বের হয়ে গেছেন।

জেনারেল ওসমানীর মেজাজ গরম হয়ে যায়। তিনি অনেক দিন থেকে ওঁৎ পেতে ছিলেন ওই জুটিকে ধরার জন্যে।

ড্রাইভার আবুল গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এলে জেনারেল সাহেব তাকে ডেকে তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে ধমকালেন, কেন গাড়ি নিয়ে ওই বেটা কলকাতার বিভিন্ন পার্কে ঘুরে বেড়ায়। ড্রাইভার আবুল কাকুতি মিনতির সঙ্গে বলল, স্যার আমার দোষ কি! আমাকে ক্যাপ্টেন সাহেব হুকুম করেন। আমি ছোট কর্মচারী। আমি তাঁর হুকুম তামিল করেছি। আপনি নিষেধ করলে আর কোনোদিন আপনার হুকুম ছাড়া গাড়ি নিয়ে বের হবো না।

জেনারেল সাহেব তাকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, ও. কে. তুমি যাও।

ড্রাইভার আবুল চোখ মুছতে মুছতে বের হয়ে এলেন জেনারেল সাহেবের ঘর থেকে। জেনারেল সাহেব তাঁর ঘরে ছটফট করছিলেন।

আমরা সেদিন ভেবেছিলাম এবার ওই ক্যাপ্টেনকে পেলে বুঝি আর রক্ষা নেই। সবাই কান খাড়া করেছিল।

সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন সাহেব সান্ধ্যবিহার শেষ করে সদর দফতরে ফিরে এলেন। সবই শুনেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা, জেনারেল সাহেব বাড়াবাড়ি করছেন। তাই তাঁর ভেতরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল জেনারেল সাহেবের উপর।

পরদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন সাহেব নিজেই জেনারেল সাহেবের রুমে গিয়ে সামরিক স্যালুট দিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। সাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত চৌকস অফিসার ওই ক্যাপ্টেন ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন, স্যার ড্রাইভার আবুলের সঙ্গে নাকি ভীষণ রাগারাগি করেছেন? ওর কোনো দোষ নেই। ওকে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম আমাকে গাড়িতে করে কোনো একস্থানে পৌঁছে দিতে। সে আমার আদেশ তামিল করেছে। সে আমার কমাণ্ডে। দোষ হলে আমার হয়েছে, অপরাধ করলে তা আমি করেছিলো। সামরিক নিয়ম অনুযায়ী আপনি রিবিউক (ভৎসনা) করতে পারেন। ওকে কোনো কৈফিয়ৎ করতে পারেন না।

তরুণ ক্যাপ্টেনের যুক্তির কাছে বৃদ্ধ জেনারেল ওসমানী নরম হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ জেনারেল একদম চুপ। মুখ দিয়ে কোনো কথা ফোটেনি। গোঁফ তাঁর নেমে গেলো। যুক্তির কাছে হার মানলেন জেনারেল ওসমানী।

পাথরের মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী জেনারেল ওসমানী যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে পিছপা হতেন না। যুক্তির কাছে তিনি মোমের মতো গলে যেতেন। সামরিক উর্দির দম্ভে কিংবা মার্শাল মেজাজে সব যুক্তিকে বুটের তলায় চাপা দেয়ার মন-মানসিকতা তাঁর ছিল না।

এ ঘটনার কিছুদিন পর ওই ক্যাপ্টেনকে জেনারেল ওসমানীর দফতরে আর দেখা যায়নি। শুনেছি কলকাতার ভিসিশাস সার্কেল থেকে এই তরুণ ক্যাপ্টেনকে রক্ষা করার জন্যে রণাঙ্গনের কোনো এক সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওই ছাত্রী ডাক্তারকেও এরপর থেকে বেশ কিছুদিন সদর দফতরে দেখা যায়নি। কিছুদিন পর যেদিন তিনি আবার সদর দফতরে কাজে যোগদান করতে এলেন সেদিন দেখলাম তাঁর চোখমুখ ফোলা। ওই ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে আর তিনি উঁকিঝুঁকি করেন না। নূরের রোশনাইহীন আধার ভরা ঘরে শ্যামাপোকা আর উড়ে পড়ে না গিয়ে। সব গুঞ্জরণ-গুজবের আবসান হলো।

এরপর বঙ্গবন্ধু-পুত্র শেখ কামাল এলেন জেনারেল ওসমানীর এডিসি হয়ে। সামরিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে শেখ কামাল অবহিত ছিলো না। শেখ কামালের সঙ্গে জেনারেল ওসমানীর আচরণ ছিল আনুষ্ঠানিক ও অসামরিক। অফিসিয়াল ফাইলপত্র এখন আর এডিসির'র মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি জেনারেল সাহেবের টেবিলে যাওয়া শুরু হলো।

দখলীকৃত বাংলাদেশে এ সময় গেরিলা যুদ্ধের আরো বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে। বাংলাদেশের সর্বত্র গেরিলাদের তৎপরতা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তখন বর্ষাকাল। গেরিলাদেরকে বাংলার ছেলেমেয়েরা গর্ব করে বলতো বিচ্ছু। এই বিচ্ছুরা মুক্তাঞ্চলে ট্রেনিং গ্রহণের পর দখলীকৃত বাংলার আনাচে-কানাচে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলার মাঠঘাট পানিতে সয়লাব। রাস্তাঘাট পানির নিচে। কাঁচা রাস্তাঘাট কাদায় ভরা। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ভীষণ বেকায়দায়। ঢাকার বাইরে তাদের ক্যাম্প চারদিকে পানি দিয়ে ঘেরাও। এরা নৌকা চালাতে জানে না। গেরিলারা এ সময় তাদের তৎপরতা জোরদার করে। দখলীকৃত বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে গর্জে ওঠে তাদের হাতিয়ার। কাঁপন শুরু হয় হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হৃৎপিণ্ডে।

ট্রেনিং শেষে আমাদের গেরিলা যোদ্ধারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতরে যেতেন। কখনো আনাজ-তরকারি বিক্রেতা হয়ে, মাথায় টুকরি নিয়ে, কখনো শ্রমিক কিংবা ভিখারী বা ফকির দরবেশ, এমনকি মেয়েলোক হয়ে বোরখা পরে অর্থাৎ যখন যেখানে যে রূপ ধারণ করে নিরাপদে যাওয়া যায় সেই রূপ ধরেই কার্যসিদ্ধি করা হতো। আমাদের এই তৎপরতা বৃদ্ধির খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত হতো।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে ব্রিফিং অনুষ্ঠানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কলকাতায় কর্মরত একজন কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বুলেটিনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান নিয়মিত মনিটরিং এবং পরে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করি কিনা?

আমি বললাম যে, আমার দফতরে এসব কিছু করা হয় না। সরকারের বেসামরিক দফতরে মনিটরিং করা হয় কিনা জানি না।

ওই কর্মকর্তা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত খবর ও প্রতিবেদনসহ সব অনুষ্ঠানমালা নিয়মিত মনিটরিং এবং ব্যবহৃত শব্দসহ সব কিছু পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, শোন মিস্টার নজরুল। তোমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেদিন প্রচারিত একটি সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ছদ্মবেশে টুকরির মধ্যে মাটি কিংবা অন্য কোনো মালপত্রে চাপা দিয়ে গ্রেনেডসহ ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে খবর প্রচার করায় কি ক্ষতি হয়েছে জানো?

বললাম, না তো!

কর্মকর্তা বললেন, এভাবে খবর প্রচার করায় বাংলাদেশের ভেতরে সাধারণ শ্রমিক কিংবা কর্মজীবী মানুষ, এমন কি ভিক্ষুকদেরও দেহতল্লাশি করবে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের দোসররা। অতএব সত্বর এ ধরনের আত্মঘাতী প্রচারণা বন্ধ করাও। নতুন কৌশলে খবর প্রচার করো। এই সর্বনাশা কৌশলে খবর প্রচার করলে শত্রুরা সজাগ হয়ে পড়বে। তোমাদের লোক ধরা পড়বে অথবা মারা পড়বে।

এ সময় গেরিলা আক্রমণের কৌশল পরিবর্তন করা হয়। বলা হয়, সারা দেশে গেরিলা আক্রমণ শুরু হলে দখলদার বাহিনী বড় বড় ক্যাম্প ছেড়ে দেশের ভেতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের সঙ্গে বড় কিংবা ভারী কোনো অস্ত্রশস্ত্র নিতে পারবে না। খাবার পাবে না। মনোবল তাদের ভেঙ্গে পড়বে। এসব ক্ষুদ্র দলকে গেরিলারা সহজে কাবু করতে পারবে। হানাদার

বাহিনীও বুঝবে যে দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র বিচ্ছু বাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা তখন দেশের ভেতরে যেতে চাইবে না।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। জেলা সদর থেকে দখলদার বাহিনীর গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের উপর হামলা করা হয়। পুল কালভার্ট মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়।

গ্রামের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে থানা সদর, হাট-বাজারে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, স্থানীয় মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামসহ, পাকিস্তান সমর্থক দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের উপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়। গ্রামের রাস্তার পুল-কালভার্ট মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। কলকাতার ইস্টার্ন কমাণ্ডের জনসংযোগ দফতরে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্সের প্রশিক্ষণ কৌশলও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে ঢেলে সাজানো হয়।

কোর্সের উপদেষ্টারা আমাকে বললেন, নজরুল! এখন একটু ব্রেন খাটাও। রোজই তো একই ধরনের খবর দিচ্ছো।

আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। বললাম, এখন তাহলে কি খবর দেবো?

আমি সোজা-সরল বলে কর্নেল রিখী আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বললেন, এখন যত দিন যাবে তত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করবে প্রচারণার।

বললেন, তোমার দেশে এখনো পত্রিকা বের হয়?

জ্বী হ্যাঁ।

তোমরা সেসব পত্রিকার কপি পাও?

মাঝে মাঝে কিছু পাই।

মাঝে মাঝে নয়, এখন থেকে নিয়মিত ঢাকার পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে এখানে নিয়ে আসবে।

বললাম, জ্বী আচ্ছা।

এরপর তিনি বললেন, এখন বুলেটিনে বেশি করে লিখবে, গেরিলারা মাইন, গাড়ি বোমা, হাত বোমা, ৩০৩ রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলার গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান নিয়েছে হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্যে। তাদের দোসররা হতাশ হয়ে কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে চলে যাচ্ছে—কেউ কেউ গাদ্দারী করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হচ্ছে। এদের পরিবারবর্গ অসহায় হয়ে পড়েছে। গেরিলাদের ভয়ে এরা হাট-বাজারে যেতে পারছে না, গেরিলারা গ্রামের হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করতে পারছে না। গ্রামে পাকিস্তান সরকারের কোনো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। সবকিছু বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে গ্রামে যেতে না পারে সেজন্যে গেরিলারা গ্রামে গ্রামে মুখোমুখি যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। এভাবে বিরাট একটি ডিসপ্যাচ লিখে তোমার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণীসহ কলকাতার সব খবরের কাগজে দাও। আর *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় দিতে কিন্তু ভুল করবে না। কারণ এই পত্রিকা পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশে যায়।

॥ নয় ॥

বাংলার দুরন্ত যুবক-তরুণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে দখলদার বাহিনীর প্রশাসনকে ভেঙ্গে ছাড়খাড় করে দেয়ার তৎপরতা চালায়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সে সময়কার কৌশল ছিল অধিকৃত বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ, বহির্বিশ্ব ও পাকিস্তানী প্রশাসকদের মনোবল ও আস্থা নষ্ট করে দেয়া। আমাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের মিত্র দেশগুলোকেও বুঝিয়ে দেয়া যে, বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের কোনো শাসন-ব্যবস্থা বা নিয়ন্ত্রণ নেই। সবকিছুই রয়েছে মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যাংক শাখায় লুট, থানা আক্রমণ কিংবা অফিস-আদালতে হামলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়া হয়। এছাড়া দেশের ভেতরে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে সড়কপথে ব্রীজ, কালভার্ট এবং রেলপথের স্লীপার কিংবা রেলপথ উপড়ে ফেলা, রেলসেতু ধ্বংস করে দিয়ে সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেয়া হয়। এ ধরনের ঘটনার খবর তৈরি করে আমরা বুলেটিন আকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমকে সরবরাহ করি। এসময় দেশের ভেতরে রাজাকার, আল্-বদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির কর্মকর্তা-সদস্যসহ হানাদার বাহিনীর দোসরদের উপর প্রচণ্ড হামলা চলতে থাকে, এদেরকে হত্যা করা হয় আর এসব খবর আমরা ফলাও করে প্রচার করি বিভিন্ন ভাষায়।

বাংলাদেশের ভেতরে হানাদার বাহিনীর দোসরদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পাকিস্তানী প্রশাসকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের স্থানীয় এজেন্ট, দালাল ও দোসররা নিজেদের এলাকায় বসবাস করা নিরাপদ মনে না করে বাড়িঘর ছেড়ে শহরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। এসব কথাও আমরা ফলাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণীসহ দেশী-বিদেশী প্রচার ও সংবাদমাধ্যমে। নিজ দালাল ও দোসরদের এহেন দুরবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা দেখে পাকিস্তানী সেনাদল ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের কৌশলবিদদের মুখে সেদিন হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। বলেছিলো এবার ঘুঘুরা আমাদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়তে বাধ্য হবে। সারা বাংলাদেশে গেরিলারা ছড়িয়ে পড়ে এম্বুশ বা ওঁৎ পেতে বসে রয়েছে শত্রু হননের এক উদগ্র নেশা নিয়ে। সারা বাংলার পথে-প্রান্তরে বিশেষ করে পাকিস্তানী হানাদারদের যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোতা রয়েছে অসংখ্য মাইন। মাঠে, পথের ধারে, নদীর পাড়ের জঙ্গলে কিংবা বড় গাছের আড়ালে-আবডালে জীবন বাজি রেখে রাইফেল পেতে বসে রয়েছে বাংলার দুর্দমনীয় অমিততেজের মুক্তিযোদ্ধারা। শত্রুকে রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া মাত্র গর্জে উঠবে তাদের হাতের হাতিয়ারগুলো। শত্রু হননের আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়বে দুরন্ত যৌবন। এবার প্রতিহিংসার বিস্ফোরণ ঘটবে বাংলার পথে প্রান্তরে। বাংলার মুক্ত আকাশে এবার লক্ষ তারার দীপ জ্বলে উঠবে। পশ্চিমা বেটারা এতদিন লুঙ্গি পরা, গামছা পরা, লেংটি পরা বেঁটে বাঙালি দেখেছে—বাঙালির অমিততেজ ও

বিক্রম দেখেনি। এবার বাংলার পথে-প্রান্তরে প্যাক কাদা আর পানিতে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ে দেখতে পাবে বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। আবেগ-উচ্ছ্বাসের আনন্দাশ্রু উপদেষ্টাদের চোখেমুখে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতির খবর আমরা ব্যাপকভাবে প্রচার করি। যেন পাকিস্তানী বাহিনী তাদের ক্যাম্প ছেড়ে বাংলাদেশের ভেতরে যেতে সাহস না পায়।

বাংলাদেশের ভেতরে চলাচলের সময় পাকিস্তানী বাহিনীর কোনো সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় হতাহত হলে কিংবা মাইন বিস্ফোরণে তাদের যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে খবর খুব ফলাও করে প্রচার করা হতো, যেন পাকিস্তানীদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। আমাদের গেরিলা যুদ্ধের সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার-এর পরামর্শকরা আমাকে ব্রিফ করলেন, খবরের পরও আরো খবর আছে। সে খবর লিখ এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা কর। এখন আর পিছ-পা হলে চলবে না। এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। খবর লিখে ডেসপ্যাচ তৈরি করো, হানাদার পকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যরা এখন আর ভয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে চায় না। ক্যাম্প ছেড়ে গ্রামে বা মফস্বল এলাকায় যেতে তারা ভয় পাচ্ছে। কারণ যারা একবার ক্যাম্প ছেড়ে গ্রামের পথে বের হয়েছে তারা আর ক্যাম্পে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেনি।

আমরা তাই করলাম। এ খবর ও প্রতিবেদন বিভিন্ন ভাষায় লিখে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমকে সরবরাহ করলাম। আকাশবাণীসহ বিদেশী ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যম এবং ভারতীয় পত্র-পত্রিকাসহ সকল বিদেশী সংবাদমাধ্যম আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। একথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ না করলেই নয়।

পাকিস্তানী জনগণের কাছে নূরজাহান (এককালে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও কণ্ঠশিল্পী ছিলেন), লতা মুঙ্গেশকর প্রমুখ ভারতীয় শিল্পীর হিন্দী গান ও গজলের সীমাহীন আবেদন ছিল। ভারতীয় শিল্পীদের এসব গান-গজল শোনার জন্যে পাকিস্তানীরা (কি সামরিক, কি অসামরিক) আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের দিকে রেডিও টিউন করে কান পেতে থাকত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমরা পাকিস্তানীদের এই সঙ্গীত-দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানীদের পছন্দ করা হিন্দী গজল প্রচার করা হতো দিনের বিশেষ এক সময়ে এবং এরই এক ফাঁকে পাকিস্তানীদের প্রতি যুদ্ধ বন্ধের নতুবা জীবন দেয়ার ঝুঁকি সম্পর্কিত আমাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হতো।

সামরিক প্রচার উপদেষ্টারা বললেন, এখন সার্বিক প্রচারযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত। আঘাত হানতে হবে জলে, স্থলে, আকাশে-বাতাসে, অন্তরীক্ষে। এখন কেবল প্রচার মহাযুদ্ধ চালাতে হবে। প্রচারের নতুন কৌশল বের করতে হবে নজরুল। মাতৃভূমিকে হায়েনাদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে নিজ মেধাকে কাজে লাগাবার এটাই মোক্ষম সময়। লোহা গরম হলেই নরম করার সুযোগ হয়। পকিস্তানী লোহা এখন গরমে লাল হয়ে উঠেছে। এখন প্রচারের শক্ত হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে পারলে পাকিস্তানী শক্ত লোহা গলে যাবে।

যুদ্ধ প্রচারের অন্তর্ভেদী কৌশল নির্ণয়ের জন্যে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার পরামর্শকদের এক বিশেষ বৈঠক বসলো। সময়টা বোধহয় তখন সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় তখন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুহূর্তের সময়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের ঘন ঘন বৈঠক চলছে দিল্লীতে। আমরা যারা কলকাতায় ছিলাম তখন, তারা সবাই দিল্লীমুখী হয়ে গভীর প্রতীক্ষারত— নেতারা দিল্লী থেকে কি খবর নিয়ে আসেন সে জন্যে। কলকাতায় তখন দিল্লী বৈঠক সম্পর্কে নানা মুখে নানা গুজব, নানা খবর–আশার খবর, নিরাশার খবর। সব রকম খবরের ঢেউ দোল খাচ্ছিল কলকাতার মুজিবনগরীদের আকাশে।

এ সময়টা আরো একটি কারণে খুব ক্রুসিয়েল স্টেইজ বলা যেতে পারে। কারণ, মুজিবনগর বা কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, নেতৃবৃন্দের মধ্যে কিছু চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল এ সময়। জেনারেল ওসমানীর দফতরে বসে আমরা এ খবর পেতাম। আরো স্পষ্ট করে জানতে পারতাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তার দফতরে। বিশেষ করে, আমার জানার বা জ্ঞানের উৎস ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তার দফতর।

একদিন শুনলাম, আমাদের দেশের বামপন্থী (রুশ অথবা চাইনীজ) রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিংবা যেসব দলের যেসব কর্মী-সমর্থকরা এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণরত রয়েছেন, তাদের ইচ্ছে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গেও সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়া। মোদ্দা কথায় তারা সরকারের অংশীদারিত্ব চান। অর্থাৎ কলকাতায় তাদের মুখে একটি সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠনের কথাবার্তা?

মুজিবনগর সরকারের নেতাদের চোখেমুখে তখন দুশ্চিন্তার কালোছায়া। কলকাতায় অবস্থানরত আমার মতো লোকদের মুখে চরম হতাশার ছাপ। কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসে করার উপায় নেই। শুনলাম মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও তখন ভারতে অবস্থান করছেন। পশ্চিম বাংলার রুশ ও চীনপন্থী বামপন্থীরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছিলো যেন চারদিকে একটি জগাখিচুড়ি ভাব। কেউ কিছু সঠিক বলতে পারে না শুধু যার যার কাল্পনিক কথাবার্তা। তবে আমি স্থির নিশ্চিত হলাম যে আসল খবর আমি পাবো আমার সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার জ্ঞান আহরণের উৎস থেকে। পেয়েছিলামও।

একদিন ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে ভারত সরকারের সাদা পোশাকের একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেসে করলেন, বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইদুল হাসান সাহেবকে আমি চিনি কিনা।

বললাম, আমি চিনি। তবে তিনি আমাকে চিনেন কিনা তা জানি না।

বললাম, মাইদুল সাহেব *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক এবং ইত্তেফাকের মালিক-সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের মেয়ের জামাতা। এ হিসেবেই তাঁকে আমি চিনি।

ভারতীয় কোনো কর্মকর্তার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হলে এ প্রশ্নের জবাবের সংশ্লিষ্ট আরো যেসব প্রশ্ন উঠতে পারে তার সব জবাব একসঙ্গে বলতে হবে। না হলে এ সম্পর্কে আরো অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাই মাইদুল হাসান সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা ছিল সবই এক প্রশ্নের জবাবেই বলে ফেললাম।

দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক-সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন সম্পর্কে ভারতীয় কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল খুবই স্বচ্ছ। মরহুম তফাজ্জল হোসেন সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি। তিনি ছিলেন তাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বললেন, মাইদুল হাসান সাহেব দিল্লীতে নাকি একটা অনুষ্ঠানে খুব সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর এই ভাষণ দিল্লীর সরকারি মহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়েছে। দিল্লী সরকারের ইচ্ছে মুজিবনগর সকারের কোনো কাজে তিনি (মাইদুল হাসান) সম্পৃক্ত হন। উক্ত ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে আরো অভাস দিলেন যে, মাইদুল হাসান সাহেব রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকে মনে হয়েছে মস্কোঘেঁষা। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তো তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর খুব বিশ্বস্ত লোক। তুমি তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলো যেন তিনি তোমার দেশের এই প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীকে সরকারের কোনো কর্মকাণ্ডে কাজে লাগান।

উক্ত কর্মকর্তা মাইদুল হাসানের চেহারা, সৌন্দর্য, স্মার্টনেস ও ব্যক্তিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে এত বড় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে অনুরোধ করার মতো ধৃষ্টতা আমার ছিল না। আমি তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলিওনি। কিন্তু একদিন শুনলাম মাইদুল হাসান সাহেব প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন। শুনে আমি খুশি হয়েছিলম। কারণ, ইত্তেফাকে তাঁর লেখার আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম।

মাইদুল হাসান প্রসঙ্গ আলোচনায় ভারতীয় কর্মকর্তা আমার কাছে আরো জানতে চাইলেন বাংলাদেশের বামপন্থী কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা মুক্তিযুদ্ধ কিংবা মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন করেন কিনা। আমি এক কথায় জবাব দিয়েছি— হ্যাঁ, সমর্থন করেন।

উক্ত কর্মকর্তা খানিকটা হাসলেন আমার জবাব শুনে। তারপর বললেন, তোমাদের দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন বটে, তবে তাঁরা তোমাদের সরকারে শরীক হতে চান। তুমি শোনোনি কিছু? তাঁরা সব দল মিলে একটি সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চান।

আমি মাথা নাড়িয়ে এ সম্পর্কে কিছুই জানি না বলে তাঁকে বললাম। তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সরকার কি এ প্রস্তাবে রাজী হবেন?

আমি মনে মনে ভয়ানক বিরক্তবোধ করলাম। বিনীতভাবে বললাম, এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না। এটা সরকারের ব্যাপার। আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রলোক এ সম্পর্কে কিছু বলার... ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী
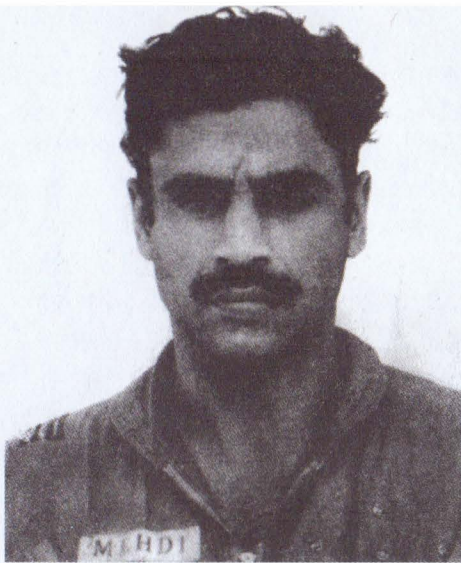
Flight Lieutenant PARWEZ MEHDI QUERESHI. Pilot of one of the F-86 PAK Sabres, who was opprehended after he baled out from his aircraft when it was shot down by the Indian Air Force Gnat aircraft on 22-11-71.

Flying officer KHALIL AHMED Pilot of one of the F-86 PAK Sabres, who was apprehended after he bailed out from his airoraft which was shot down by the Indian air Force Gart aircraft on 22-11-71.

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাস। কলকাতায় বিরাজমান চরম হতাশার মধ্যে দিল্লী থেকে এক ঐতিহাসিক খুশির বার্তা নিয়ে ফিরেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামনে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান। পাশে দাঁড়িয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ভারত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার জনসংযোগ কর্মকর্তা কর্ণেল রিখী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম (লেখক) পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
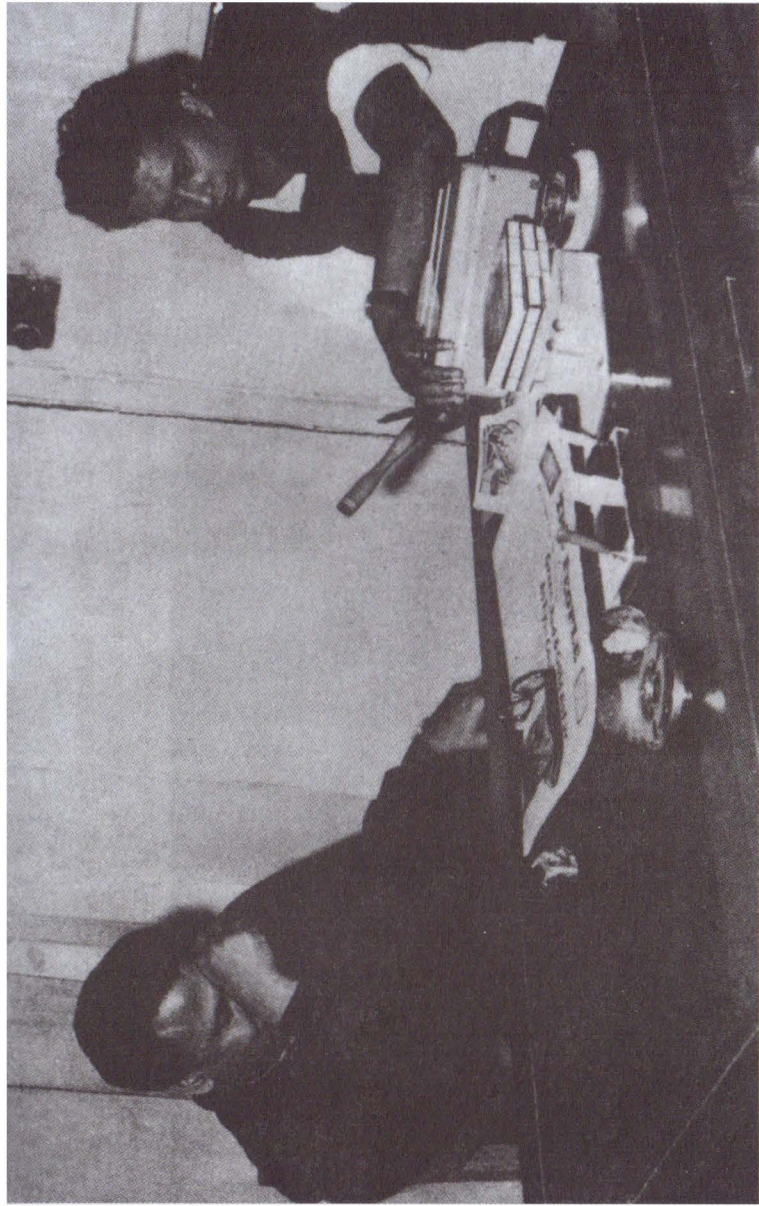
১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের পর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উপেন তরফদার আসেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করতে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এ সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।
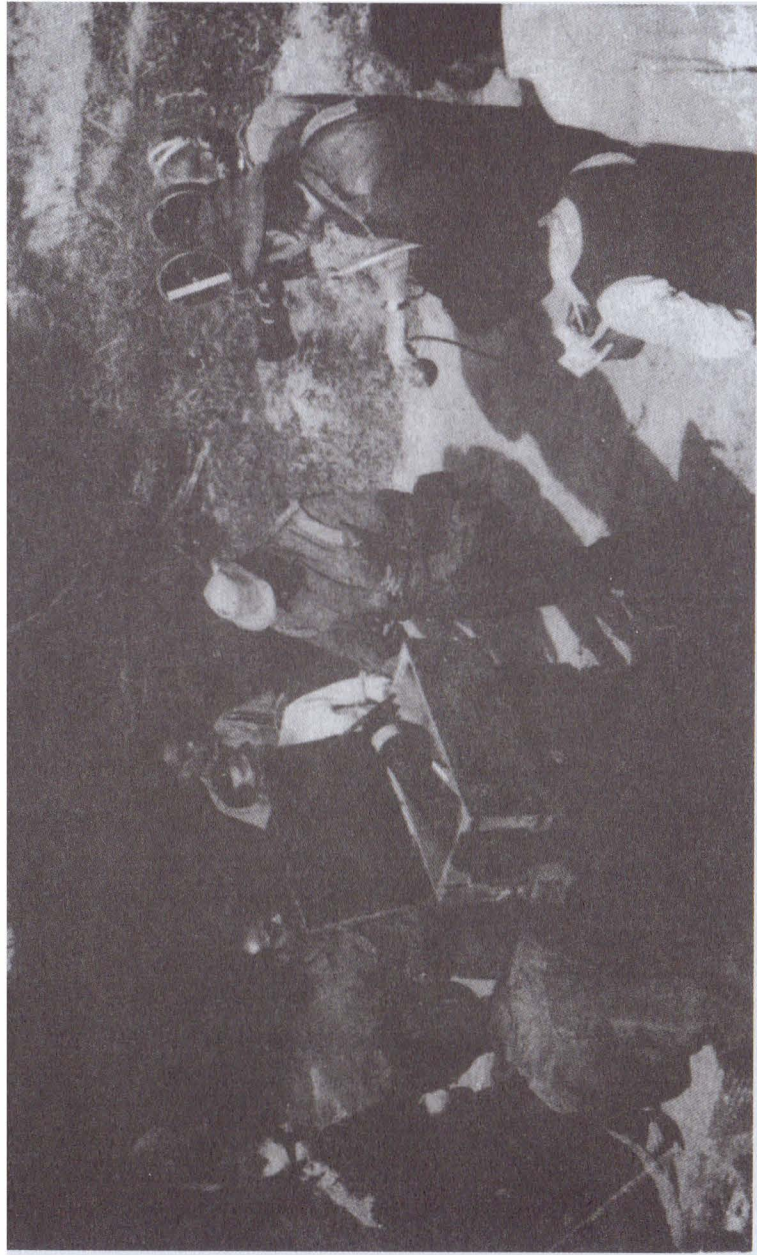
সম্ভবত ১৯৭১-এর ৬ অথবা ৭ ডিসেম্বর। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত পাকিস্তানী বাহিনী যশোর ছেড়ে দ্রুত খুলনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাওয়ার সময় যশোর শহরের সদরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখেই তারা পিছু হটে যায়। বিদেশী সাংবাদিকরা এসব দেখছেন।
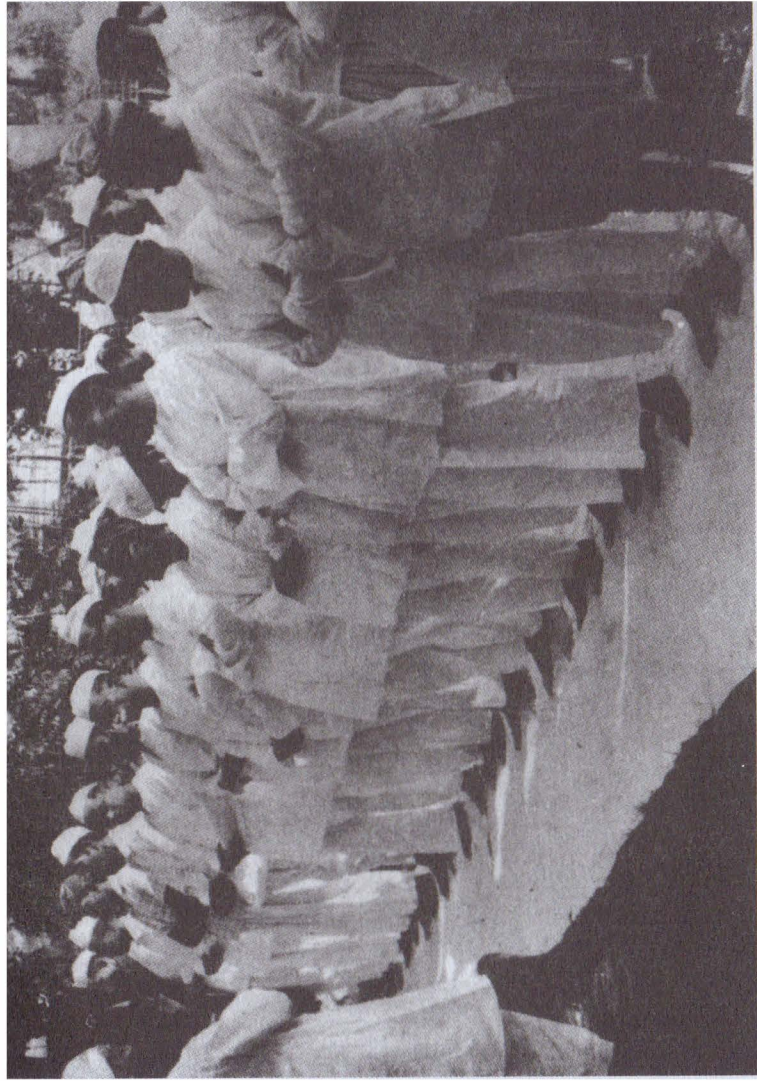
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে পবিত্র ঈদুল ফিতর-এর জামাত। সামনের সারিতে পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী।
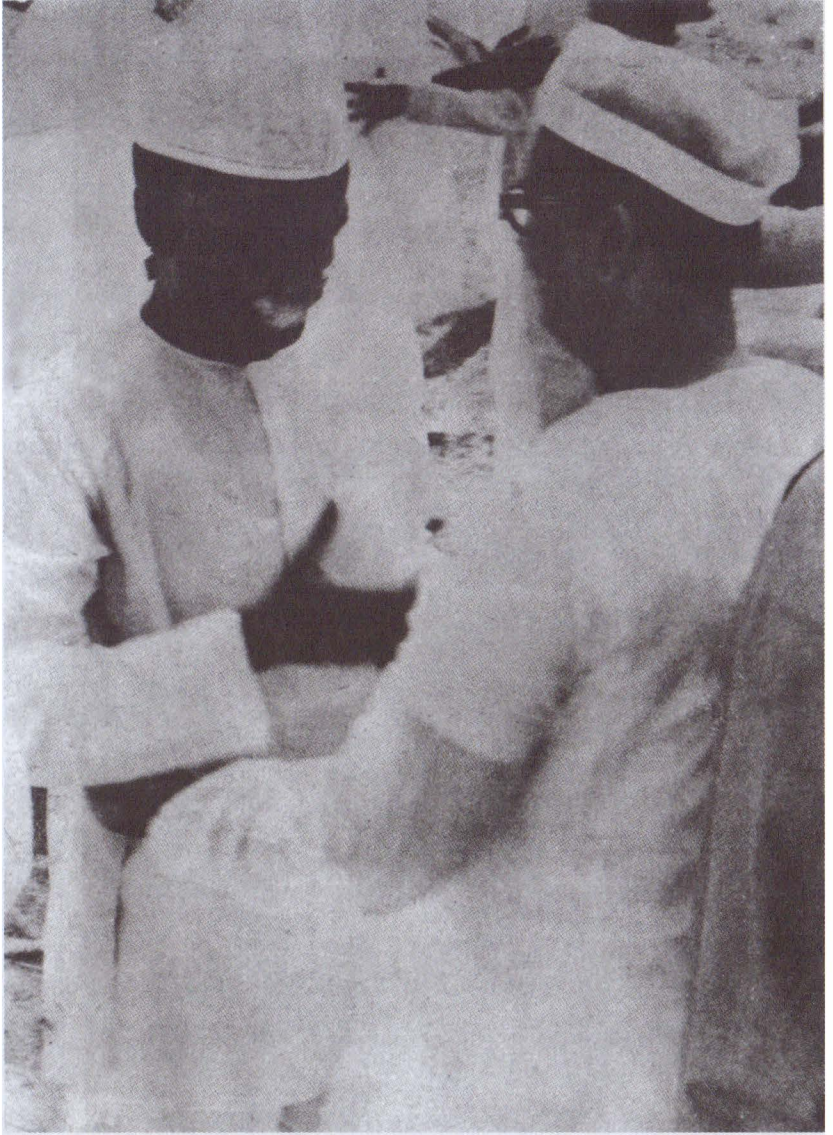
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে পবিত্র ঈদুল ফিতর-এর জামাত। সামনের সারিতে পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী।

তিনি থামেননি। নিজে নিজেই বলে চললেন, সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করা ঠিক হবে না। এতে ভারত সরকার অসুবিধায় পড়বে তোমাদেরকে সমর্থন জানাতে গিয়ে। কারণ ভারত সরকার তোমাদের ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে এপ্রোচ করছে এভাবে যে, পাকিস্তান সরকার তার দেশের মেজরিটি লোকের রায়কে ট্যাংক-কামান দিয়ে পিষে মারছে। মেজরিটি লোকের সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠন করতে না দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। জনগণের অধিকারকে হত্যা করছে।

ভারত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী একটি দেশ হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশে গণতন্ত্র ও গণহত্যার তাণ্ডবলীলা দেখে নীরবে বসে থাকতে পারে না। মানবতার এমন অবমাননা ভারত মেনে নিতে পারে না। এর সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ, সামাজিক শান্তি -শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্বের প্রশ্নও জড়িত। কারণ, পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর এই নির্মমতার শিকার হয়ে লাখ লাখ বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশু ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় নিচ্ছে। এদের আহাজারীতে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকা ভারাক্রান্ত। ভারতীয় জনগণ এদের সহায়তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, এদের এই রাজনৈতিক চরম সিদ্ধান্তের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা ভারত সরকারের জন্যে এক সুদূরপ্রসারী নতুন রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করবে। তাই এ অবস্থায় ভারতকে তার নিজ আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের স্বার্থে বাংলাদেশের প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এ প্রশ্নে ভারত উটপাখির মতো বালু-চরে ঠোঁট লাগিয়ে বেশিদিন বসে থাকতে পারবে না। এ ছাড়াও শরণার্থীরা ভারতের সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়ে সেখানকার চাষাবাদসহ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে। ভারতীয় জমির উপর এরা আশ্রয় শিবির গড়ে তুলেছে। বনজঙ্গল উজাড় করছে। রোগ-শোক, নানারকম সামাজিক উচ্ছৃংখলা, সামাজিক অপরাধ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সীমান্ত অঞ্চলের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। তাই ভারত চাচ্ছে সত্বর একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শরণার্থীদেরকে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে। বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের এটাই হচ্ছে এপ্রোচ বা আবেদনের কৌশল।

গণতান্তিক বিধি-ব্যবস্থার প্রশ্ন ছেড়ে ভারতের এক পা অগ্রসর হওয়ারও উপায় নেই। বাংলাদেশের জনগণের রায়কে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনের মাধ্যমেই সেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। যদি তোমাদের দেশের সব দল মিলিয়ে সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয় তাতে ৭০-এর সর্বজনীন নির্বাচনের গণতান্ত্রিক রায় আর থাকে কোথায়? তাতে গণতন্ত্র ও বিশ্বস্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা আর থাকে না। সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করলে তোমাদের নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করে এখনই পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণার কথাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। এটা তোমরা পারো। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম এবং বিশ্বের কূটনৈতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত এধরনের কোনো দাবি সমর্থন করতে পারবে কিনা তা

ভেবে দেখার বিষয়। এত রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ভারত হয়তো জড়িত হতে চাইবে না। এছাড়া ঘরের কাছের ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের পটভূমিকায় গণতান্ত্রিক বিশ্ব বামপন্থীদের নিয়ে সরকার গঠনকে কিভাবে দেখবে সেটাও ভাবতে হবে। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় নয়। আর ভারতীয় সীমানার ভেতরে এ ধরনের কোনো সরকার গঠনকে ভারত সরকার এলাও করবে কিনা—এটাও ভাবনার বিষয়। তার চেয়ে তোমাদের দেশের স্বাধীনতার সমর্থক সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে বড় জোড় একটি উপদেষ্টা বা পরামর্শক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে কিছুতেই গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারের বিকল্প অনিয়মতান্ত্রিক কোনো সরকার হতে পারে না।

ভারতেও তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বহু বামপন্থী রাজনৈতিক দল রয়েছে। ভারতের মাটিতে বামপন্থীদের নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের অনুমতি দিলে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃস্টি হবে—যা এ মুহূর্তে ভারতের সার্বিক স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করা ছাড়া আর কিছু হবে না। ভারতে বর্তমান মুহূর্তে এধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কোনোভাবেই তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হবে না। বরং আমার মতে তোমাদের জন্যে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। ভারত সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুতেই এসব জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী কোনো পেন্ডোরার বাক্স খুলে দেবেন না এবং কিছুতেই দিতে পারেন না। আর তোমাদের সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বও এ ধরনের কোনো প্রস্তাব এ মুহূর্তে বিচেনায় নেবেন বলে আমরা মনে করতে পারি না।

আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার মতো একজন ক্ষুদ্র লোকের কাছে এ ধরনের রাজনৈতিক তাৎপর্যময় কথা বলা নিরর্থক ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আমি অতি আগ্রহ ভরে এবং গভীর মনযোগসহকারে এসব কথা শুনেছিলাম। বুঝবারও চেষ্টা করেছিলাম। সত্বর নিজ দেশে ফেরার পরম আকাঙ্ক্ষার কারণে এসব যুক্তি ও অভিমতকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেদিন গ্রহণ করেছিলাম বৈকি। আমার তখন একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে কোনোভাবে এখনই দেশ স্বাধীন হোক, আমরা মাথা উঁচু করে নিজ দেশে আপনজনদের কাছে ফিরে যাই।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মজলুম জননেতা মওলানা আবুদল হামিদ খান ভাসানীসহ মুজিবনগর বা কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে আট সদস্যের একটি কলসালটেটিভ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে ছিলেন ন্যাপ (ভাসানী) থেকে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, সিপিবির মনিসিংহ, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাংলাদেশ কংগ্রেস-এর মনোরঞ্জন ধর, আওয়ামী লীগ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান।

এ কমিটির নাম আমি বাংলায় লিখতে পারছি না। কারণ, মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ এই কমিটির কোনো বাংলা নামকরণ করেননি। আমাকে যখন এই কমিটি

গঠনের খবর প্রেস রিলিজ আকারে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদপত্রকে দেয়ার জন্যে বলা হয়েছিলো তখন আমি বাংলা অনুবাদ করেছিলাম উপদেষ্টা কমিটি। কিন্তু সরকারের একজন নেতা আমার এই অনুবাদ গ্রহণ করেননি। তিনি এই কমিটির কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, বাংলায় এই কমিটির নাম কনসালটেটিভ কমিটিই লিখে দিতে পারো। বাংলায় অনুবাদের কোনো দরকার নেই। আমিও তাই করেছিলাম।

এই কমিটি গঠনের পর যতদূর মনে পড়ে এই কমিটির মাত্র ২/৩টি সভা হয়েছিলো। তবে এসব সভার কোনো সিদ্ধান্ত প্রেস রিলিজ আকারে তৈরি কিংবা প্রকাশের জন্যে আমাকে বলা হয়নি কিংবা কোনো পত্র পত্রিকায় এই কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হতেও আমি দেখিনি। এভাবে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছিলো। তবে এই কমিটির বৈঠকের ছবি কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এদিকে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে স্থির হয় যে, এখন থেকে আরো এগ্রেসিভ ও ইফেকটিভ প্রচার চালাতে হবে। প্রচারকৌশলও পাল্টাতে হবে। নতুন কৌশল ধরতে হবে। ঠিক হলো, অধিকৃত বাংলাদেশের ভেতরে পাকিস্তানী সেনাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে উর্দু ভাষায় লেখা চিঠিপত্রগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের হস্ত গত করে তা মুক্তিবাহিনীর সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বিষয়ক নীতি নির্ধারণী কমিটিতে দিতে হবে। পাকিস্তানী সেনারা তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে উর্দুতে লেখা যে সব চিঠিপত্র অধিকৃত বাংলাদেশে পোস্টবক্সগুলোতে পোস্ট করতো, মুক্তিযোদ্ধারা সেসব চিঠিপত্র চিঠির বাক্স ভেঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতো। এসব চিঠি থেকে আমরা চিঠির লেখক পাকিস্তানী সেনার বাড়ির ঠিকানা, আত্মীয়-স্বজনদের নাম এবং চিঠির কথাগুলো উদ্ধার করতাম।

॥ দশ ॥

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারে প্রচারকৌশল ও নীতিতে সত্য-মিথ্যার কোনো বালাই নেই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এর নীতি হলো মারি অরি পারি যে কৌশলে। প্রাপ্ত চিঠির মধ্যে থেকে আমরা পাকিস্তানের কোনো পাঞ্জাবী সৈনিকের চিঠির পাঠোদ্ধার করে আবার বাংলায় লিখতাম তার মা কিংবা স্ত্রীর কাছে।আমাদের ইচ্ছানুযায়ী বাংলায় লেখা চিঠির কথাগুলো আবার উর্দুতে লিখে তা বাংলাদেশের ভেতর থেকে পাকিস্তানে সংশ্লিষ্ট সৈনিকের বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হতো।

পাঞ্জাবী সৈনিকের চিঠির বেলায় আমরা লিখতাম, 'আমার প্রিয় আম্মি, আমার সালাম এবং চুমু নিও। স্বাস্থ্য ও মন ভালো নেই। তোমাদের থেকে অনেক দূরে আছি যুদ্ধক্ষেত্রে। কোন সময় শত্রুর গুলিতে মৃত্যু হয় তার কোনো ঠিক নেই। আমার জন্যে দোয়া করো।

এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে জানি না। এ যুদ্ধের কোনো দরকার ছিল না। সামরিক জান্তারা অহেতুক এ যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনকে বিপন্ন করেছে। তোমার বুক খালি করার ব্যবস্থা করেছে। এ যুদ্ধে আমরা কিছুতেই জয়ী হতে পারবো না। পাকিস্ত ানকেও বাঁচাতে পারবো না।

শহর বা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হলে আর নিরাপদে ফিরে আসার ভরসা নেই। মফস্বলে খাবার পাওয়া যায় না। উপোস করতে হয় দিনের পর দিন। সামনে পেলে দেখতে তোমার ছেলে কত শুকিয়ে গেছে। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা গোপন আস্তানা থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। মারা গেলে আমাদের লাশগুলো বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে বন-জঙ্গলে পড়ে থাকে। শৃগাল, কুকুর আর শকুনে টেনে হেচঁড়ে খায়। কোনো গোর-কাফন হয় না। আর পাঠান, বেলুচি ও সিন্ধুর সৈনিকরা বেঈমান। তারা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে না। তারা গোপনে বাঙালিদের পক্ষে কাজ করে। এদের বেইমানীর জন্যে পাঞ্জাবী সৈন্যদের মৃত্যু হচ্ছে বাঙালিদের হাতে। সিন্ধুর সৈন্যরা জিএম সৈয়দ-এর সমর্থক। সিন্ধুর সৈনিক মনে করে পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু পাঞ্জাবীরা সিন্ধুকে বাংলাদেশের মতো শোষণ ও শাসন করছে। সিন্ধু প্রদেশের সৈনিকের মনে পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে ঘৃণার কারণ, তারা মনে করে পাকিস্তান বানিয়েছিল সিন্ধু প্রদেশের কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু জিন্নাহর রহস্যজনক মৃত্যুর পর করাচী থেকে পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। এতে করাচীর ও সিন্ধুর মর্যাদাকে খাটো করা হয়েছে। পাকিস্তানের সকল সামরিক-বেসামরিক চাকরি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য। এসব কারণে সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তানী সৈনিকদের মনে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। এ কারণে ওই বেঈমানরা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে গাদ্দারী করছে। তোমরা দাবি করো এ যুদ্ধ থামাতে। আর বলো ওই বেঈমান সিন্ধি, পাঠান ও বালুচ সৈন্যদের সম্পর্কে সতর্ক হতে। তোমরা দাবি তোল এসব বেঈমান সৈন্যদেরকে তুলে নিতে। ওরা যুদ্ধে থাকলে কোনো পাঞ্জাবী সৈন্য বাঁচতে পারবে না।'

স্ত্রীর কাছে সৈন্যের চিঠির শেষে লিখেছি, প্রিয়তমা, 'হয়তো বেঁচে থাকতে পারবো না। তোমার উষ্ণ বুকের পরশ আর পাবো না। প্রিয়তমা, তুমি আমাকে মাফ করে দিও। কোনো দাবি থাকলে মাফ করে দিও। পরকালে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে। তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও যেন প্রাণে বেঁচে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি।'

'তোমরা পাঞ্জাবের যেসব হতভাগা-হতভাগিনী মা, বোন, স্ত্রী, বাবা, ভাই, ছেলে, মেয়ে আছ তারা যদি যুদ্ধ বন্ধ এবং বাঙ্গাল মুলুক থেকে আমাদের ফিরিয়ে নেয়ার দাবিতে পাঞ্জাবে আন্দোলন শুরু করো, তাহলে সামরিক জান্তা বাধ্য হবে এ যুদ্ধ থামাতে। তা না হলে ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তান আস্ত থাকবে না। বরং প্রত্যেক পাকিস্তান-সৈনিকের মা-বাবা হবে পুত্রহারা, ভগ্নি হবে ভাইহারা, স্ত্রী হবে স্বামীহারা আর সন্তানরা হবে পিতৃহারা।'

এসব কথা পাঞ্জাবী সৈনিক হিসেবে আমরা প্রথমে বাংলায় লিখতাম। পরে এসব উর্দু কিংবা পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ করে অধিকৃত বাংলাদেশে নিয়ে সংশ্লিষ্ট পাঞ্জাবী সৈনিকের বাড়ির ঠিকানায় পোস্ট করতাম মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে। সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারে শিক্ষা অনুযায়ী এ সময় আমাদের প্রচারকৌশলের সার্বিক লক্ষ্য ছিল যে কোনো কৌশলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন

ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্তর্বিরোধ, অন্তর্ঘাতমূলক পরিস্থিতি পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যেই আমরা বাংলাদেশে যুদ্ধরত বালুচ, পাঠান কিংবা সিন্ধি সৈনিক হয়ে পাকিস্তানে তাদের মা বাবা, স্ত্রীসহ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পশতু, বালুচ কিংবা সিন্ধি ভাষায় চিঠি লিখতাম। বাংলাদেশের ভেতর থেকে পাঠান কিংবা বালুচ সৈন্যের পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে লেখা এবং পোস্ট করা চিঠি পোস্ট বক্স ভেঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে আসতো। এ সব চিঠি থেকেই সংশ্লিষ্ট বালুচ বা পাঠান সৈন্যের আত্মীয়-স্বজনদের নাম এবং ঠিকানা পেতাম। ওই সব চিঠির অনুকরণে আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো আমাদের কথা লিখতাম। যেমন বালুচ কিংবা পাঠান সৈন্যের নামে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আমরা যথারীতি সালাম এবং কুশল জানিয়ে পর লিখেছি :

'বাংলা মুলুকে যুদ্ধ করতে এসে জীবনের নিরাপত্তা নেই। ঠিকমতো খাবার পাই না। হারামী পাঞ্জাবী কমান্ডার আমাদেরকে ঠিকমতো খাবার কিংবা অর্থ দেয় না। পাঠান এবং বালুচ সৈন্যকে পাঞ্জাবী অফিসার ও সৈন্যরা বিশ্বাস করে না। তারা আমাদেরকে মোনাফেক বলে গালি দেয়। তারা বলে আমরা নাকি পাকিস্তান চাই না। আমরা যারা সিন্ধি, তারা নাকি সিন্ধুর জিএম সৈয়দ-এর সমর্থক ও সিন্ধুর স্বাধীনতার খোয়াব দেখি। আর যারা সীমান্ত কিংবা বালুচ সৈন্য তারা নাকি হিন্দুস্তানের প্ররোচনায় সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের নেতৃত্বে স্বাধীন পাখতুনিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। পাঞ্জাবী অফিসার ও সৈনিকরা আমাদের বিরুদ্ধে এসব গীবত করে এবং বেঈমান, মোনাফেক ও মালাউন বলে গালাগালি করে। আমাদেরকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দুর্ব্যবহার করে। ক্যাম্প থেকে মফস্বলে ডিউটিতে পাঠানোর সময় আমাদেরকে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ কিংবা অস্ত্র দেয় না। মফস্বলে গিয়ে আমরা রুটি পাই না। কতদিন ধরে চোখে ঘুম নেই। পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে ঘুমাবো কোথায়? ঘুমিয়ে পড়লে যদি শত্রু আঘাত করে এই ভয় মনে। বিশ্রম নেই অনেক দিন। বাঙ্গাল মুল্লুকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বোধ হয় বিশ্রাম পাবো না।

'বাঙ্গাল মুল্লুকে শহর থেকে মফস্বলে যাওয়ার সময় রাস্তা বা বনে-জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের পুতে রাখা মাইন বিস্ফোরণ হয়ে সিন্ধি পাঠান ও বালুচ সৈন্য হতাহত হচ্ছে। পাঞ্জাবী সৈন্য মফস্বলে পাঠানো হয় না। তারা শহরে নিরাপদে থেকে আমাদেরকে গালাগালি ও বিদ্রূপ করছে। পাঞ্জাবী অফিসাররা দু'চোখে দেখে পাঞ্জাবী সৈন্য আর সিন্ধি, বালুচ ও পাঠান সৈনিকদের। কারণ মফস্বলে গেলে জীবন নিয়ে আর শহরে ফিরে আসা যায় না। পাঞ্জাবী সৈন্য মফস্বলে গেলেও তারা থাকে খুবই পেছনে। তারা সামনে থাকে না। সামনে দেয় পাঠান কিংবা বালুচ সৈন্যদের। কারণ সামনে থাকলে মাইন বিস্ফোরণ কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ যায়। তাই পাঞ্জাবী সৈন্যদেরকে সামনে দেয় না। পাঞ্জাবীরা আমাদের প্রতি এরকম হিংসাত্মক ব্যবহার করছে। এমনকি পাঠান ও বালুচ সৈন্য নিহত হলে তাদের লাশগুলো পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় না। মাঠে-জঙ্গলে লাশ ফেলে রাখা হয়। এসব লাশ কুকুর, শৃগাল আর শকুন ও বন্য জন্তু-জানোয়াররা টেনে ছিঁড়ে খায়। আর পাঞ্জাবী কোনো সৈনিক যুদ্ধে নিহত হলে আর্মি হেলিকপ্টার দিয়ে ওদের লাশ ঢাকায় এনে মুসলমানী কানুন অনুযায়ী দাফন

কাফন করা হয়। তোমরা আমাদের জন্যে দোয়া করো। তোমাদের সঙ্গে হয়তো ইহকালে আর মোলাকাত হবে না। তোমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করো। ঘরে ঘরে আওয়াজ তোল আমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে। পাকিস্তান এই যুদ্ধে কিছুতেই জয়ী হতে পারবে না। কারণ হিন্দুস্তান বাঙালিদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করছে।

'হিন্দুস্তান মুল্লুক দিয়ে ঘেরা এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের একটি লোকও আমাদেরকে সমর্থন করে না। তারা বিলকুল পাকিস্তান চায় না। বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের নাম শুনতে পারে না। গ্রামে গিয়ে পানির জন্য বুক ফেটে গেলেও কেউ আমাদেরকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয় না। আজ বহুদিন ধরে আমাদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মাঠে-জঙ্গলে সতর্ক অবস্থায় পায়ে হেঁটে অনাহারে-অর্ধাহারে যুদ্ধ করতে হয়। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে পেছন থেকে রসদ দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনই এক অবস্থার মধ্যে আমরা কাজ করছি। আর পাঞ্জাবীরা ঢাকা এবং জেলা হেডকোয়ার্টারে নিরাপদে থেকে আমোদ-ফুর্তি করছে। ভালো খাবার খাচ্ছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপর খবরদারী করবে। লুটেপুটে খাবে। কাজেই তাদের কোনো চিন্তা নেই। যদি আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে চাও তাহলে তোমরা সবাই মিলে পাঞ্জাবী জল্লাদদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোল। পাঞ্জাবীদের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা মুক্ত হবেই ইনশাআল্লাহ। একই সময় যদি বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে পাঞ্জাবীরা একসঙ্গে সবার সঙ্গে পারবে না। তারা পাখতুনিস্তান দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমরাও জীবন নিয়ে দেশে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবো। তা না হলে আমাদের মুখ আর তোমরা কোনোদিন দেখতে পাবে না। বাঙ্গাল মুল্লুকে শৃগাল-কুকুর আর শকুনেরা আমাদের লাশ টেনে ছিঁড়ে খাবে। তাই আল্লাহ রাসূলের দোহাই, তোমরা ঘরে আর বসে থেকো না। তোমরা তোমাদের অসহায় পুত্র, স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষার জন্যে আল্লাহর নামে রাস্তায় বের হয়ে পড়। আর দেরি করো না। আর চিঠি দেয়ার সুযোগ পাবো কি না জানি না। এটাই হয়তো আমার শেষ খত। খোদা হাফেজ।'

॥ এগার ॥

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে হানাদার পাকিস্তান বিমান বাহিনীর দু'জন পাইলট আমাদের মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরা হলেন, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এফ-৮৬ স্যাবর জেটের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পারভেজ মেহদি কোরেশী এবং ফ্লাইং অফিসার খলিল আহমেদ।

পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর এ দু'জন পাইলটের সাক্ষাৎকার বলে আমরা দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করলাম আমাদের ইচ্ছে মতো বক্তব্য দিয়ে।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ইউনিফর্ম পরা এ দু'জন অফিসারের ছবিও আমাদের কাছে ছিল। ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরের সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার

বিশেষজ্ঞরা আমাকে ব্রিফ করলেন এ দু'জন পাইলটের সাক্ষাৎকার হিসেবে কিভাবে প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। এরা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানের অধিবাসী। আমাদের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ তুলে ধরে আমরা লিখলাম কি কি কারণে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ওই দু'জন পাইলট মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা বলেছে যে, দখলীকৃত বাংলাদেশে যুদ্ধরত পাকিস্তানের পাঠান. বালুচ ও সিন্ধি সৈন্যরা এখন বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশের জনগণের এই মুক্তিযুদ্ধ একটি ন্যায্য যুদ্ধ।

পাকিস্তানের পাঞ্জাবীরা শুধু বাংলাদেশকেই শোষণ করছে না, পাকিস্তানের সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান কোনোদিন স্বাধীন হতে চাইলে বাঙালিদের মতোই তাদেরকেও পিষে পিষে মারবে। তাই সিন্ধি, বেলুচি ও পাঠান সৈনিকরা এখন আর বাঙালিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু ভয়ে তারা আত্মসমর্পণ করতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের এই গোপন ইচ্ছে পাঞ্জাবীরা টের পেলে তাদেরকে অধিকৃত বাংলাদেশের রণাঙ্গনেই ধ্বংস করে দেবে। তারা সুযোগ পেলেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। তাদের এখন আত্মোপলব্ধি হয়েছে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদারদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড অমানবিক। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হায়েনা বাহিনীর নারী নির্যাতন, শিশুহত্যা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া অনৈসলামিক কাজ।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পারভেজ কোরেশী ও খলিল আহমদ পাকিস্তানী যুদ্ধবাজ সামরিক জান্তার প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং বাঙালিদের অধিকার স্বীকার করে নিতে। তাঁরা পাকিস্তানের জনগণের প্রতিও আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী যুদ্ধ বন্ধ এবং বাংলাদেশে অন্যায় যুদ্ধরত একলাখ পাকিস্তানী সৈন্যকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে পাকিস্তানের ঘরে ঘরে সোচ্চার আওয়াজ তুলতে।

সিন্ধি সৈনিকের বাড়িতে লেখা চিঠি পালটিয়ে আমরা লিখলাম পাকিস্তান রক্ষার জন্যে জীবন দিয়ে আমাদের কি লাভ হবে? পাকিস্তান বানিয়েছিলেন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সিন্ধুর করাচীতে। কিন্তু জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেই করাচী থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী প্রথমে নিয়ে যায় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইচ্ছের প্রতি পাঞ্জাবীরা সামান্যতম শ্রদ্ধা দেখাল না। কায়দে আযমের মহান স্মৃতিকে পাঞ্জাবী সামরিক জান্তা বুটের নিচে চাপা দিতে চাচ্ছে।

করাচী নগরীতে পাকিস্তানের মহান জনক কায়েদে আযম আজ অযত্ন অবহেলায় বিস্মৃতির আবর্জনাস্তূপের নিচে তলিয়ে যাচ্ছেন। আজ সেখানে কুত্তাও প্রস্রাব করে না। অতএব কেন আমরা সিন্ধি সৈনিকরা যুদ্ধ করবো? কেন জীবন ও রক্ত দেবো? এ প্রশ্নের জবাব আজ খুঁজে পাই না। আমরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধরতে চাই না। তোমরাও আজ সিন্ধুর ঘরে ঘরে আওয়াজ তোল আমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে এবং জি এম সৈয়দের পথ ধরে বুলন্দ আওয়াজ তোল জিয়ে সিন্ধু। খোদা হাফেজ।

এই চিঠি পরে উর্দু ও সিন্ধি ভাষায় লিখে বাংলাদেশে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সিন্ধি সৈনিকের বাড়ির ঠিকানায় পোস্ট করা হয়।

এই চিঠি পোস্ট করার পনেরো-বিশ দিন পর ফলোআপ প্রতিবেদন অর্থাৎ এমন চিঠি পাওয়ার পর পাকিস্তানে সৈনিকদের পরিবারে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করে দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমকে সরবরাহ করতাম। প্রতিবেদনে আমরা লিখতাম

'বাংলাদেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পাকিস্তানী সৈনিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এই হিংসা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক সন্দেহ-সংশয় পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। পাকিস্তান থেকে আগত জনৈক বিদেশী পর্যটকের কাছ থেকে জানা গেছে যে, সম্প্রতি পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ সফরকালে তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের এই সন্দেহ, অন্তর্বিরোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ লক্ষ্য করেন।

'সফরকালে তিনি জানতে পারেন যে, অধিকৃত বাংলাদেশে যুদ্ধরত পাঞ্জাবী সৈনিকরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে লেখা চিঠিতে লিখেছেন যে, সেখানে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাঠান, বালুচ ও সিন্ধি সৈনিকরা বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তারা সুযোগ পেলেই বাঙালিদের পক্ষে কাজ করছে। পাকিস্তানের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুশমনদের কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ এবং এমনকি গোপনে দুশমনদেরকে গোলাবারুদ পর্যন্ত সরবরাহ করছে। এমনকি পাঞ্জাবী সৈনিকরা কখন কোন পথ দিয়ে কোথায় যাবে—সেই গোপন খবর পর্যন্ত দুশমনদের কাছে আগেই পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি সিলেট, কুমিল্লা এলাকায় একটি পাঞ্জাবী বাহিনীর গোপন চলাচল সম্পর্কে আগেই দুশমনদের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেয়ায় দুশমনরা ওই পথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গোপনে ওঁৎ পেতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঞ্জাবী সৈনিকদের একটি দল ওই পথ দিয়ে শত্রু-দমনে যাওয়ার সময় গোপন আস্তানা থেকে দুশমনরা অতর্কিতে ওই পাঞ্জাবী সৈনিকদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় বারো জন পাঞ্জাবী সৈনিক ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং বাকি সবাই আহত হয়। পাঞ্জাবী সৈনিকরা তাদের চিঠিতে লিখেছে যে, সিন্ধি, পাঠান ও বালুচ সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই বাংলাদেশের রণাঙ্গনে পাঞ্জাবী সৈনিকদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এছাড়া রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস নামক যে সব বাঙালি গাদ্দার রয়েছে তারাও এখন পাকিস্তানের সঙ্গে বেঈমানী করে দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সুযোগ পেলে পাঠান ও বালুচ সৈন্যরা দুশমনদের কাছে আত্মসমর্পণও করছে এবং পঞ্জাবী সৈনিকদের সঙ্গে নানা ঝগড়া ফ্যাসাদ, হাতাহাতি এবং মারামারি করছে।

'অধিকৃত বাংলাদেশে যুদ্ধরত পাঞ্জাবী সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরনের চিঠি পেয়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পাঠান, বালুচ ও সিন্ধুর জনগণের প্রতি ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষের দাবানল সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানে এখন যে কোনো মুহূর্তে পাঞ্জাবী, বেলুচ, পাঠান ও সিন্ধিদের মধ্যে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হতে পারে।

'পাকিস্তান থেকে মুজিবনগরে আগত উক্ত বিদেশী পর্যটকের কাছ থেকে আরো জানা গেছে যে, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরকালে তিনি একই দৃশ্য লক্ষ্য করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স পরিভ্রমণকালে তিনি জানতে পারেন যে, দখলীকৃত বাংলাদেশে অবস্থানরত পাঠান সৈনিকরা তাদের আত্মীয়-স্বজনরদের কাছে দেয়া চিঠিতে লিখেছে যে, সেখানে পাঞ্জাবী সৈনিক ও অফিসাররা পাঠান, সিন্ধি ও বালুচ সৈন্যদেরকে সন্দেহের চোখে দেখছে। পাঞ্জাবীরা বলছে যে, সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফফার খান স্বাধীন পাখতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তাই বাংলাদেশে পাঠান সৈন্যরা যুদ্ধ করছে না। তারা গোপনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে গাদ্দারী করছে। এসব অভিযোগ তুলে পাঞ্জাবী সেনা অফিসাররা বাংলাদেশে পাঠান সৈনিকদের উপর নানারকম জুলুম অত্যাচার চালাচ্ছে। পাঠান সৈনিকদেরকে ভালো খাবার দেয়া হচ্ছে না। তাদেরকে কোনো বিশ্রাম না দিয়ে রাতদিন যুদ্ধে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী এলাকায় পাঠান, বালুচ ও সিন্ধি সৈনিকদের মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর কামানের খোরাকে পরিণত করা হচ্ছে।

'এ ধরনের চিঠি পেয়ে সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের ঘরে ঘরে কান্নার রোল এবং পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করছে। যে কোনো সময়ে সারা পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন জ্বলে উঠতে পারে।'

নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ আবার ব্যাপক হয়ে ওঠে। পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, রসদ সরবরাহ করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে মোড় নিতে শুরু করে। অভুক্ত অনাহারক্লিষ্ট-হতাশায় বিধ্বস্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের লাগাতার হামলায় নাস্তানাবুদ পাকিস্তানী সেনাদের মনে তখন ভীতির কম্পন উঠেছে। এদের মনোবল ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। এদের তখন পাল্টায়নি মনোভাব। সামনে এগোবার সাহস তাদের আর নেই।

ঢাকায় যুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োজিত পাকিস্তানের সেনানায়করা তখন তাদের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সেনাসদর থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঢাকায় গোলা-বারুদসহ রসদ ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। সাপ্লাই লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ। বলতে গেলে গোটা বাংলাদেশে তখন পাকিস্তানী বাহিনী অবরুদ্ধ অবস্থায়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী খেদা অভিযানে ঘেরাওয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ অনাহারক্লিষ্ট চলৎশক্তিহীন বিশাল দেহের অসহায় এক হাতির মতো বন্দী বিশাল পাকিস্তানী বাহিনী।

॥ বারো ॥

পাকিস্তানীদের জন্যে অন্তর্ঘাতমূলক সর্বাত্মক প্রচারযুদ্ধের এক পর্যায়ে আমরা একটি ভয়ানক বিভ্রান্তিকর খবর বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করলাম। সেটা ছিল এরকম

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সেনাদের একটি অগ্রসরমান দলের উপর দু'দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত সাঁড়াশি আক্রমণে প্রায় ৫০/৬০ জন পাকসেনা সমূলে ধ্বংস হয়। তাদের গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত

হয়। পাক সেনাদের দল রণাঙ্গনে পড়ে রয়েছে। জানা গেছে, এ বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক ছিল পাঞ্জাবী। এদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও রয়েছেন। এদের লাশ সামরিক হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নেয়া হয়। ঢাকা থেকে এদের লাশ ভাড়াকরা একটি বিমানে করে পাকিস্তানের লাহোর নিয়ে যাওয়া হবে অমুক তারিখে। লাহোর বিমানবন্দরে লাশগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এ খবর প্রচারের দুদিন পরই ফলোআপ খবর প্রচার করলাম। সেটি ছিল নিম্নরূপ

বাংলাদেশের রণাঙ্গনে নিহত পাকিস্তানী সৈনিক ও সেনা অফিসারদের লাশ পকিস্তানের লাহোর বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার খবরে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত শোকার্ত নারী-পুরুষ তাদের স্বজনদের লাশের খোঁজে অমুক তারিখে লাহোর বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে ছিল নিহত সৈনিকের বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, শ্বশুর-শাশুড়িসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। এদের কান্না ও স্বজন হারানোর বেদনায়, রোদন আহাজারীতে লাহোর বিমানবন্দর এক শোকের সাগরে পরিণত হয়। সারা লাহোর শহর জুড়ে ছিল কান্নার রোল।

লাহোর থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতায় আগত একজন বিদেশী নাগরিকের কাছ থেকে এ খবর জানা গেছে। উক্ত বিদেশী নাগরিক জানান যে, লাহোর বিমানবন্দরে রোরুদ্যমান হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুদের এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তিনি নিজেও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। এই রোরুদ্যমান হাজার হাজার মানুষের আহাজারীতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তবু এই যুদ্ধবাজ পাষণ্ড পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হৃদয়ে এতটুকু দয়ার সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এবং হাজার হাজার পাকিস্তানী সেনার অনিবার্য ধ্বংসের কথা জেনেও পতনোন্মুখ পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত লাশ লাহোর বিমানবন্দরে না পৌঁছায় নিহত সৈনিকদের শোকবিহ্বল আত্মীয়-স্বজনদের বিশাল শোকমিছিল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী মিছিলে পরিণত হয়। নিহত সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনদের এই শোকমিছিল থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ, পাকিস্তানী সামরিক জান্তার আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে নিন্দা ও ধিক্কার দিয়ে গগনবিদারী স্লোগান ওঠে। পাকিস্তানের রক্তপিপাসু সামরিক জান্তার আত্মঘাতী নীতির কারণে হাজার হাজার পাকিস্তানী সৈনিক বাংলার দুর্জয় ঘাঁটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এই অন্যায় যুদ্ধে স্বজন হারানোর বেদনায় সারা পাকিস্তান জুড়ে আজ শোকের মাতম শুরু হয়েছে।

পরে অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, লাহোরে পাকিস্তানী সৈনিকদের লাশ নেয়ার খবর শুনে সত্যি সত্যিই বহু পাকিস্তানী নারী-পুরুষ তাদের আত্মীয়-স্বজনের লাশের খোঁজে সেদিন পাকিস্তানের লাহোর বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিল। জিএম সৈয়দের নেতৃত্বে সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্তানের দাসত্বের জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, সিন্ধু প্রদেশ জুড়ে উঠেছে জিয়ে সিন্ধু স্লোগান। এসব কথাকে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারের মুখ্য উপাদান হিসেবে খুবই দক্ষভাবে ব্যবহার করেছিলাম।

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের সর্বাত্মক প্রচার-যুদ্ধে আমাদের এই অভিনব ও আবেদনধর্মী জুৎসই কূটকৌশল কলকাতার সংবাদপত্রজগৎ, ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও

সমরকৌশলবিদ মহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিলো। বোধহয় তখন জুলাই কিংবা সেপ্টেম্বর মাস। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ সফরে বের হন। উদ্দেশ্য তাঁর পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং ভারতের অবস্থান বিশ্বসমাজের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং এই উপমহাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর প্রতিক্রিয়া যাচাই করা। এই সফরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে বাংলাদেশ শব্দটির ব্যবহার খুবই সতর্কভাবে এড়িয়ে যেতেন। বিদেশ সফরে বের হয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী দেশে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব ঘটনাবলীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যেসব মন্তব্য রেখেছিলেন তা আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছিলাম।

বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি অনুযায়ী একটি সর্বদলীয় বিপ্লবী সরকার গঠনের সম্ভাব্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক কর্মকর্তার মুখে ভারতের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে কিছুদিন বক্তব্য শুনেছিলাম। পরে বিদেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বক্তব্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন তার মধ্যে নীতিগত কোনো পাথক্য কিংবা অমিল ছিল না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, পাকিস্তান দাবি করছে এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বিশ্বসমাজও হয়তো আপাতত এই অভিমত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমার পার্শ্ববর্তী দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা নির্লিপ্ত থাকতে পারি না। কারণ ওপারের ঘটনাবলী আমাকে আঘাত করছে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট ঘটনাবলীর কারণে আমাদের ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু শরণার্থী হয়ে আসছে এবং আশ্রয় গ্রহণ করছে। এতে একই ভাষাভাষী অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা পাকিস্তানের তথাকথিত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তপেক্ষ না করলেও আমরা পাকিস্তানের আক্রমণের শিকার হচ্ছি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক তাদের এলাকা থেকে আগত শরণার্থীদের উপর নিক্ষেপ করা গোলা-বারুদ সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের এলাকায় এসে পড়েছে। এমতাবস্থায় আমরাও চোখ বুজে নীরবে বেশিদিন বসে থাকতে পারবো না।

এভাবেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ সফরকালে বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর দেশের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। বিশ্ব সফরের সারা পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেন জানি না কিছুটা থেমে গিয়েছিলেন। এ সময় পাকিস্তানে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের আয়োজন চলছে। বিদেশী পত্রপত্রিকায় এ ধরনের খবর বের হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে সময় নিক্সন সরকার। তাঁর পররাষ্ট্রবিষয়ক সেক্রেটারী তখন তুখোড় কূটনীতিক ডক্টর হেনরী কিসিঞ্জার। মার্কিন নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কী বলেছিলেন তা পুরাপুরি জানা যায়নি। কিন্তু দুদিন পর বিদেশ সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষান্ত করে উদ্বিগ্নচিত্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লীতে প্রথমে

ভার। কলকাতায় এর ছাপ পড়েছে। জানতে পারিলাম, দিল্লীতে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের ডাক পড়েছে।

ছুটে গেলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী। তিন চারদিন পর্যন্ত দিল্লী থেকে কোনো খবর পাওয়া যায়নি কলকাতায়। ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতর চুপ। কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সর্বস্তরের নেতাদের মুখে অজানা উদ্বেগের ছায়া।

তিন চারদিন পর দিল্লী থেকে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতার দমদম বিমান বন্দর থেকে সরাসরি চলে গেলেন তাঁরা বাসায়। মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে ফিরে এলেন কেবল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী। আমরা যারা সদর দফতরে প্রবেশপথে অপেক্ষমাণ ছিলাম নেতৃবৃন্দের আসার পথ চেয়ে, লক্ষ্য করলাম প্রাধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মুখ মলিন। গাড়ি থেকে নেমে আমাদের প্রতি ম্লান হাসি দিয়ে 'আপনারা কেমন আছেন'—শুধু এ কথাটুকু বলেই সরাসরি নিজ দফতরে চলে গেলেন। আমাদের বুঝতে বাকি রইলো না যে খবর ভালো নয়। দিল্লী থেকে প্রত্যাগত প্রধানমন্ত্রীর মলিন মুখ অমঙ্গলের সংকেত। আশাদীপ্ত আমাদের সকলের মুখ মুহূর্তের মধ্যে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে গেলো। কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা বললাম না। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা যে যার পথে চলে গেলাম।

মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে দু'তিন দিন ধরে থমথমে ভাব। প্রধানমন্ত্রী খুব প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে বড়বেশি দেখা করেন না। মুখ দিয়ে তাঁর সহজে কোনো কথা সরছে না। কথাবার্তা বলেন খুব কম। এক অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব তাঁর। প্রধানমন্ত্রীর রুমের উপরতলায় বসবাসকারী আওয়ামী লীগের তদানীন্তন দফতর সম্পাদক মোহাম্মদউল্লাহ ভাইও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সাহস করছেন না। আমরা কয়েকজন প্রতিদিন রাতে তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করি অতি সন্তর্পণে, কিন্তু তাঁর ঘরে প্রবেশ করার সাহস পাইনি। তাঁর ঘরের দরজা এ সময় খোলা ছিল। তবে মনে হয়েছিলো ঘরের ভেতর এক গভীর নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল।

॥ তেরো ॥

তাঁর অজান্তে অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ টেবিল সামনে নিয়ে খাটের উপর একান্তে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রধানমন্ত্রীর ঘরের সামনে বসা নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকজন আমাদেরকে ভালো করে চিনতেন। তাই এত রাতে প্রধানমন্ত্রীর ঘরের খোলা দরজার সামনে দিয়ে এভাবে ঘোরাঘুরি করতে আমাদেরকে বারণ করেন নি।

দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের মলিন মুখে হতাশার ছাপ, চোখের কোণে অসহায়ত্বের ছবি। এ ধরনের অবস্থা দেখে আমিও ভেতরে ভেতরে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম বৈকি! কারো মুখে কোনো কথা নেই।

কেউ কাউকে জোর দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করছে না—জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলে জবাবে হয়তো আরো দুঃখময় কোনো খবর শুনতে হতে পারে। এ ভয়ে কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত সাহস পেতো না। চারদিকে এমনি হতাশাময় পরিস্থিতি। এ সময় হতাশার এই নিকষ কালো ঘন আঁধার ভেদ করে আসা আমার স্মৃতির আলোয় ভেসে উঠেছিল মর্মস্পর্শী এক করুণ দৃশ্য। ছায়াছবির মতো নিক্ষিপ্ত আলোয় ভেসে আসা সে দৃশ্যটি ছিল পাঁচ-ছ' মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার বিদায়কালীন এক বেদনাবিধুর দৃশ্যপট। সেই পটে ভেসে উঠেছিল আমার পাঁচ-ছ' মাস বয়সের শিশুপুত্রের আমাকে বিদায় দেয়ার ভঙ্গিতে আকাশে তুলে ধরা দুটি কচি হাত। এতটুকু বয়সের ছেলে—কিইবা তার অনুভূতি! বাবা তাদেরকে এক অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে এক অনিশ্চিত যাত্রায়। এই শিশু কিইবা তা বুঝবে! তবু আমার বিদায়কালে আমাদের বাড়ির পেছনে আমতলায় দাঁড়িয়ে তার ওই ছোট্ট দুটি হাত ওপরে তুলে ধরে তা নেড়ে নেড়ে তাকে দিয়ে টা-টা দেখাচ্ছিলেন তার ক্রন্দনরতা মা। বাড়ির পেছনে আমগাছের প্রসারিত শাখার ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দনরতা স্ত্রীর অঝোর ধারায় অশ্রুঝরা ছলছলে দুটি চোখ। আমার চোখের কোণে রূপালী পর্দার ছায়াছবির মতো ভেসে উঠেছিল তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে আমার শিশুপুত্রকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে ক্রন্দনরতা আমার বৃদ্ধা মায়ের মুখচ্ছবি।

স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছিল আমার সকরুণ অপ্রত্যাশিত বিদায়লগ্নে আমার ওই হাস্যোজ্জ্বল অবুঝ শিশুপুত্রকে আমার কোলে একবার তুলে দেয়ার জন্যে আমার রোরুদ্যমান স্ত্রী ও বৃদ্ধা মায়ের নিরন্তর চেষ্টার করুণ দৃশ্যটি। মনে পড়েছিল সেই সময় এই নিস্পাপ-নির্দোষ অবুঝ শিশুকে বুকে একবার তুলে না নেয়ার মতো আমার নিষ্ঠুর মনোভাবের কথা। জীবনের এই অভূতপূর্ব হতাশাময় মুহূর্তে বিদেশের মাটিতে বসে এ সময় আমার মনে পড়েছিল যে, আমার বিদায়লগ্নে আমি আমার এই প্রথম শিশুপুত্রটিকে পর্যন্ত কোলে তুলে নেইনি। তার মুখে একটিবার একটি চুমু খাওয়ার মতো অনুভূতিটুকু পর্যন্ত আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ে একবারের মতো জেগে ওঠেনি। হায়রে হৃদয়হীন পিতা! আসলে সে মহূর্তে আমার ভয় হয়েছিলো, আমি যদি আমার ওই পুত্রকে কোলে নিয়ে শেষে তার কচি হাতের সুকঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি? তাই হৃদয়হীন পিশাচের মতো আমার এই নিষ্ঠুরতা। তাই তাকে কোলে তুলে নেয়ার জন্যে আমার দু'হাত সেদিন বাড়িয়ে দিইনি। আমার হাত দুটোকে আরো শক্ত করে যেন আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম। এমনকি বাড়ন্ত পাটক্ষেতের আঁকাবাঁকা আইল বেয়ে সেদিন যখন আমি আমার বৃদ্ধা মা ও বুকফাটা বেদনায় ছটফট করা স্ত্রীর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে যাচ্ছিলাম, সে মুহূর্তেও একটিবার পেছনে ফিরে চাইনি। পিশাচের মতো এমনই আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, মনের মধ্যে সর্বদা ভয় ছিল পেছনের দিকে ফিরে তাকালে শেষে তাদের চোখের পানিতে আমার যাত্রাপথ পিচ্ছিল হয়ে না যায়। কিংবা কোনো মায়ার বাঁধনে আমি আবদ্ধ হয়ে না পড়ি। এ সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক ছিলাম। তাই পেছনে ফিরে চাইনি সেদিন। এমনি পাষাণে বুক বেঁধে বাড়ন্ত পাটক্ষেতের ফাঁক দিয়ে মাঠের আঁকাবাঁকা আইল বেয়ে তাদের অশ্রুসিক্ত দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

কিন্তু আজ মাতৃভূমি থেকে শত শত যোজন দূরে কলকাতা কিংবা মুজিবনগরে বসে সেদিনের সেই অশ্রুসজল মুহূর্তকে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেরই চলমান দৃশ্য। মনে হচ্ছে পাঁচ-ছ' মাস কেটে যাবার পরও সেই অশ্রুভরা চোখগুলো যেন এখনো আমার দিকে তীরের মতো দৃষ্টি বিদ্ধ করে রেখেছে। তাদের সেই তির্যক দৃষ্টিকে পাশ কাটানোর শক্তি আমি এখন হারিয়ে ফেলেছি।

হাতাশা আর প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ-ব্যথায় আমি এমনি নিথর এবং নিঃসাড় হয়ে পড়েছিলাম। কারো সঙ্গে কথা বলে মনটা হালকা করার মতো তেমন কেউ ছিল না। সবাই প্রায় নির্বাক। মুজিবনগর নিথর। কি হবে—কেউ কিছু বলতে পারছে না। কেউ কোনো বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। কোনো কোনো লোকের ভাবটা এমন, যেন দেশ স্বাধীন হবে না। পাকিস্তানই থেকে যাবে। কাজেই মুখ খুলে আবার কোন বিপদ টেনে আনব? যদি পাকিস্তান টিকেই যায় তাহলে কোনোমতে মাথা নুইয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে যেন আবার মাথা উচু করে, হাঁকডাক করে বড় গলায় বলব যে, আমি কিংবা আমরা তো মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে ছিলাম না। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম ওরা অর্থাৎ মুজিব-অনুসারীরা কি করে। আমরা তো চেয়েছিলাম পাকিস্তান ধরে রাখার জন্যে। কিন্তু কট্টর মুজিবপন্থীদের জ্বালায় টিকতে পারিনি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমনি এক হতাশাময় মুহূর্তে আট নম্বর থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মাথার উপর ভবনের দোতলায় তৎকালীন আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক মোহাম্মদউল্লাহর (পরে প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে এমপি) কক্ষে বসে একজন বেশ জোর গলায়ই বললেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণা চাট্টিখানি কথা নয়। এমন হঠকারিতার কাজও মানুষ করে নাকি?

শুনেছি ওই লোকটি লন্ডন নাকি প্যারিসে থাকতেন। তাঁর প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। ভাবটা যেন এমন যে, তিনি লন্ডন নগরীর কেউকেটা। খোদ বৃটিশ সরকার তাঁর মতো ব্যক্তির পরামর্শে চলে! তিনি বলে-কয়ে বৃটিশ সরকারকে দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে দিতে পারেন। কলকাতা নগরীতে এসেছেন বোকাদেরকে একটু দেখে যেতে আর একটু উপদেশবাণী শুনিয়ে যেতে।

মোহাম্মদউল্লাহ ভাই একটি খাটের উপর লুঙ্গি পরে শুয়েছিলেন। তাঁর সামনেই চেয়ারে বসা স্যুট-টাই পরা লন্ডনপ্রবাসী ওই ভদ্রলোক একতরফাভাবে বললেন, আওয়ামী লীগ নেতারা কি ভুলই না করেছেন। লন্ডনে বসে তাঁরা এখন শান্তি পাচ্ছেন না। তাই ছুটে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চৌদ্দগোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক অপরিপক্বতা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে তাঁর চোখেমুখে যেন খৈ ফুটছিল! আওয়ামী লীগের তৎকালীন দফতর সম্পাদক স্বল্পভাষী সহজ-সরল শান্ত প্রকৃতির মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব খাটের উপর কাত হয়ে শুয়ে ওই লোকটির এসব উপদেশবাণী পরম ভক্তের মতো কান পেতে শুনছিলেন। কোনো একটি টু শব্দ তিনি করেননি। ওই লোকটিকে ঘিরে তখন মোহাম্মদাউল্লাহ সাহেবের ঘরে অনেক লোক। সদ্য লন্ডন থেকে এসেছেন, না জানি তাঁর কাছে কত খবর আছে আমাদের ভাগ্য সম্পর্কে। নোয়াখালী তো বটেই অন্যান্য জেলার লোকও তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছেন একাগ্রচিত্তে।

তিনি বোঝাতে চাইলেন, তাঁরা যাঁরা লন্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গে বুঝ-পরামর্শ করে একটা কিছু করলে ঘটনা এমন দাঁড়াতো না। শেখ মুজিবও একজন এজিটেটর, একজন হঠকারী নেতা। তিনি রাজনীতি বুঝেছিলেন কবে? রাজনীতি তো বুঝতেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মুজিবের মাথাটা নষ্ট করেছেন মওলানা ভাসানী। এখন ঠেলাটা সামলাও। মুরুব্বিয়ানার সুরে এমনি সব কথা।

লন্ডনী কায়দায় স্যুট-টাই পরা উঁচু লম্বা সুন্দর চেহারার এ মোটাসোটা লোকটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন মোহাম্মদউল্লাহর রুমে। নোয়াখালীর তখনকার আওয়ামী লীগ দলীয় কবি-গায়ক দোলোয়ার হোসেন, শাহাবুদ্দিন নিজাম এবং আমাকে ডেকে বললেন, চলুন উপরে যাই। তিনি লন্ডন থেকে এসেছেন। নোয়াখালী বাড়ি। তাঁর কাছে অনেক খবর পাওয়া যাবে।

আর যায় কোথায়? সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। তাঁরা সেখানে যখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নিচতলার ঘরে এসে হাজির হলেন তখনই সবার দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর উপর। ওখানে তখন নোয়াখালীর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ছুটে গেলেন তাঁর কাছে এবং কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর তাঁকে নিয়ে গিয়ে ওই লোকের মুখে এসব ঠাণ্ডা কথাবার্তা এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি ভৎর্সনা, তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে ধিক্কার ইত্যাদি হিতোপদেশ শুনলেন। পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকার চৌকস আওয়ামী লীগ কর্মী নিজাম খাঁটি ঢাকাইয়া ভাষায় কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে সিটি আওয়ামী লীগ কর্মী শাহাবুদ্দিন ও আমাকে ডেকে বললেন—আসো নজরুল, আমরা নিচে চলে যাই। ওসব লন্ডনীগোর কথায় আমাগো পেট ভরবে না। হালার কথা হুনলে ঈমানবি হালায় নষ্ট অইয়া যাইব। ওই হালা পাকিস্তানের দালাল। ইয়াহিয়া খান অরে ক্যালকাটা পাঠাইছে।

নিজামের পেছনে পেছনে চলে গেলাম।

মুজিবনগর আসার পর থেকে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাড়িতে আমার বিধবা মা, স্ত্রী ও শিশুপুত্র সম্পর্কে কোনো খবর পাইনি। খবর পাওয়ার কোনো উপায়ও ছিল না। তাঁরা কি বেঁচে আছেন না তাঁদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, এ প্রশ্ন যখন মনের কোণে উঁকি দিতো তখন এক অব্যক্ত বেদনা মনের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠত। মাঝে মাঝে তাদের কথা ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল হয়ে পড়তাম।

কখনো কখনো সবার অলক্ষ্যে এবং আমার অজান্তেই দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠতো যখন হুঁশ ফিরে আসতো তখন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছি। মনে হয়েছে আমি যেন এক অবুঝ শিশু! এসব কি আমার শোভা পায়? কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে?

দুচোখের পানি রুমাল দিয়ে মুছে সতেজ হয়ে যেতাম—যেন কিছুই হয়নি।

ভারতের উপর রাগ ধরে যেতো মাঝে মাঝে। অসহায় মনে মাঝেমধ্যে এ ধারণা জন্মাতো যে, ভারত ইচ্ছে করলেই যেন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে আমাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে। এরাও বুঝি আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগে আমাদেরকে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে। এমনি সব অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা মনে আবর্তিত হচ্ছে। এরই মধ্যে একদিন কলকাতার তৎকালীন সংবাদ সংস্থা

ইউএনআই'র সিনিয়র রিপোর্টারের (নাম মনে নেই) সঙ্গে দেখা। তিনি বয়সে আমার অনেক বড়। আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। প্রায়ই দিল্লী ছুটতেন। সব সময়ই স্যুট-টাই পরে থাকতেন। ভাব-নমুনায় উঁচুদরের সাংবাদিক বলে ধারণা জন্ম হতো মনে। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, তিনি দিল্লীর ইন্দিরা প্রশাসনের খুব বিশ্বাসভাজন লোক। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তথ্য সচিবের সাথে তাঁকে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। কারণ তাঁকে দিয়ে নাকি মাঝে মাঝে নানারকম স্পেশাল রিপোর্ট করানো হয়ে থাকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে। তাই তাঁকে প্রায়ই নাকি দিল্লী যেতে হয়। তাঁর কাছে নাকি সবসময়ই এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট থাকে।

তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি একজন সরল-সোজা মানুষ। জ্ঞান গরিমা কম। এক অনুন্নত দেশের লোক। তাঁর ভাষায় পাকিস্তানের এক কলোনীর লোক আমি। তাই দেখা হলে এবং ফাঁক পেলেই দিল্লীতে তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা এবং বিদেশ সফরের অনেক গল্প শোনাতেন আমাকে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতোই কৌতূহলী হয়ে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার গল্প শুনতাম।

আমার মন খারাপ দেখে হঠাৎ তিনি একদিন বললেন, নজরুল! বাংলাদেশে তোমার বাড়ি কোন শহরে?

আমি বললাম, আমার বাড়ি তো শহরে নয়, ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার এক পাড়াগাঁয়ে।

তিনি এবার অভিজাত ভঙ্গিতে বললেন, আরে তোমাদের ঢাকা শহর আর পাড়া-গাঁ তো এক রকমই। তফাতটা কোথায়? চলো আমার সঙ্গে দিল্লীতে, শহর দেখিয়ে আনবো তোমাকে—যাবে?

দিল্লী যাওয়ার আমার পুরো ইচ্ছে থাকলেও তাঁর কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তদুপরি টাকার কথা চিন্তা করে কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, দিল্লী যাব, আমার তো এত টাকা নেই।

তিনি আবার বললেন, সাংবাদিক হিসেবে তোমরা ঢাকার সাংবাদিকরা তো খুব একটা সুযোগ পাওনা বিদেশ যাওয়ার। সব বড় বড় দাওয়াতে বিদেশ সফরে যায় লাহোর, করাচী ও পিন্ডির উঁচুতলার সাংবাদিকরা। আর তুমি তো হচ্ছো বলতে গেলে এক কুয়োর ব্যাঙ। বিরোধী দলের তা-ও আবার পাকিস্তানের দুশমন আওয়ামী লীগের পত্রিকা ইত্তেফাকের সাংবাদিক।

কলকাতার সাংবাদিকদের ধারণা ছিল *দৈনিক ইত্তেফাক* বুঝি আওয়ামী লীগের পত্রিকা। কিন্তু আসলে *দৈনিক ইত্তেফাক* কোনো দলীয় পত্রিকা ছিল না। যাক, তিনি আবার আমাকে জোর দিয়ে বললেন, তুমি সত্যি দিল্লী যাবে? তুমি যাবে কি না বলো।

বললাম, যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাব কেমন করে? আমার তো টাকা পয়সা নেই।

তিনি বললেন, টাকার চিন্তা তুমি করো কেন? আমার সঙ্গে যাবে। আমি তোমার টিকিট কিনে দেবো। আগে তুমি যাবে কিনা সেটা বলো। টিকিটের ব্যবস্থা করবো। তোমার বসের পারমিশন নাও আগে। তারপর আমাকে জানিও। আমি ব্যবস্থা করবো। তুমি জয়বাংলা সরকারের সাংবাদিক। তোমার দিল্লী যাওয়ার পয়সা আমি ম্যানেজ করে নেবো।

মনে ভীষণ লোভ হয়েছিল। ভাবলাম মনটাও যখন খারাপ তখন মোগল সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী আর সম্রাট শাহজাহানের স্বপ্নের তাজমহল ঘুরে একটু দেখে আসি না কেন, আর হয়তো কোনোদিন সুযোগ পাবো না। মনে মনে স্থির করলাম দিল্লী যাব তাঁর সঙ্গে।

॥ চৌদ্দ ॥

একদিন জেনারেল ওসমানীর এডিসি ক্যাপ্টেন নূরের সঙ্গে আলাপ করলাম। বললাম, একটু দিল্লী যেতে চাই। স্যার অনুমতি দেবেন কিনা? আপনি একটু সুপারিশ করে অনুমতিটা নিয়ে দিন।

ক্যাপ্টেন নূর আমার দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারে সায় দিলেন। বললেন, বেশ তো একটু ঘুরে আসুন না। মন বেশ ফ্রেশ হয়ে যাবে। তবে জেনারেল সাহেবকে আপনি নিজে গিয়ে বলুন। আমি বললে মাইন্ড করতে পারেন। আমার মনে হয় রাজি হতে পারেন।

ক্যাপ্টেন নূরের কথায় আশ্বস্ত হলাম। আমি সময় ও সুযোগ খুঁজছিলাম জেনারেল ওসমানীর কাছে ছুটি চাওয়ার জন্যে। কিন্তু সে সময় তাঁর মন-মেজাজ খুব ভালো ছিল না। কোনো এক ঘটনায় তিনি ছিলেন উত্তেজিত। ঘটনাটি তাঁর ফুট-ফরমায়েশ করার বয়কে নিয়ে। ওই ছেলেটি জেনারেল সাহেবের গোসলের পর কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিতো। তাঁর জুতা পারিষ্কার করে দিতো। তাঁর ঘরে খাবার নিয়ে জেনারেল সাহেবকে খাওয়াতো। থালাবাসন ধুয়ে দিতো। জেনারেল সাহেব ওকে বেশ আদর করতেন। ওকে মাঝেমধ্যে কাপড়চোপড় দিতেন তিনি। একদিন কি এক কারণে যেন জেনারেল সাহেব ওর উপর চটে গিয়েছিলেন।

জেনারেল ওসমানী রাগবশত ওসি হেডকোয়ার্টারকে ডেকে এনে বলেন ছেলেটাকে বিদায় করে দিতে। অন্য একদিন ওসি হেডকোয়ার্টার জেনারেল সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার আবুলকে নাকি কি জন্যে গালাগালি করেছিলো। আবুলকে ওসি সাহেব বিদায় করে দিয়েছিলেন। আবুল কেঁদে কেঁদে জেনারেল সাহেবের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করেছিলো। ওসি সাহেব জেনারেল ওসমানীর রাগের মাথায় বলে ফেলা কথা অনুযায়ী ওই ছেলেটিকে আরো ধমক লাগিয়ে বিদায় করে দিলেন। কিন্তু পরদিনই যখন জেনারেল সাহেব ওই ছেলের খোঁজ করলেন তখন তাঁকে জানানো হলো যে, ছেলেটিকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে।

ছেলেটির বাড়ি ছিল বোধহয় যশোর জেলায়। ছেলেটিকে এই বিপদের দিনে বিদায় করে দেয়ার কথা শুনে জেনারেল ওসমানী চটে আগুন হয়ে গেলেন। ওসি হেডকোয়ার্টার সাহেবকে ডেকে তাঁর সঙ্গে ভীষণ রাগ করছিলেন। বৃদ্ধ ওসি সিলেট জেলারই লোক এবং জেনারেল সাহেবের নাকি বাল্যবন্ধু। বয় ও ড্রাইভারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় জেনারেল ওসমানী রাগে ছটফট করছিলেন। ওসিকে তাঁর ঘরে ডেকে এনে খুব করে শাসালেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জেনারেল ওসমানী বললেন, কেন এই দুর্দিনে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিলি? আমি বললাম আর অমনি তাড়িয়ে দিলি? সে যদি কলকাতা শহরে হারিয়ে যায়? কিংবা বর্ডার ক্রস করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে

পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায়? তাহলে তারা কি ওকে আস্ত রাখবে? যদি ওকে মেরে ফেলে তখন কি হবে? যাও ওকে যেখানে পাও ধরে নিয়ে এসো গিয়ে।

ড্রাইভার আবুলের সঙ্গে বৃদ্ধ মেজরের রাগারাগি করার বিষয় নিয়েও দুই বৃদ্ধের মধ্যে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। উত্তপ্ত কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে জেনারেল সাহেবের হাতের নাড়া লেগে ওসি মেজর চৌধুরীর চোখের চশমা টেবিলের ওপর থেকে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চরম হতাশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো সবাই। চারদিকে নিস্তব্ধতা।

পরদিন জেনারেল ওসমানী বৃদ্ধ ওসি মেজর চৌধুরীকে ডেকে এনে পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে বললেন, মিস্টার চৌধুরী, আই এ্যাম সরি দিস। রিয়েলি আই এ্যাম ভেরি শক্‌ড। প্লিজ ডন্ট মাইন্ড। টেক দিস মানি এন্ড হ্যাভ এ নিউ ওয়ান।

মেজর চৌধুরী তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে চশমা কেনার টাকা নিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে পরদিন মেজর চৌধুরীর চোখে নতুন চশমা দেখা গেল। এ যেন শাপে বরভ এসব ডামাডোলের মধ্যে জেনারেল ওসমানীর ধারেকাছে ভিড়তে সাহস পাইনি। তিনিও কোনো কারণে ডাকেননি। নয়াদিল্লী যাওয়ার পারমিশন চাওয়া তো দূরের কথা। দু' একদিন পর মেজাজ ঠাণ্ডা মনে করে তাঁর ঘরের দরজার মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঢুকলাম। লক্ষ্য করলাম, জোনারেল ওসমানী চুপ করে বসে আছেন।

জেনারেল ওসমানী চুপচাপ বসে রয়েছেন। আমিও নীরব। ভয়ে কোনো কথা বলছি না। সারা ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জেনারেল সাহেব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কি, নজরুল সাহেবের কি ব্যাপার? আপনার কোনো কথা আছে?

মাথা নেড়ে পরে আস্তে আস্তে আমতা আমতা করে বললাম, স্যার, আমার কিছুদিনের ছুটি দরকার। ভালো লাগছে না।

আমার মুখের কথা শেষ হতে পারেনি। মনে হলো সামনে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো জেনারেল সাহেবের মুখের ঠোঁট দুটো কিঞ্চিৎ সরে গিয়ে তাঁর সাদা ধবধবে দাঁত যেন বিদ্যাতের মতো চমকে উঠেছিল। রাগে গড়গড় করে উঠলেন, কি করবেন ছুটি নিয়ে? কোথায় যাবেন? দেশে যেতে পারবেন না। তা হলে ছুটি নিয়ে কি হবে?

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, স্যার, মনটা ভালো লাগছে না। তাই একটু ঘুরেফিরে দেখতাম ভালো লাগে কি না।

জেনারেল সাহেব আর কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে রাগের সঙ্গে বললেন, শুনুন নজরুল, এখানে ঘোরাফেরার কোনো জায়গা নেই, সময়ও নেই। আমরা এখানে ঘুরে ফিরে বেড়াতে আসিনি। রংতামাশা করতে আসিনি।

আরোও কর্কশ কণ্ঠে বললেন, এটা ছেলেখেলা নয়। এখানে ওসব হাংকিপাংকি চলবে না।

এবার আমার গায়ের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠলো। জেনারেলের লাল চোখ থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে আর মুখ থেকে যেন বের হচ্ছে বারুদ। আমি আর ওখানে বসে থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর শক্তি তখন ছিল না শরীরে। কেমন করে তাঁর সামনে থেকে সরে যাব তখন কেবল এটাই ভাবছিলাম।

এমনই সময় আরো ভারী ওজনের একটা ধমক দিয়ে জেনারেল বললেন, যান এখান থেকে। আমি প্রাইম মিনিস্টারকে সব বলবো। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হবে। এভাবে চলবে না—এভাবে চলতে পারে না। আপনি আসুন।

আমি আর কোনো কথা পাচ্ছিলাম না খুঁজে। কি বলে সেখান থেকে উঠে আসবো। মনে হয়েছিলো যেন একটা উঁচু ডাল থেকে ফসকে পড়ে গেছি অনেক নিচে। কথা বলার শক্তি আমার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু শরীরটাকে অনেক কষ্টে চেয়ার থেকে টেনে তুলে কোনো মতে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম এডিসি নূরের রুমে। ক্যাপ্টেন নূর ও তাঁর সামনে বসা মেজর সালাউদ্দীন মুচকি হাসছিলেন। আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। মনে মনে ক্যাপ্টেন নূরের উপর আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। আমি নাহয় তখন জেনারেল সাহেবের মুড এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জনতাম না, কিন্তু ক্যাপ্টেন নূর তো সব জানতেন। তিনি তো অন্তত আমাকে আগেই সাবধান করতে পারতেন।

এর মাঝে মেজর সালাহউদ্দীন আবার একটু ফোড়ন কেটে বললেন, 'কেমন ক্যাচাটা খেলেন পিআরও সাহেব?' বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। ক্যাপ্টেন নূরও তাতে যোগ দিলেন। আমার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা! লজ্জায় ইচ্ছে হয়েছিলো তখন মাটির নিচে চলে যাই। দিল্লী, বোম্বে ঘুরে বেড়ানোর রঙিন স্বপ্ন তখন মন থেকে কখন পালিয়ে গেছে।

এবার ক্যাপ্টেন নূর আর মেজর সালাহউদ্দীনের পালা। তাঁরা উপদেশ বর্ষণ করতে লাগলেন। পিআরও সাহেব সিভিলিয়ান মানুষ আপনি। মিলিটারীর মেজাজ দেখেননি। ডিসিপ্লিন বোঝেননি। সময় বোঝেননি। এটা নরমাল সময় নয়। একটা অস্বাভাবিক সময় এখন—এখন মানুষ জীবন নিয়ে বাঁচতে পারছে না। আর আপনি ভাবেন ছুটির কথা!

আমি আর সইতে পারছিলাম না। তবু চুপ করেই রইলাম। কি কথা বলবো তা-ও মাথায় আসেনি তখন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা চুপ মেরে গেলেন। আমি নীরবে বসে রইলাম। সবার অলক্ষ্যে আমার দু'চোখ বোধ হয় তখন অশ্রু-টলটলায়মান।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন নূর সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললেন, পিআরও সাহেব! খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্ক থেকে একটু ঘুরেফিরে আসুন। মন-মেজাজ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর্মিতে জেনারেলদের ধমক কোনো ব্যাপার নয়। আর্মিতে ডিসিপ্লিন ব্রেক করলে নির্ঘাত সাজা হয়ে যায়। আর এখন তো যুদ্ধকালীন অবস্থা। আপনার কপাল ভালো, বেঁচে গেছেন অল্পেতে। আপনার সাহস কম নয়, একে তো এ সময় চেয়েছেন ছুটি, তার উপর আবার ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছুটি। আপনি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে এসেছেন। কিছু খরচ করে ফেলুন।

সত্যি বলতে কি, আমি কিন্তু পরিস্থিতিটাকে এমনভাবে দেখিনি। আমার কাছে কেমন যেন তখন একটা স্বাভাবিক অবস্থা মনে হয়েছিল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সত্যিই আমার যেন তেমন ধারণা ছিল না।

এমনই হতাশাময় এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় পরদিন ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল রিখীর দফতরে গেলাম। সেখানে সবাই যার যার আসনে বসে বসে একমনে কাজ করছেন। আমি অফিসে ঢুকে গুড মর্নিং দিলাম। তারা আমার দিকে চোখ তুলে না

তাকিয়ে কেবল মাথা নেড়ে গুড মর্নিংয়ের জবাব দিলেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একটি খালি চেয়ারে বসে দিনের খবরের কাগজগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছিলাম। বেশ খানিকক্ষণ পর কাজ শেষ করে কর্নেল রিখী তাঁর সুন্দর মুখে ঈষৎ হাসির তরঙ্গ তুলে হিন্দী মিশ্রিত বাংলায় বললেন, কী নজরুল ছাহেব কেয়া খবর? জয়বাংলা সরকার আছে তো?

দুর্বল মনে আমি হতবিহ্বল। মুহূর্তের মধ্যে মুজিবনগর সরকারের অফিসে গত কয়েকদিন থেকে বিরাজমান থমথমে গুমোট পরিবেশটা আমাকে যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সচকিত করে তুললো। আমি বুঝতে পারছিলাম কর্নেল রিখী কি বলতে চাচ্ছেন। আমার ভেতরের জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে যেন উত্তাল সমুদ্রের আরেকটি পর্বতসম তরঙ্গ এসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমি নিষ্পলক নেত্রে অসহায়ের মতো কর্নেল রিখীর হাসিতে উজ্জ্বল মুখপানে চেয়ে রইলাম। পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্রচারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স বিভাগের বাছাই করা চৌকস মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল রিখীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার অন্তর্লোকের উথাল-পাথাল পরিস্থিতি দেখতে ব্যর্থ হয়নি। ঠোঁটে তার মৃদু হাসি। কী নজরুল ছাহেব, বাড়ির কথা মনে পড়েছে? ভাবী আওর বাচ্চার কথা? কোই খবর নেহি? তুম চিন্তা মত্ করো, সব ঠিক হো জায়গা।

তারপর পিওনকে চা দেয়ার জন্যে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমার প্রাইম মিনিস্টার আওর জেনারেল সাহেব তো দিল্লী থেকে ফিরে এসেছেন। কিছু বলেননি তোমাদেরকে? অবস্থা তো থোড়া জটিল হোগেয়ি। তারপর তোমার অবস্থা কি? বোলোর সব খুলে বোলো।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কোন কথা বলবো—নিজের বাড়ির কথা? বউ-সন্তানের জন্যে চিন্তার কথা, না আমার উপর জেনারেল সাহেবের বিস্ফোরণের কথা? না মুজিবনগর সরকারের দফতরের হতাশাময় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির কথা? কোন কথা বলবো তাঁকে? নিজেকে এ পরিস্থিতিতে কোনো সম্ভাব্য ঝামেলায় নিক্ষিপ্ত না করে সোজা কথায় বললাম, বাড়ি থেকে আসার পর এ পর্যন্ত মা-বউ ও বাচ্চার কোনো খবর পাইনি।

আরে বোকা, তুমি যে কলকাতায় আছো, বেঁচে আছো তা কি তুমি জানিয়েছ তোমার মাকে? তাঁরা কি তোমার বর্তমান ঠিকানা জানেন?

রিখী প্রশ্ন করলেন। বললাম, না।

তাহলে তোমাকে তাঁরা জানাবেন কেমন করে। তারা কেমন আছেন? নজরুল, তুমি তো যুদ্ধ করতে এসেছো। দেশকে স্বাধীন করতে, দেশের মানুষকে বাঁচাতে এসেছো। তুমি তোমার মা-বউ আর সন্তানের চিন্তা করলে দেশকে স্বাধীন করার চিন্তা করবে কখন? দেশটা তো শুধু তোমার মা-বউ ও সন্তানকে নিয়ে নয়। সব লোককে রক্ষা করতে হবে। এ মতলব নিয়েই তো এসেছো। তোমার মা-বউ ও সন্তানকে তো পাকিস্তানীরা মেরে ফেলতে পারতো। এমন তো হাজার ফ্যামিলিকে বাংলাদেশে মেরে ফেলেছে ওরা।

আমি লজ্জিত হলাম। তিনি বললেন, এসব চিন্তা রাখো। তুমি চিঠি লিখ তোমার ওয়াইফের কাছে। তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে আমার কাছে দাও। আমি চিঠি পাঠিয়ে দেবো। চিঠির জবাবও আনিয়ে দেবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না।

মুহূর্তের মধ্যে আমার ভেতরের ঝড় তুফান কিছুটা থেমে গেলো বটে, কিন্তু মুজিবনগর সরকারের দফতরে বিরাজমান থমথমে পরিবেশটা তো আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। সেকথাটাও তাঁকে জানালাম।

রিখী হেসে দিয়ে বললেন, ওসব নিয়ে তোমার-আমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওসব পলিটিক্যাল ব্যাপার। এটা দেখার জন্যে নেতারা আছেন।

তবে আমার উপর জেনারেল ওসমানীর রাগারাগির ঘটনাটা রিখীকে জানাইনি। একদম চেপে গেলাম।

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের একজন পরামর্শক রিখীর দফতরে আমাকে বললেন, এখন তোমাদের ওয়ার বুলেটিনে বাংলাদেশে গেরিলাদের হাতে বেসামরিক লোক অর্থাৎ রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটি ও আল-শামস বাহিনীর লোকজন হত্যার খবর আর এত বেশি করে দেবে না। এসব সিভিলিয়ান হত্যার খবর এখন থেকে চেপে যাও। তবে হানাদার বাহিনীর দোসর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক লোক মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে নিহত হলে সেগুলো অবশ্যই দেবে। কারণ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেসামরিক রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী ও পাকিস্তান সমর্থক রাজনৈতিক দলের কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের পাকিস্তানপন্থী সদস্যদের ব্যাপক হারে নিহত হওয়ার খবর বেশি প্রচার করা হলে বহির্বিশ্ব মনে করবে বাংলাদেশে আসলে মুক্তিযুদ্ধ চলছে না—গৃহযুদ্ধ চলছে। পাকিস্তান ও তার আন্তর্জাতিক মিত্ররা তোমাদের মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধ না বলে স্থানীয়-অস্থানীয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বলে প্রচার করছে। বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ চলছে একথা একবার বহির্বিশ্বে এস্টাবলিশ করা হলে এতে তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ ধামাচাপা পড়ে যাবে। তখন তোমাদের সব চেষ্টা বরবাদ হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের ভেতরে তখন লোক দেখানো বেসামরিক প্রশাসন খাড়া করার চেষ্টা চলছে। ডাক্তার মালেককে বেসামরিক গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে। অধিকৃত বাংলাদেশে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য ঘোষণা করে তদস্থলে পাকিস্তান সমর্থক হানাদার বাহিনীর দোসরদের নিয়ে এক প্রহসনমূলক নির্বাচন করে তথাকথিত প্রাদেশিক পরিষদ পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল এই প্রহসনের নির্বাচন যেকোনো ভাবে বানচাল করে দিতে হবে। ভোটকেন্দ্র পুড়িয়ে দিতে হবে। পাকিস্তানের দালাল নির্বাচন প্রার্থীদেরকে পাকিস্তানী পতাকার কাফন পরিয়ে আজরাইলের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

মুজিবনগর সরকারের হতাশার কুয়াশা তখনো কাটেনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের গোপনীয়তার নিশ্ছিদ্র দেয়াল ভেদ করে নেতৃবৃন্দের রহস্যজনক নীরবতার নেপথ্য কোনো কারণ বাইরে প্রকাশ পায়নি। পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাও নেই। এ পরিস্থিতিতে মুজিবনগরে নানা গুজব পাখা মেলে আকাশে-বাতাসে উড়ছে।

আমেরিকা-চীন প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিচ্ছে না। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে

অবস্থান নিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের তীব্র প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ প্রশ্নে দুই বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে। ভারতের অবস্থান তখন সোভিয়েত বলয়ে। ভারতের ঘাড়ের উপর নাঙ্গা খড়গ নিয়ে দণ্ডায়মান ভারতের তৎকালীন এক নম্বর শত্রু চীন পিংপং রাজনীতির প্রভাবে মার্কিন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এর প্রভাব বাংলাদেশ এবং ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান।

এ পরিস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের অবস্থা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যা নিয়ে প্রভাবশালী দুই প্রতিপক্ষের টানাটানির মাঝখানে কন্যাদায়গ্রস্ত এক অসহায় পিতার মতো।

অন্যদিকে সৌদী আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ পাকিস্তান ধ্বংস করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৈরী মনোভাবাপন্ন। মুজিবনগর বা কলকাতায় এবং আগরতলায় আওয়ামী লীগ রাজনীতির ভেতরে বাইরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই বিপরীতমুখী প্রেক্ষাপট নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অন্ত নেই। কুটনৈতিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মন্তব্য ও গুঞ্জরণে মুজিবনগরের আকাশ ভারাক্রান্ত।

রণাঙ্গনে যুদ্ধরত থাকলে হয়তো আমাকে এসব স্পর্শ করতে পারতো না। কিন্তু আমার মুশকিল হলো কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের শীর্ষকেন্দ্রে অবস্থান করে বিপরীতমুখী মিশ্র বাতাসের প্রভাবে কখনো আমি উত্তপ্ত আবার কখনো শীতল হয়ে পড়তাম। নিজের হতাশা ও চিন্তাভাবনারও কোনো অন্ত নেই। উদ্ভূত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ রাজনীতির পরিমণ্ডলের স্বঘোষিত পণ্ডিতদের অযাচিত কূটনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম।

অসহনীয় এই পরিস্থিতিতে একটু মুক্ত শ্বাস-নিশ্বাস নেয়ার আশায় একদিন আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলামের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম কলকাতার সিআইটি রোডের একটি বহুতল বাড়ির সাত তলায় বসবাসরত মুজিবনগর সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসভবনে। নূরুল ইসলাম এবং আমি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পূর্বপরিচিত ছিলাম।

তাঁর ঘরের সোফায় গিয়ে বসতেই বঙ্গবন্ধুর অন্ধ অনুসারী ও বিশ্বস্ত পার্শ্বচর নূরুল ইসলামকে দেখে বৃদ্ধ খন্দকার মোশতাক কোনো কিছু না বলেই হুহু করে কান্না শুরু করলেন। কিছুই বুঝতে পারলাম না। মুজিবভক্ত খন্দকার ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নূরুল ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন, মোশতাক ভাই, কি হয়েছে?

না জেনে না শুনে নূরুল ইসলাম সাহেবের গলার আওয়াজও ততক্ষণে ভারী হয়ে উঠেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরোত্তর দিল্লী ব্রিফিং বৈঠকে যোগদান করতে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ দিল্লী যাননি। কেন যাননি, কিংবা তাঁর দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারে দিল্লী থেকে কোনো গ্রীন সিগন্যাল ছিল কিনা এসব প্রশ্ন তখন মনে উদয় হয়নি। হয়তো বা রাজধানী রক্ষা করার দায়িত্বে তাঁকে রেখে অন্যরা দিল্লী গিয়েছিলেন।

নূরুল ইসলাম সাহেবের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে খন্দকার মোশতাক হুহু করে কেঁদে চললেন। হাড়ে হাড়ে রাজনীতিক নূরুল ইসলাম সাহেব অকারণেই নিজের চোখ মুছে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আবার শুধালেন, মোশতাক ভাই কি হয়েছে? একটু বলুন না?

আমি নির্বাক বিস্ময়বিমূঢ়। নিজের উপর দুঃখ হলো, এমনই পোড়াকপাল। যেখানে যাই সেখানেই এ অবস্থা? আর বোধ হয় কোথাও গিয়ে স্বস্তি পাওয়ার উপায় নেই।

খন্দকার মোশতাক বিগলিত হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি বেঁচে থাকবো আর আমার নেতা শেখ মুজিব বেঁচে থাকবেন না—এটা আমি মেনে নিতে পারি না। এটা আমি ভাবতে পারি না নূরু। আমরা বেঁচে থাকবো দুনিয়ায় আর মুজিব আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে যাবেন দুনিয়া ছেড়ে। না- না।

সজোরে চিৎকার দিয়ে খন্দকার মোশতাক বললেন, না না, এটা কিছুতেই হতে দিতে পারি না আমরা।

নূরুল ইসলাম এবার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কি বলছেন এসব মোশতাক ভাই? ভালো করে সব খুলে বলুন।

এ কান্নায় যোগ না দেয়াটা আমার জন্যে দোষণীয় হবে কিনা আমি তাই ভাবছিলাম নীরবে বসে। আমার পাশে বসা নূরুল ইসলামের চোখ বেয়ে টসটস অশ্রু ঝরছিল। খন্দকার মোশতাক আহমদের কান্নার ঢেউ এসে ধাক্কা মেরে মুজিব-পাগল নূরুল ইসলামের হৃদয়কে বিগলিত করে দিয়েছিল।

খানিকক্ষণ পর খন্দকার মোশতাক মাথা উঁচু করে চোখ মুছে বলতে শুরু করলেন ইন্দিরা গান্ধীর হোয়াইট হাউস মিশনের নেপথ্য তথ্য। হোয়াইট হাউস থেকে গান্ধী নতুন এক বাণী নিয়ে দিল্লী ফিরে এসেছেন। কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরের দীর্ঘ নীরবতার রহস্যের পর্দা আস্তে আস্তে উন্মোচিত হতে লাগলো।

॥ পনের ॥

ওয়াশিংটনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন নেতৃবৃন্দের কি কথা হয়েছিলো তা কেবল জানতেন মার্কিন প্রশাসনের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ আর ইন্দিরা গান্ধী নিজে। তেমনি ওয়াশিংটন থেকে দিল্লীতে ফিরে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে ডেকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর কি কথাবার্তা হয়েছিলো তাও সঠিকভাবে বলতে পারতেন কেবল দিল্লী বৈঠকে উপস্থিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ আর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কলকাতায় অবস্থানরত আমরা যারা অতি সাধারণ মানুষ, তাদের জন্যে এসব উঁচুতলার সঠিক খবর রাখা ছিল আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখার মতো এক অনধিকার-চর্চা।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের বৈঠক এবং আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মনগড়া ও কাল্পনিক তথ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার ছিল না। তবে সেদিন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের

চেম্বারে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেডিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলাম তার সারসংক্ষেপ ছিল এ রকম অধিকৃত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচারের উদ্যোগ চলছে। পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্তার মনোভাব কারো অজানা ছিল না। '৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে সামরিক শাসক আইউব খানের ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ সামরিক আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নীলনক্শা সফল হয়নি উত্তাল গণ-অভ্যুত্থানের কারণে। এবার যাদু যাবেন কোথায়? এবার বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তানের খোদ পাঞ্জাব মুল্লুকের লাহোর জেলে। বাঙালিদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এবার নিরাপদ নিরুপদ্রব পরিবেশে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এতকালের লালিত স্বপ্ন ও নীলনক্শা বাস্তবায়ন করবে। এবার মুজিবের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। এখন কেবল পরাশক্তি আমেরিকাই পারে তার মিত্র পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে।

ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন গিয়ে উপমহাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি, পাকিস্তান-বাংলাদেশ ইস্যু এবং শেখ মুজিবের বিচারপ্রহসন সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং শেখ মুজিবকে প্রাণে বাঁচানোর ব্যাপারে তাঁদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জার শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা দুটা এক সঙ্গে পারা যাবে না। তবে মুজিবের অনুসারীরা যদি তাঁদের নেতার প্রাণ রক্ষা করতে চান তাহলে তাঁদেরকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকেই পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোসে পৌঁছাতে হবে। তা না হলে এর দুটি পরিণতি হতে পারে। এক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী করে তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সরকার গঠন করা, শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবি পূরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন, এমনকি পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সীট ঢাকায় স্থানান্তর করা ইত্যাদি। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে উইন ওভার (জয় করে) পাকিস্তানের বর্তমান কাঠামো সংহত রাখতে পারে।

মার্কিন নেতৃবৃন্দ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে আরো বলেন, আমরা (মার্কিনী) হলে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে এবং তাঁর ৬ দফা সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে, এমনকি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করে হলেও পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষা করতাম।

দুই এসব শর্তে রাজি না হলে তাদের হাতে বন্দী মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারে পাকিস্তান।

যদি শেখ মুজিব পাকিস্তানের এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান এবং পাকিস্তান যদি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট বানিয়ে তাঁর ৬ দফা পুরোপুরি মেনে নেয় তাহলে মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্ব কি হবে? পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ তখন জয়বাংলা সরকারকে গ্রহণ করে নেবে না। সৈয়দ নজরুল-তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রবাসী বিপ্লবী সরকারকে মেনে নেবে? পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জনগণ যদি তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত অখণ্ড পাকিস্তান সরকারকে মেনে নেয় তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কি দাঁড়াবে? মিসেস গান্ধী এসব ভালো করে ভেবে তোমার অগ্রসর হওয়া উচিত। তা না হলে ভারতের জন্যেও বিপদ ডেকে আনা হবে। এছাড়া বিশ্ববাসী চেনে শেখ মুজিবকে। তাজউদ্দীন-সৈয়দ নজরুলকে বিশ্ববাসী চেনে না। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে শেখ মুজিবের নামে এবং তাঁর নেতৃত্বে। পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গঠিত হলে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব আর তখন থাকবে না। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ব্যাপরে জড়িত হতে পারে না। কারণ এটা হবে একটি অনিশ্চিত প্রয়াস। পাখি এখন পাকিস্তানের খাঁচায় বন্দী।

তবে যদি মুজিবকে বাঁচাতে চাও তাহলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে অখণ্ড পাকিস্তান মেনে নিয়ে শেখ মুজিবকে প্রাণে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা চালাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা কোনটা চাও কিংবা বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার তথা মুজিব অনুসারীরা কোনটা চায় সেটা আগে ভালো করে যাচাই করে নাও। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মার্কিন নেতৃবৃন্দের এ কথার কোনো তাৎক্ষণিক জবাব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা তখন দিতে পারেননি। বরং মার্কিন নেতৃবৃন্দের এসব কথাবার্তায় ইন্দিরা গান্ধীর মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্যে বিশ্ব সফরের পরিকল্পনা ওয়াশিংটন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেই দিল্লী ফিরে আসতে বাধ্য হন। দিল্লীতে ফিরেই তিনি মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠান। এ উপলক্ষেই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, জেনারেল ওসমানী প্রমুখ মুজিবনগর সরকারের নেতা দিল্লী সফরে যান।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে মার্কিন নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। মিসেস গান্ধী মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে জানতে চেয়েছেন, তাঁরা আসলে কি চান? তাঁরা সত্যিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান, না শেখ মুজিবকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে চান? দুটি এক সঙ্গে পাওয়ার আশা না করাই ভালো। অর্থাৎ শেখ মুজিবকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির বিনিময়ে পেতে হবে। না হয় শেখ মুজিবকে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হবে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর জীবন পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে বলি দেয়ার বিনিময়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতা মিলবে কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিশ্বের বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশে বাংলাদেশ কতদিন মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে তা ভালো করে হিসাব-নিকাশ করে দেখার বিষয়। এমন সব পরিস্থিতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুজিবনগর সরকারের

নেতৃবৃন্দকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁদের মনোভাব কি তা সুচিন্তিতভাবে চিন্তাভাবনা করে সঠিক এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লীকে জানাতে হবে। মিসেস গান্ধী মুজিবনগর নেতৃবৃন্দকে এজন্যে এক মাসের সময়সীমাও বেঁধে দেন। অর্থাৎ এই এক মাসের মধ্যে মুজিবনগর নেতৃবৃন্দের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার পর দিল্লী তার পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে।

দিল্লী মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলো। আসলে কি চাই—বাংলাদেশের স্বাধীনতা, না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? একটি দেশ ও জাতির মুক্তি, না একজন ব্যক্তির মুক্তি? কোনটি বড়? ব্যক্তি, না একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ? এমনই এক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় উদভ্রান্ত ও যন্ত্রণাকাতর ভগ্ন হৃদয় নিয়ে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ মুজিবপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ।

খন্দকার মোশতাকের চেম্বারে এসব কথা শোনার পর আমার বুঝতে বাকি থাকলো না প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দফতরে বিরাজিত হতাশাময় নিস্তব্ধতার নেপথ্য কারণ। কিন্তু মুখ খুলছেন না। চারদিকে হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস এমনি এক অবস্থা।

॥ ষোল ॥

বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত স্বাধীনতা চাও, না মুজিবকে চাও প্রশ্ন মুজিবনগর নেতৃবৃন্দকে সাময়িকভাবে কঠিন ভাবনায় ফেলেছিল। মুজিবনগর নেতৃবৃন্দ এক জটিল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে। এজন্যেই স্বাধীন বাংলা সরকারের নেতৃবৃন্দের দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর থেকে এই হতাশা ও অপ্রত্যাশিত নীরবতা।

সদর দফতরে এইসব থমথমে ভাব দেখে মনে হতো, কোথায় যেন কি হয়ে গেছে। সবার মধ্যেই তখন চাপা দীর্ঘশ্বাস। বলতে কি আমিও যেন কাজ করতে কোনো উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। তবে ওয়ার বুলেটিন বের করা বন্ধ হয়নি। স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত নিয়মিত হাজির হচ্ছেন, আমাদের কাজে সাহায্য করছেন। তাঁর মধ্যে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিনি। তাঁর মুখের দিকে তাকালে কিংবা তাঁর তৎপরতা দেখলেই মনেই হয় না যে কিছু একটা ঘটেছে। তবে আমার মধ্যে উদ্যমহীনতা জেঁকে বসেছিলো। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম মোড়লের বিরুদ্ধে আমার অনিরুদ্ধ ক্ষোভ ও ঘৃণার তাপহীন এক জ্বলন্ত আগুনে আমি দগ্ধীভূত হচ্ছিলাম। আর বুঝি বহু আরাধ্য ও স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবো না। আর বুঝি মা–বউ ছেলে এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ দেখতে পারবো না। এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা জ্বলন্ত চিতা হয়ে বসেছিল আমার মধ্যে। আমি নিরন্তর জ্বলেপুড়ে মরছিলাম।

এডিসি ক্যাপ্টেন নূর আমাকে একদিন বললেন, কি ব্যাপার পিআরও সাহেব? হয়েছেটা কি? আপনি তো পিএম-এর কাছে যানটান। কিছু খবর-টবর আনুন, আমাদেরকে কিছু জানান, যুদ্ধ হবে কি হবে না। এভাবে যুদ্ধ চললে দেশ স্বাধীন হবে না।

আমি বললাম, কেন জেনারেল সাহেবও তো প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী গিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে ফিরেই সবাই এমন চুপ মেরে গেলেন কেন?

অবশ্য আমি খন্দকার মোশতাকের ওখানে যা শুনেছিলাম তা ক্যাপ্টেন নূরকে বলিনি। আসলে নূর সামরিক বাহিনীর লোক। কোন কথা থেকে কোন কথা হয়ে যায়, তাই চেপে গেলাম এতবড় সুন্দর একটি গল্প। সত্যি বলতে কি, খন্দকার মোশতাকের ওখানে যে কথা শুনেছিলাম তাকে আমি একটি গল্প বলেই মনে করেছিলাম। তবে এটা হয়তো সেদিন আমার দুর্বোধ্যতার কারণেও হতে পারে। আমার অজ্ঞতার কারণে আমি এই গল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারিনি কিংবা গুরুত্বও দেইনি।

ক্যাপ্টেন নূর বললেন, জেনারেল সাহেবের কথা ছেড়ে দিন। এই বুড়া রাজনীতি বোঝেন না। জেনারেল সাহেবের মন খারাপ অন্য কারণে।

বললাম, সেটা কি?

নূর বললেন, সেটা আপনি বুঝবেন না। এটা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার। যুদ্ধের ব্যাপার। অস্ত্রের অভাবে আমাদের সৈনিকরা যুদ্ধ করতে পারছে না। ওই কয়েকটি গাদা বন্দুক, কিছু গ্রেনেড, কিছু থ্রি নট থ্রি আর সাধারণ কিছু মাইন দিয়ে কি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল পাকিস্তানী আর্মির মোকাবিলা করা যায়? যুদ্ধ করতে প্রচুর গোলা-বারুদ, সাজ-সরঞ্জাম লাগে। আমাদের নদীমাতৃক দেশ। ওদের তো গানবোট আছে। নৌবাহিনীর সাঁজোয়া জাহাজ আছে। স্থলভাগে অনেক সামরিক লরি, ট্রাক, ভ্যান ও সাজসরঞ্জামের অভাব নেই। ওদের হাতে ট্যাংক আছে, এন্টি-এয়ারক্রাফট গান আছে, কামান আছে, ফাইটার বিমান আছে। এসবের তুলনায় আমাদের কি আছে? আমাদের তো শুধু কতোগুলো মানুষ আছে। কিন্তু ওদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। শত্রুদের গোলার খোরাক হওয়া ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে?

ক্যাপ্টেন নূরের ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠের এসব কথা শুনে আমি আরো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমি আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বাংলাদেশ নামক কোনো দেশের জন্ম হবে এ বিশ্বে, আর আমার মতো লোকের সৌভাগ্য হবে সে দেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক হওয়ার। আহা! কি সুখ লাগে! আমি স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক একথা ভাবতে চোখে আনন্দাশ্রু এসে যায়। সে ভাগ্য কি হবে? যদি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এক মুহূর্তের জন্যে গিয়েও মরতে পারতাম, তবে সে মরণ কত সুখের মরণই না হতো। আহা! যদি এমন সৌভাগ্য হতো আমার।

ক্যাপ্টেন নূরের সামনে বসে অসহায় মনে এসব কথা ভাবছিলাম, মনে মনে কল্পনা করছিলাম, স্বপ্নও দেখছিলাম এক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ পোড়ামুখে আর কেমন করে উচ্চারণ করবো পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শব্দ। এই দু'চোখে আবার কেমন করে দেখবো অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা-ধর্ষণ, নিষ্ঠুর বুটের তলায় মানবতা পিষিয়ে মারার ও ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতীক ঘৃণ্য এই পাকিস্তানী পতাকা।

একথা কল্পনা করে আমার তখন ইচ্ছে হয়নি কলকাতার ঘাঁটিতে বসেও চোখ খুলে দুনিয়াটা একটিবারের জন্যে দেখার। আর আমাদের মুজিবনগর সরকারের উপর আমার মন বিষিয়ে উঠছিল। অস্ত্র নেই? আমাদের জোয়ানরা, আমাদের ছেলেরা যারা জীবন বাজি রেখে পাহাড়ে-জঙ্গলে, নদীতে-খালে-বিলে না খেয়ে পড়ে রয়েছে প্রিয়

মাতৃভূমিকে হায়েনাদের হাত থেকে স্বাধীন করার দুর্জয় অঙ্গীকার নিয়ে, তাদের হাতে অস্ত্র নেই? অস্ত্রের জন্যে যুদ্ধ করতে পারছে না তারা?

আমার শান্ত মনও মুজিবনগর সরকার আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কী দায়িত্বহীন নেতৃত্ব? একটি জাতির, একটি দেশের মানুষের ভাগ্য, জীবন-মরণ প্রশ্ন নিয়ে নেতৃত্বের কী নিদারুণ ছিনিমিনি খেলা! কেন এই অবিমৃশ্যকারিতা ও প্রহসন? এটা কি ছেলেখেলা নাকি? তাঁদের এই দায়িত্বহীনতা ও অদূরদর্শিতার জন্যে একটি দেশের মানুষ সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? এমনই এক অনিরুদ্ধ আবেগ আর ক্ষোভ মিশ্রিত অনুভূতি অবরুদ্ধ মনে আগুন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলছিল। ইচ্ছে হয়েছিলো তখনই নূরের সামনে থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলি, এসব কি শুরু করেছেন এতগুলো মানুষের ভাগ্য নিয়ে?

অবশ্য বাস্তবে আমার এ দুঃসাহস হতো কিনা আমি জানি না। তবে পরক্ষণেই মন আমার শান্ত হয়ে গেল। শান্ত, স্নিগ্ধ তাজউদ্দীন আহমদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে। একা একা থাকেন বউ ছেলে ফেলে রেখে আট নম্বর থিয়েটার রোডের দফতরে। আশ্রয়দাতা দেশের দয়ার উপরই নির্ভর করে সবকিছু। মনকে শান্ত করলাম। তবে স্থির করলাম রাতে তাঁর কাছে যাব। আর কিছু না হোক, অন্তত সাহস করে যুদ্ধের অস্ত্র সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবো সবিনয়ে। তাজউদ্দীন সাহেবের ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বের অকপটতা, সরলতা, মানসিক স্থৈর্য, চিন্তার অতল গভীরতা ও অগ্নিকঠোর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমার এক অন্ধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। জানতাম, আমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বললেও তাঁর নির্ধারিত বিষয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। আমার ও তাঁর এই গোপনীয়তার সীমারেখা কোনো সময়ই অতিক্রম করার চেষ্টা করতাম না। অন্ধভাবে হৃষ্টচিত্তে সবকিছু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতাম।

কিন্তু সেদিন রাতে মনের বিস্ফোরণোন্মুখ ক্ষোভকে সযত্নে সংবরণ করে গম্ভীর তাজউদ্দীন সাহেবের সামনে গিয়ে সাহস করে বসলাম। তাজউদ্দীন সাহেবের বিশ্বস্ত ও স্নেহবৎসল সিটি আওয়ামী লীগের সাহাবুদ্দিন আমার সঙ্গে ছিলেন। সাহাবুদ্দিন ঠাসঠাস করে কথা বলতে পারতেন তাজউদ্দীন সাহেবের সামনে। সাহাবুদ্দিনকে আগেই সবকিছু বুঝিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন গভীর রাতে স্বভাবসুলভ ভাবে বিছানার উপর বসে সামনের টেবিলের উপর একমনে ফাইলওয়ার্ক করে যাচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁর ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম। সাহাবুদ্দিন কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, কি ব্যাপার তাজউদ্দীন ভাই, আমরা কি দেশে ফিরে যেতে পারবো? সেরকম তো কোনো কিছু দেখছি না। মনে হয় সব থেমে গেছে।

তাজউদ্দীন সাহেব চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে কিছুটা হেসে বললেন, কিছুই হচ্ছে না মানে কি? কি হচ্ছে না? সবই তো হচ্ছে। যুদ্ধ হচ্ছে কিনা নজরুল তো সামনেই আছে তাকে জিজ্ঞেস করো। যুদ্ধ হচ্ছে কিনা সে-ই তো বলতে পারবে। সে জেনারেল সাহেবের কাছে থাকে। সেক্টর কমান্ডার জেনারেল সাহেবের কাছে আসা-যাওয়া করেন। নজরুল যুদ্ধের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট লিখে খবরের কাগজে দেয়। সেই জানে যুদ্ধ হচ্ছে কি না।

আমি সুযোগ পেলাম আমার কথাগুলো বলার। মনের ভেতরের প্রচণ্ড ক্ষোভ চেপে ধরে চাপাগলায় কোনো কোনো সেক্টর কমান্ডারের নাম ভাঙ্গিয়ে অনুযোগের সুরে বললাম, তাজউদ্দীন ভাই, সেক্টর কমান্ডারদের কাছে শুনতে পাই অস্ত্রের অভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে পারছে না। তাঁদের কাছে কিছু গ্রেনেড এবং হাল্কা মাইন ছাড়া আর কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। এসব সাধারণ অস্ত্র নিয়ে ওরা সুসজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস পাচ্ছে না।

আমি সবজান্তার মতো পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে থাকা বিরাট বিরাট অস্ত্রশস্ত্রের নাম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে শুনিয়ে বললাম, এসবের তুলনায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কি অস্ত্র আছে? এসব দিয়ে যুদ্ধ হবে কিভাবে?

অনধিকার চর্চা করে আরো বললাম, শুনেছি ভারত ভালো অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে না। ভারত না দিলে আমরা অস্ত্র পাবো কোত্থেকে?

আমাকে আর অগ্রসর হতে দিলেন না প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন। আস্তে আস্তে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, নজরুল ঠিকই বলেছেন, ভারত অস্ত্র না দিলে আমরা অস্ত্র পাবো কোত্থেকে? এক্সজাকটলি রাইট। কিন্তু সাহাবুদ্দিন, সব কথা বলা যায় না। বলাটা উচিতও নয়। তবুও শুধু তোমাদের বোঝবার জন্যে বলছি। বাইরে বলার জন্যে নয় কিন্তু একথা মনে রেখো।

তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের হাতে এভাবে কখনো সাধারণত অস্ত্র তুলে দেয় না, দিতে পারেও না। কারণ, কোন্ দেশ কখন কোন্ দেশের শত্রুতে পরিণত হয় তার কোনো ঠিক নেই। তবে এক দেশ অন্য দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে থাকে। তাও অস্ত্র ক্রয়কারী দেশ কোনোদিন বিক্রেতা দেশের শত্রুতে পরিণত হবে না—এটা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র বিক্রিও করে না। অবশ্য আমাদের অবস্থা ভিন্ন। আমরা ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ। একদিন আমরা একদেশ ছিলাম। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জাতিসত্তার স্লোগান ও দাবি তুলে আমরা ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান বানিয়েছিলাম। ভারতের স্বার্থ আর পাকিস্তানের স্বার্থ এক নয়। দুটি রাষ্ট্রে ভাগাভাগির পর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কয়েকবার ছোট-বড় কয়েকটি যুদ্ধ হয়ে গেছে। সীমান্তবিরোধ বরাবরই ছিল। পাকিস্তানে আমরা বাঙালিরা এক জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সকল নীতি ও আদর্শের অংশীদার ছিলাম। পাকিস্তান ভারতকে সব সময় এক নম্বর দুশমন মনে করেছে। এর দায়দায়িত্ব বাঙালিদের ঘাড়েও বর্তায়। তদুপরি পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববঙ্গে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। লাখ লাখ হিন্দু নরনারী তাদের বাপ-দাদার প্রিয় ভিটেমাটি ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে এসে পুনর্বাসিত হয়েছে। এখন পাকিস্তানে নিগৃহীত হয়ে আমরাও ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। সবই তো ভারতের দয়া। এখনো অধিকৃত বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছে। রাষ্ট্র ও জাতিগত চিন্তায় আমরা কি এখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমুক্ত হতে পেরেছি? বাংলাদেশে আমরা মুসলমানরা মেজরিটি। ভারতকে এসব তো চিন্তা করতে হচ্ছে। অস্ত্র কার হাতে তুলে দেবে? অস্ত্র কাকে দেবে? যাকে আজ অস্ত্র দেবে কালই সে আবার ভারতের শত্রু হয়ে পড়বে কিনা, ভারতের দেয়া অস্ত্র আবার কোনোদিন

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে কিনা—এসব কি ভারত ভাবছে না মনে করো? কিংবা এসব বিষয় কি তাদের ভেবেচিন্তে দেখতে হবে না?

আর যদি অস্ত্র ক্রয়ের কথা বলো, তাহলে আমাদের এত অর্থ কোথায় যে নগদ অর্থে আমরা বহির্বিশ্ব কিংবা ভারত থেকে অস্ত্র ক্রয় করবো? আমরা বিশ্বে কোনো স্বীকৃত রাষ্ট্র নই। কাজেই আমাদের কাছে কে অস্ত্র বিক্রি করবে? কেউ আমাদের কাছে প্রকাশ্যে অস্ত্র বিক্রি করবে না। করলেও ক্রয় করার মতো অর্থ আমাদের নেই।

সাম্প্রদায়িক বিষ-বীজজাত পাকিস্তান নামক বিষবৃক্ষের শাখা ছিলাম আমরা। পাকিস্তানে গড়ে তোলা সশস্ত্র বাহিনীর মন-মানসিকতা সেই সাম্প্রদায়িক মূলমন্ত্রের নিরিখে গঠিত। দেশাত্মবোধের চেয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনাবোধের মূলমন্ত্রে এরা দীক্ষিত, উজ্জীবিত। বাঙালি সৈনিকদেরই একটি অংশ এখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সেই সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা খাতিয়ে না দেখে ভারত এত সহজে মিত্র ভেবে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে—এটা আমরা ভাবছি কেন? তাছাড়া তাদের কাছে অস্ত্র চাওয়ার মতো নৈতিক অধিকারও আমাদের কতটুকু, এসবও ভাবতে হবে। নিজেদের অক্ষমতাকে বিবেচনায় না এনে শুধু শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করে আমাদের কোনো লাভ হবে না।

মনে করো, আমরা অন্যদেশ থেকে অস্ত্র দান হিসেবে কিংবা ক্রয় করেই আনি—অস্ত্র আনবো কোন পথ দিয়ে? অস্ত্র এনে তুলবো কোথায়, রাখবো কই? আমরাই তো থাকি ভারতের মাটিতে। সেই অস্ত্র জাহাজে করে চট্টগ্রাম না হয় কলকাতা বন্দরে প্রথমে আনতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর আমাদের দখলে নেই। কলকাতা বন্দরে অস্ত্র আনার ব্যাপারে ভারত তার একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদেরকে অনুমতি দেবে কিনা, কিংবা ভারতের মাটিতে কোনো অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার অনুমতি ভারত আমাদেরকে দেবে কিনা আবেগমুক্ত মন নিয়ে এটা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। আর ভারত যদি আমাদেরকে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর অনুমতিই দেয় তাহলে ভারতের অস্ত্রই তো আমাদেরকে দিতে পারে। তাহলে তো আমাদেরকে আর অন্য দেশের কাছে অস্ত্রের জন্যে ধরণা দিতে হয় না।

ভারতের দিক থেকে আরো সমস্যা আছে। আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বিরাজমান। বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারে চলছে নকশালীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। ভারতের চীনপন্থী বামপন্থীরা নকশালীদের সক্রিয় সমর্থক। চীন নেপথ্যে থেকে এদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও মদদ দিচ্ছে। আমাদের যারা মুক্তিযোদ্ধা, তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছাত্র, শ্রমিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী। এদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এ পরিস্থিতিতে ভারত মারাত্মক অস্ত্র এদের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে কিনা, সেটাই আমরা চিন্তা করছি। তবু তারা আমাদের অনুরোধে কিছু কিছু অস্ত্র বেনামিতে আমাদেরকে দিয়ে সাহায্য করছে। আর বিশেষ করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সবার রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে আমরাও তো নিশ্চিত নই। চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছে। তারা পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিং দিচ্ছে। আমাদের দেশের চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কি আমাদের এই

স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করছে? কোনো কোনো সেক্টর থেকে খবর পেয়েছি মুক্তিযোদ্ধা সেজে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চীনপন্থী কোনো কোনো রাজনৈতিক কর্মী সরে পড়েছে এবং শ্রেণীশত্রু খতম করার নামে রাজাকার, আল-বদরদের মতো স্বাধীনতার পক্ষের লোক, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হত্যা করছে। এমনকি, মুক্তিযোদ্ধা সেজে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতরে গিয়ে লুটপাট ও ডাকাতি করছে। এসব তো মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ নয়! আমাদের লোকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়ার ব্যাপারে আমরাই যেখানে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ও নিরাপদ নই, সেখানে ভারত একটি বৈরী মন-মানসিকতার অধিকারী সাবেক পাকিস্তানী নাগরকিদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার মতো কোনো আত্মঘাতী কাজ করবে—বাস্তবতার নিরিখে এমন চিন্তা আমরা কেমন করে করতে পারি? এছাড়া কোনো দেশ থেকে সংগ্রহ করা অথবা ভারতের দেয়া অস্ত্রশস্ত্র আমাদের মাধ্যমে ভারতের নকশালপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতেও চলে যেতে পারে। আমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিতে গিয়ে ভারত যদি এসব বিষয় চিন্তা করে, তাহলে আমরা ভারতকে কেমন করে সংশয়মুক্ত করবো? তাই আমাদেরকে খুব বাস্তব প্রেক্ষিত চিন্তা করে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে খুব সতর্ক থেকে আস্তে-ধীরে অগ্রসর হতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না, যাতে শেষ পর্যন্ত আম এবং ছালা দুটোই হারাতে হয়।

আমাদের অনুরোধে ভারত তাদের এলাকার ভেতর আমাদেরকে ক্যাম্প করার অনুমতি দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে খাবার, ওষুধ, চিকিৎসা, তাঁবু, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, ট্রেনিং দল ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক মৌলিক সাহায্য করছে। রণাঙ্গনে অস্ত্রের অভাব এবং আরো কিছু বড় ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার জন্যে তাদেরকে অনুরোধ করেছি। তবে সব সাহায্য-সহযোগিতা নির্ভর করবে আমাদের আচার-আচরণ, অসাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করা প্রসঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সার্বিক কৌশল বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আরো অকপটভাবে বললেন, ভারতের মনে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী চিন্তা।

আমরা যেমনভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যুদ্ধ করছি, তেমনি ভারতের মূলখণ্ড থেকে বাংলাদেশ দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশ যদি কোনোদিন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চীনের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে—ভারত আজ বাংলাদেশ প্রশ্নে এটাও ভেবে দেখছে। তাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হলে আমাদেরকে হয়তো এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তবে যাক, তোমরা এসব কথা নিয়ে বাইরে যেন নাড়াচাড়া না করো। তোমরা নিশ্চিত থাকো, অন্যদের বলবে—ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। আমরা এখান থেকে স্বাধীন দেশের মাটিতে গিয়ে পা রাখবো। জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে পাকিস্তানের দখলমুক্ত করবো।

তিনি তাঁর এই দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে ফেলতেই আমি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর, হোয়াইট হাউসে মার্কিন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এবং তাঁর (তাজউদ্দীন) দিল্লী সফর ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ও হতাশাময় গুজব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। রাত তখন প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় বসে তা টের পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

তাজউদ্দীন সাহেব আমার কথার সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, আজ আর নয়।

॥ সতেরো ॥

নয়াদিল্লীতে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু কলকাতায় মুজিবনগরীদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে তাদের মাঝে ভয়ানক ক্ষোভ ও হতাশার ছায়া নেমে আসে। আমিও সে সময় চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হতাশার এই অন্ধকারের মধ্যে আমি যখন অস্থির সে সময় আমার জন্যে তৈরি হলো এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি। সেটা হলো, কলকাতার ইংরেজী দৈনিক *অমৃতবাজার* এবং *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের কোনো এক সেক্টরে শত্রুর দিকে মেসিনগানজাতীয় অস্ত্র তাক করে থাকা অবস্থায় দুই বাঙালি সৈনিকের একটি ছবি ছাপা হয়। এই দুই সৈনিকের মধ্যে একজন হলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং অন্যজন আওয়ামী লীগ নেতা নারায়ণগঞ্জের মোস্তফা সারোয়ার। দু'জনই পরিপূর্ণ সামরিক পোশাক পরিহিত। মাথায় সবুজ জাল মোড়ানো সবুজ পাতায় ঢাকা বুলেটপ্রুফ শিরস্ত্রাণ। রাইফেলের বাট বুকের নিচে ঠেকিয়ে শত্রু হননের ভঙ্গিতে এই দুই সৈনিক ছবি উঠিয়েছেন। ছবি দেখলে মনে হয় তাদের হাতের অস্ত্রগুলো বুঝি এখনই গর্জে উঠে শত্রুর বুক ঝাঁঝরা করে দেবে।

খুব চমৎকার ছবি। অনেকেরই লোভ হয় এমন ভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধের ছবি তুলতে। কিন্তু বাঁধ সেধে বসলেন বেরসিক জেনারেল ওসমানী। *অমৃতবাজার* ও *স্টেটসম্যান* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই দুই দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার ছবি দেখে জেনারেল ওসমানী ক্ষেপে গেলেন আমার উপর। তাঁর ধারণা এ ছবি আমি রিলিজ করেছি।

মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে শুনেছিলাম, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী তদানীন্তন ইপিআর বাহিনীতে ছিলেন এবং কুষ্টিয়া কিংবা চুয়াডাঙ্গা এলাকার ইপিআর ক্যাম্পে অধিকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি সৈনিক। '৭১-এর ২৫ মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর ঢাকা অভিযানের খবর পেয়ে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে '৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের অনুষ্ঠান আয়োজনে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও তাঁর বাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলে তাঁকে মুজিবনগরে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে স্টাফ অফিসার নিয়োগ করা হয়। অবশ্য তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল কোনো

সেক্টরে গিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূরণ হয়নি। তাঁকে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরেই রেখে দেয়া হয় এবং নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও মুক্তিযুদ্ধে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সদর দফতরেই কর্তব্যরত ছিলেন।

জেনারেল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলাম জেনারেল সাহেব রেগে আগুন। ইদানীং অজ্ঞাত কারণে তাঁর মেজাজ এমনিতেই খুব ভালো যাচ্ছিলো না। তার ওপর *অমৃতবাজার* ও *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় এই ছবি দেখে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। ক্রুদ্ধ জেনারেল ওসমানীর কোটরাগত দুই চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছিল।

আমাকে বসার জন্যে আদেশ জারি না করেই তিনি অত্যন্ত কর্কশকণ্ঠে বললে, নজরুল সাহেব, আপনাকে না আমি বলেছিলাম যে আমাকে না দেখিয়ে কোনো ছবি কোনো পত্র-পত্রপত্রিকায় দেবেন না। এ ছবি কেন দিলেন? বলুন কেমন করে এ ছবি গেছে। কে উঠিয়েছে এ ছবি?

আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই তিনি একতরফাভাবে প্রশ্নের বান ছুড়ে মারলেন। বারবার স্যার, স্যার পর্যন্ত বলে ব্যর্থ হয়েছি। আমি অপরাধীর বেশে দাঁড়িয়ে কেবল শুনে যাচ্ছি। ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিরক্তবোধ করছিলাম। সাহস থাকলে মুখের ওপর চীৎকার করে বলতাম, কে কোথায় কখন কাকে দিয়ে ছবি উঠিয়েছে তা আমি জানবো কেমন করে?

কাগজ দুটি আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এটা ভারী অন্যায়। আমাদের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ওরা ছাপলো কেন এ ছবি?

এতক্ষণে আমার বিরক্ত ধরে গিয়েছিলো জেনারেল সাহেবের ওপর। আমার মনে হয়েছিলো, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে চাকরি করে জেনারেল ওসমানীর বুঝি ধারণা হয়ে গিয়েছিলো গণতান্ত্রিক দেশ ভারতও তাঁর সামিরক ফরমান জারির দেশ। ভারতীয় সংবাদপত্র সামরিক ফরমানে চলে নাকি? না কোনো জেনারেলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করে চলে?

প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকলেও মনে মনে হাসলাম, জেনারেল ওসমানী কি ভুলে গেছেন যে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতাতিন্ত্রক দেশ ভারত সামরিক জান্তা শাসিত পাকিস্তান নয়। এখানে কোনো জেনারেল তো দূরের কথা, খোদ সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে পত্র-পত্রিকায় কোনো ছবি ছাপা হয় না।

জেনারেল সাহেবের রাগ আপনা আপনিই পড়ে এল। আমি এবার শান্তকণ্ঠে বললাম, স্যার, এ ছবি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এ ছবি আমাদের ক্যামেরাম্যান উঠায়নি। আমাদের এখান থেকে ছবি ইস্যু করলে তা স্যার আপনার অনুমতি নিয়েই করা হতো। ওই ছবি আমাদের ইস্যু করা নয়।

জেনারেল সাহেব গোঁফ নামালেন। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ও. কে। আপনি বিষয়টি ইনভেসটিগেট করুন। দেখুন কিভাবে ওই ছবি ওদের কাছে গেছে? কে উঠিয়েছে ওই ছবি? ওদের কাছেই বা গেল কেমন করে? আমাদের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ওরাই বা এ ছবি ছাপলো কেন, ওদেরকে তা জিজ্ঞাসা করবেন। বলবেন আমাদের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ভবিষ্যতে যেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো ছবি বা নিউজ না ছাপে।

মহামুশকিলে পড়লাম এ জেনারেল সাহেবকে নিয়ে। জেনারেলকে কেমন করে বোঝাব যে, গণতান্ত্রিক দেশ ভারত পাকিস্তানের মতো সামরিক জান্তার কোনো খাস তালুক নয়। রণাঙ্গনে গিয়ে ওরাও তো ছবি তুলে আনতে পারে, ওরাও ওদের সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারে। এটা আমরা কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করবো? এ কি সম্ভব? সামরিক শাসনের দেশ পাকিস্তানে সব কিছু সম্ভব হয় বলে কি সব দেশে তা সম্ভব?

জেনারেল ওসমানীর মতের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস আমার ছিল না। মনে মনে নিজেকে চালাক ভেবে বললাম, জ্বী স্যার, আমি খোঁজ নেবো কোথায় তারা এই ছবি পেয়েছে, কে তাদেরকে এ ছবি সরবরাহ করেছে? ভবিষ্যতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো ছবি ছাপার আগে যেন আমাদের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স নেয়, সে ব্যাপারে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করবো।

জেনারেল সাহেব খুব খুশি হলেন। ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, দেখুন পিআরও সাহেব, ছবিটি ভালো করে দেখুন। এটা কোনো প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি নয়। এটা একটা এরেঞ্জ করা ছবি। এটা আপনাদের রাজনীতিবিদদের কাজ।

হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে জেনারেল সাহেব বললেন, দিস ইজ এবসলিউটলি এ রং। হোয়াই সাচ এ টেনডেনসি অব ব্ল্যাকমেলিং? ইউ সুড ইনভেস্টিগেট ইট এন্ড রিপোর্ট টু মি। ডু ইউ নো ইট্স ফার রিচিং ইফেক্ট? ইট উইল ক্রিয়েট কনফিউশন এন্ড মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড রেইজ মরাল কোশ্চেন্স এমংগ মাই অফিসারস লায়িং ইন দ্য জাংগলস এন্ড কান্ট্রিসাইড। অল দিজ নুইসেন্স সুড বি স্টপড। ইউ গো এন্ড মেক এন ইনভস্টিগেশন ইন টু দি ম্যাটার। ইট মাস্ট এন্ড সুড নট গো আনইন্টারপটেডলি। ইয়েস ইউ প্রোসিড অন।

জেনারেল সাহেব যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এটি নিয়ে। তাঁকে এর আগে কোনোদিন এত বিচলিত হতে দেখিনি। এ ছবি ছাপার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছিলাম না। একটি ছবি ছাপা হয়েছে, তাতে এমন কি হয়েছে?

জেনারেল সাহেবের সামনে থেকে উঠে গিয়ে এডিসি ক্যাপ্টেন নূরের কাছে বসলাম। ক্যাপ্টেন নূরকে সব খুলে বললাম। নূর পরামর্শ দিলেন, যতটুকু সাধ্যের আওতায় পড়ে ততটুকু করতে। ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল রিখীর কাছেও সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন খোঁজ-খবর নিয়ে জেনারেল সাহেবকে সব জানাতে। তিনি আমাকে সামরিক দিকে থেকে এই ছবি ছাপার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন। এতে তোমাদের সেনা অফিসারদের মধ্যে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। কারণ যাদের ছবি ছাপা হয়েছে তারা আসলে কোনো সেক্টরে যুদ্ধরত নয়। একজন রাজনৈতিক নেতা সখের বশবর্তী হয়ে একজন সৈনিককে যিনি প্রকৃতপক্ষে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে নেই—তাঁকে নিয়ে একটি ছবি তুলেছেন। এটা পত্রিকায় যাওয়ার মতো নয়। এটা একটি স্মৃতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। এ ছবি পত্রিকায় তোমাদের সেক্টর কমাণ্ডারগণ দেখলে তাঁদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ তাঁরা ভাববেন যে, যারা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তাদের কোনো কর্মকাণ্ডের ছবি পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরা হচ্ছে না। আর যারা

আসলে কোনো যুদ্ধ করছে না, তাদের ছবি ছাপা হচ্ছে। তাঁরা বুঝবেন না যে এ ছবি মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স থেকে ইস্যু করা হয়নি। তাই তোমার জেনারেল এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। উনি এটা ঠিকই বুঝেছেন।

জেনারেল সাহেবের কাছে থেকে জেনে প্রথমেই আমি এই ছাপার তাৎপর্যের গভীরতা বোঝার অক্ষমতার জন্যে লজ্জিত হলাম। সত্যম ঘোষ নামক কলকাতার একজন বাঙালি সাংবাদিক বন্ধু আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকারও সুখরঞ্জনদা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। *অমৃতবাজার* ও *স্টেটসম্যান* পত্রিকার বার্তা বিভাগের কর্মকর্তাগণ জানালেন, তাঁরা মনে করেছিলেন এ ছবি বুঝি স্বাধীন বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্যে ভবিষ্যতে তাঁরা এ ধরনের ছবি ছাপার ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স নেবেন এই আশ্বাস আমাকে দিলেন। আমার এই সাফল্যে আনন্দে আটখানা হয়ে আমি গিয়ে জেনারেল সাহেবকে রিপোর্ট করলাম। তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

॥ আঠারো ॥

কসমোপলিটান সিটি কলকাতায় আমি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দু না জানা এক অদ্ভুত ব্যক্তি। ঢাকায় থাকাকালে ভাবতাম পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা নগরী বুঝি বাঙালিতে ভরা। কিন্তু ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে পথে-ঘাটে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় বাঙালি বা বাংলাভাষী খুঁজে পেলাম না বিশাল কলকাতা মহানগরীতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বৌবাজার, বইপত্রের দোকান ব্যতীত আর কোথাও বাংলাভাষী খুঁজে পাওয়া কঠিন। কলকাতা শহরে বাঙালি পাওয়া যায় গড়িয়াহাটাতে। এখানে সব এপার বাংলা থেকে যারা বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে গেছেন তাঁরা গড়িয়াহাটা এলাকায় গিয়ে হকার্স মার্কেট বানিয়ে কাপড়ের জমজমাট পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কলকাতায় গড়িয়াহাটায় গেলে এপার বাংলা আর ওপার বাংলার বাঙালিদের দেখা পাওয়া যেত। এছাড়া কলকাতার মাঝারি মানের হোটেল-রেস্তোরাঁ, কাপড়ের বড় বড় দোকান এমনকি ফুটপাতের কাপড়ের দোকানী, ট্যাক্সীচালক সবই দাড়িওয়ালা পাগড়িধারী শিখ। বাঙালি মুদি দোকানীও চোখে পড়েনি। কলকাতার অলিগলিতে মানুষেটানা রিকশাওয়ালার মুখেও হিন্দী জবান। কলকাতার কোনো এক এলাকায় মুসলমানদের কিছু হোটেল-রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে উর্দু জবান। এমনকি বৌবাজারের বইপত্রের দোকান এলাকায় রেস্তোরাঁ আড্ডাগুলোতে আলোচনার ভাষা হিন্দী। কলকাতার সিনেমা হলের ছবির এডভারটাইজিং বোর্ডের ভাষা হিন্দী, ছবি হিন্দী। মনে হয়েছে কলকাতা মহানগরীতে বাঙালিদের কোন অস্তিত্ব নেই। হিন্দী ও ইংরেজী-উর্দু ভাষার দোর্দণ্ড প্রতাপের আবহাওয়ায় বাঙালির পক্ষে মুক্তভাবে শ্বাস নেয়াও অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রবীণ বাঙালি সাংবাদিক কলকাতায় বাঙালিদের এই কোণঠাসা অবস্থার কথা বর্ণনা করে বললেন, সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক তরঙ্গাঘাতে বাঙালি সংস্কৃতি ডুবতে বসেছে। হিন্দীওয়ালাদের দাপটে আমরা পশ্চিবঙ্গের বাঙালিরা নিজ ঘরে আজ পরবাসী।

তোমাদের নমস্কার জানাই। তোমরা বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইতিহাস রক্ষার জন্যে রক্ত দিয়েছ '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে। এখন রক্ত দিচ্ছো বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। বিশ্বের মানচিত্রের খানিকটা জুড়ে এখন বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র স্থান পাবে—এটা দেখে নয়ন আমাদের সার্থক হবে। প্রাণ আমাদের আনন্দে ভরে যাবে। গর্বে বুক আমাদের ফুলে উঠবে।

বলতে বলতে বয়োবৃদ্ধ বাঙালি সাংবাদিক কেঁদে ফেললেন। দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলছে। বৃদ্ধ এই সাংবাদিক আবেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যথার্থ অর্থে তোমরাই বাংলা মায়ের সুসন্তান। তোমাদের মাধ্যমে বঙ্গজননী নবজন্ম লাভ করছেন।

আর বলতে পারছিলেন না। কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বুকে তাঁর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো বেদনার ঝড়। খদ্দরের পাঞ্জাবীর কোণ টেনে চোখ মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আমরা রবীন্দ্রনাথ-মধু কবির জন্যে গর্ব করি। কিন্তু যে ভাষায় রবি ঠাকুর কাব্যরচনা করে বাঙালির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, আমরা বাঙালি হয়েও সেই বাংলা ভাষা ব্যক্ত করতে পারছি না। হিন্দীর বন্যায় রবি ঠাকুরের গর্বের ধন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ তলিয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় কোনো সিনেমা হলে এখন আর বাংলা ছবি মুক্তি পাবে না। সব বোম্বাইয়া মার্কা হিন্দী দখল করে নিয়েছে।

কলকাতা গিয়ে শুনেছি, বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে কলকাতায় আশ্রয় প্রার্থী কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্দ ও সংস্কৃতিসেবকদের গলা জড়িয়ে ধরে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কান্নাকাটি দিল্লীর একটি মহল প্রথম দিকে সুনজের দেখেনি। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন সারা পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের লোকজন সমবেত হয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন এবং বাঙালিকে রক্ষার জন্যে ঢাকার বাঙালিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অস্ত্র ধরার দুর্জয় শপথ ঘোষণা করলেন, সেদিন নাকি দিল্লী সরকারের টনক নড়েছিল। বাংলা ভাষাভাষী পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত মোড় নিতে পারে এ আশংকায় দিল্লী সরকার মুজিবনগরী বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং কলকাতায় অবস্থানরত মুজিবনগর নেতৃবৃন্দের কাছে দিল্লী প্রশাসন ধরা দিতে বাধ্য হয়।

কলকাতার বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পাশে স্থান দিত। তারা মনে করতো দেশবন্ধু সি আর দাস ও নেতাজী সুভাষ বসুর পর বাঙালির জন্যে আরেকজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ছবিকে পূজা দিত কলকাতা শহরে।

একাত্তরে কলকাতার দুর্গা পূজার দুর্গা প্রতিমার রূপ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। পাড়া মহল্লা অলিগলিতে যে দুর্গা পূজার কাঠামো গড়া হয়েছিলো তাতে দুর্গার আসনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা আর কার্তিকের আসনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসুরের স্থানে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের মূর্তি তৈরি করা

হয়েছিল। কলকাতার হিন্দু বাঙালিরা সেদিন এভাবেই তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উদ্‌যাপন করেছিল।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতা মহানগরীতে দুর্গা পূজা মুজিব-ইন্দিরা বন্দনায় পরিণত হয়। দুর্গা বেদীগুলো মুজিব-ইন্দিরাবেদীতে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তান অসুর হত্যাযজ্ঞে পরিণত হয় সমগ্র দুর্গা উৎসব। কলকাতার সব শারদীয় পূজামণ্ডপে দুর্গা বন্দনার ভক্তিমূলক গানের পরিবর্তে মাইকে বেজে ওঠে জয় বাংলার মন্ত্র উচ্চারিত অগ্নিঝরা গান, জয় বাংলা, বাংলার জয়, হবে হবে নিশ্চয়, কোটি প্রাণ একসাথে মিলেছে অন্ধ রাতে নতুন সূর্য ওঠার এইত সময়; মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি; শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠ সুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, আকাশে-বাতাসে ওঠে রনি; বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। বিশ্ব কবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেইকো শেষ; ছোটদের বড়দের সকলের আমারই দেশ সব মানুষের—বাংলাদেশ বন্দনার এসব গানে সারা কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে। শারদীয় সানাইর সুরে ধর্মানুরাগে উদ্দীপ্ত সারা কলকাতার বাঙালি নরনারী ভেঙ্গে পড়ে মুজিব-ইন্দিরা বন্দনার পূজা মণ্ডপে। নরনারী লুটিয়ে পড়ে ইন্দিরারূপী অসুরনাশিনী শ্রীদুর্গা আর কার্তিকরূপী শেখ মুজিবের পদতলে। অসুররূপী পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার বক্ষভেদী দশাননীর ত্রিশূল। শত্রু হননের দানব দমনের এক অপূর্ব দৃশ্য। কলকাতার পথে পথে বয়ে চলছে আবেগ উচ্ছ্বাসের এক অভূতপূর্ব প্রাণবন্যা। ধর্মীয় অনুভূতিকে ছাপিয়ে ওঠে জাতীয়তাবোধের দুর্বার চেতনা।

আমাদের ধর্মান্ধ সমাজে ধর্মীয় চেতনাবোধ জাতীয়তাবোধ উন্মেষের পথে কাঁটা না হয়ে বরং পুষ্পিত করে দেয় জাতীয়তাবোধ উন্মেষের চেতনাকে। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের বিশ্বস্ত বাহক হয়ে মহিমান্বিত হয় ধর্মীয় চেতনাবোধ। ধর্মের নামে হিংস্রতা, হানাহানির এই হতভাগ্য দেশে বাঙালির ধর্মীয় চেতনাবোধের ইতিহাসে এক অকল্পনীয় ব্যাপার, এক বিরল দৃষ্টান্ত। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির রক্তস্নাত দুর্গা উৎসব কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের জন্যে যেন আবির্ভূত হয়েছিলো এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে, যেন এক নতুন বাণী নিয়ে। বাঙালির সহস্র বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের রক্তঝরা ইতিহাসের এই অনিবার্য মুহূর্তে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র ধর্মীয় চেতনাবোধকে জাতীয়তাবোধের মন্ত্রে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়ার এই পরিস্থিতি সৃষ্টির নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কলকাতায় আমরা স্বাধীন বাংলার বাঙালিরা অভিভূত হয়েছিলাম। আমরা সেদিন ধন্য হয়েছিলাম। আমরা বাঙালির জাতিসত্তা রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে রক্ত দিচ্ছি, জীবন দিচ্ছি, বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাস রচনা করছি রক্তের আখরে। বিলুপ্তির হাত থেকে আমরা বাঙালির জাতিসত্তাকে রক্ষা করেছি। আমাদের জাতিসত্তাকে আমরা অন্য কোনো বৃহৎ জাতিসত্তায় বিলিয়ে দিইনি। বাঙালি জাতিসত্তার আমরা নির্মাতা এবং ধারক। বাঙালিসত্তাকে চাপা দিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতার বিশাল ও সুউচ্চ ভবনের গর্বকে ম্লান করে দিয়ে আমাদের এই অহংকার ও গর্ব ছিল হিমালয়ের মতো সুদৃঢ় ও অনমনীয়। আমাদের এই গর্ব ও অহংকার প্রভাতসূর্যের মতো চির দেদীপ্যমান থাকবে।

কলকাতায় যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি কিংবা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্যাপারে, তাদের চোখেমুখে দেখেছিলাম এক হতাশার ছাপ। বাঙালি ছেলেরা যুদ্ধ করতে পারে এটা যেন ছিল তাদের ধারণার বাইরে। বিশালদেহী পাকিস্তানী সৈন্যের মোকাবিলায় সাইজে ছোট তদুপরি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ বাঙালি যুবকরা টিকতে পারবে কিনা, কলকাতার অনেক বাঙালি সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। সেদিন তাঁদের এ ধরনের আত্মবিশ্বাসহীন প্রশ্নে হতাশ হইনি, তবে ব্যথিত ও লজ্জিত হয়েছিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানে-গরিমায় অহংকারী এসব লোক বাঙালির শৌর্য-বীর্যকে আবিষ্কার করতে পারেনি। চিন্তা-চেতনায় আনেনি। ব্যথিত ও লজ্জিত হয়েছিলাম আমাদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে তাদের চিন্তা-চেতনার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার জন্যে। বারবার আমার অপরিপক্ব মনে প্রশ্ন উঠেছে সর্বভারতীয় আগ্রাসী চিন্তা চেতনা কি বাঙালির সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্য সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকারটুকুকেও পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে? তাই বুঝি তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে।

॥ উনিশ ॥

আমাদের স্বাধীনতার এক অসহায় স্বাপ্নিক কলকাতার কোনো এক প্রবীণ সাংবাদিক প্রতিদিন আমার জন্যে তাঁর অফিসে বসে থাকতেন কখন ওয়ার বুলেটিন নিয়ে যাব। আমার কাছ থেকে যুদ্ধের অগ্রগতির খবর শোনার জন্যে। আমাকে গভীর স্নেহ করতেন ওই বয়েসী বাঙালি সাংবাদিক দাদা। নিখাদ স্নেহ। নিখাদ ভরসা। যেন আমার কথাগুলোই ছিল তাঁর কাছে স্বাধীনতার বাণী। আমার কথা শুনে যুদ্ধের অগ্রগতি এবং আমাদের হিমালয় সদৃশ মনোবলের কথা শুনে বৃদ্ধ সাংবাদিক দাদাদের চোখে আনন্দাশ্রু টলটলিয়ে উঠত। বলতেন, মনে অনেক শক্তি পেয়েছি নজরুল, আমি এখন পায়ে হেঁটে বাসায় যাওয়ার বল পাচ্ছি বুকে। দেখো তুমি যেন কোনদিন না এসো? তা হলে আমি শক্তি পাবো না। বাঙালির ছেলে যুদ্ধ করছে বৃটিশের তৈরি পেশাদার সীমান্ত সৈনিকদের সঙ্গে, শুধু এই গর্ববোধটুকুই আমার আজ চলার শক্তি। প্রতিদিন এই শক্তিটুকু সম্বল করে নিয়ে বাসায় যাই। বাংলার তরুণ যুবকদের অমিত তেজবিক্রম ও অপ্রতিরোধ্য শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে হতাশ স্বাধীনতাপাগল বৃদ্ধ সাংবাদিক দাদার হতাশা নিরসন করার জন্যে বলেছিলাম তীতুমীর, ক্ষুধিরাম ও সূর্যসেন প্রমুখ অগ্নিসন্তানদের নাম। দাদা কোনো পাত্তা দিলেন না। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, ওসব ক্ষণিকের বুদবুদ মাত্র। জীবনসায়াহ্নে শুধু এই কটি নাম নিয়ে মরতে চাই না। স্বাধীন বাংলাদেশের নাম মুখে নিয়ে মরতে চাই।

দাদার আন্তরিকতা সম্পর্কে আমি সন্দেহমুক্ত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনের কোণে সদা জাগ্রত থাকতো একটি চিন্তা—আমার কাছ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর শোনার জন্যে এই বিশাল কলকাতা শহরের এককোণে একজন বৃদ্ধ লোক অপেক্ষা করছেন। কোনো ভালো খবর থাকলে কখন দাদাকে পৌঁছাবো এজন্যে অস্থির হয়ে পড়তাম। ওয়ার বুলেটিন নিয়ে যাওয়ার সময় হওয়ার আগেই দাদা তাঁর অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতেন। অবশ্য তাঁর অফিসে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন অন্য একজন সাংবাদিক। দাদা আকাশবাণীর জন্যেও নিয়মিত লিখতেন।

দাদার মতোই অন্য একজন বাংলার স্বাধীনপাগল ছিলেন। তিনি ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন এক সিকিউরিটি অফিসার। তার সতর্ক চোখ এড়িয়ে কেউ কোনো প্রেস রিলিজ নিয়ে *আনন্দবাজার* পত্রিকার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে উপরে বার্তা বিভাগে যেতে পারতো না। আমার জন্যে ছিল অবারিত দ্বার এবং তার একমুখ হাসি। অফিসের সামনে হাজির হতেই নিজে বের হয়ে রাস্তায় এসে আমাকে নিয়ে উপরে যাওয়ার লিফটে উঠিয়ে দিতেন। তিনি থাকলে আমাকে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হতো না। কলকাতায় থাকাকালে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে আনন্দবাজার ও সাপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা উপহার দিতেন। তিনি এক সময় ভারতের কোনো এক নিরাপত্তা বাহিনীতে একটি ছোটখাট চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার্ড হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার সিকিউরিটি অফিসার। মুখে মোটা গোঁফ এবং বড় বড় চোখ। দেখলে মনে হবে অবাঙালি, কিন্তু আসলে তিনি বাঙালি।

এরই মধ্যে একদিন আমাদের জন্যে তো বটেই, আমার ওই বৃদ্ধ দাদার জন্যে এক বড় রকমের আনন্দের খবর ঘটে গেল।

দখলদার বাহিনীর ব্যবহৃত তদানীন্তন ইপিআর বাহিনীর কয়েকটি লরি আমাদের মিত্রবাহিনী দখল করে নেন কোনো এক সীমান্ত লড়াইয়ের সময়। সাবেক যশোর কিংবা কুষ্টিয়া জেলা সীমান্তে সংঘটিত এ লড়াইয়ে দখলদার বাহিনীর বেশ কয়েকজন সৈনিক হতাহত হয়। কয়েকজন ধরা পড়ে মিত্রবাহিনীর হাতে এবং বাকিরা লরি ও যুদ্ধের রসদ ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আমাদের যৌথ বাহিনী পলাতক পাকিস্তানী হানাদারদের ফেলে যাওয়া এসব সামরিক লরি ও সমরাস্ত্র কলকাতার ইস্টার্ন কমান্ডে নিয়ে আসেন।

কর্নেল রিখী আমাকে বললেন, খুব ফলাও করে খবরটি প্রচার করো। বললেন, লিখে দাও মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় বাংলার বিচ্ছুরা যশোর সীমান্তে পাকিস্তানী বাহিনীর একদল সৈনিককে সম্মুখযুদ্ধে হটিয়ে দিয়ে তাদের সামরিক যান ও কিছু গোলা-বারুদ ছিনিয়ে এনেছে। বাংলার দুর্ধর্ষ সিংহশাবকদের কাছে সম্মুখ সমরে টিকতে না পেরে কাপুরুষ পাকিস্তানীরা তাদের সামরিক যান, অস্ত্রশস্ত্র, তাদের দলের নিহতদের লাশ এবং মারাত্মক আহত সঙ্গীদেরকে রণক্ষেত্রে ফেলে রেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে। নিহতদের লাশ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে। মারাত্মকভাবে আহতরা রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে কাতরাচ্ছে।

এদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা কয়েকটি সামরিক যানবাহন ও এন্টিএয়ারক্রাফট গানসহ কিছু অস্ত্রশস্ত্র জনসাধারণের দেখার জন্যে কলকাতার গড়ের মাঠের এককোণে রেখে দেয়া হয়েছে।

রিখী বললেন, আর একটি লরিতে করে তুমি সংবাদপত্রের অফিসে ওয়ার বুলেটিন বিতরণ করবে আর সাংবাদিকদের দেখাবে।

আমি এক অনিরুদ্ধ উত্তেজনায় ছটফট করছিলাম। কখন সেই দাদাকে নিয়ে দেখাবো তাঁর কথিত দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী সৈনিকদের কাছ থেকে বাংলার অসম সাহসী বীর সেনাদের ছিনিয়ে আনা সেই সামরিক যানটি।

সেদিন দুপুরের পরই ওয়ার বুলেটিন আর লরিটি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমাদের সেনাবাহিনীর একজন চৌকস ড্রাইভার লরিটি চালাচ্ছিল। ড্রাইভারের পাশেই সামনের সীটে আমি বসা। প্রথমেই গেলাম ওই দাদার অফিসে সবাইকে অবাক করে দেয়ার জন্যে। দাদা প্রতিদিনের মতোই সেদিনও তাঁর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের সামরিক লরি মন্থর গতিতে কলকাতার অলিগলি ঘুরে দাদার অফিসের দিকে এগিয়ে চললো।

দূর থেকে আমি দাদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি ম্লান হয়ে যাওয়া জলপাই রংয়ের মন্থর গাড়িটি তাঁর অফিসে এগিয়ে যেতে দেখছিলেন। তিনি একদৃষ্টে গাড়িটির দিকে তাকিয়েছিলেন সন্দিগ্ধ মনে। উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে আমাকে চিনতে পারছিলেন না। তাঁর অফিসের সামনে গিয়ে সামরিক গাড়িটি থামলে দাদা চমকে উঠলেন। সামনের দরজা খুলে আমি লাফ দিয়ে নামতেই দাদা একটা প্রকাণ্ড হাসি দিলেন। আমি তাঁর হাতে চট করে ওয়ার বুলেটিন গুঁজে দিয়ে বললাম, আগে এটা পড়ে নিন।

॥ বিশ ॥

দাদা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে বাঙালির সন্তান পাঞ্জাবীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তাদের সামরিক যান পর্যন্ত ছিনিয়ে আনতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি ওয়ার বুলেটিনের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। ঠোঁটে তাঁর হাসির রেখা ফুটে উঠছিল। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি বলছো, এসব সত্যি?

বললাম, সত্য না তো মিথ্যা নাকি! চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, কি বললে, সত্যি বাঙালির ছেলে পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়ি ছিনিয়ে এনেছে?

আমার কিছুটা রাগ ধরে গিয়েছিল। সত্যি না তো আপনার সামনের গাড়িটি কি মিথ্যে? এটা কি আপনাদের ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি নাকি? চেয়ে দেখুন না ভালো করে। এটা পাকিস্তানী সেনাদের গাড়ি, আমাদের সিংহশাবকরা পাকিস্তানী দস্যুদের হটিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে এ গাড়ি।

তাঁর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। গাড়িটির দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে বললেন, বাংলার ছেলেরা পারলে পাকিস্তানের ওই বিরাট বিরাট দানবগুলোকে হারাতে? ওই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দানবগুলো এত সহজে হার মানলো? ওরা কি বুঝেছে, এ বাঙালি তুচ্ছ না, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। ওরা কি বুঝেছে যে বঙ্গসন্তান কাপুরুষ নয়? মায়ের অমর্যাদা বঙ্গসন্তান কখনো মেনে নেয় না? ওরা মৌচাকে ঢিল ছুড়েছে। ওরা তো পালাবার পথও পাবে না।

দাদা আবার বললেন, ওরা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি ছেড়েই পালিয়ে গেলে?

বললাম, কি আশ্চার্য। ওরা গাড়ি ফেলে গেছে তবে কি আমাদেরকে গিফট হিসেবে দিয়ে গেছে নাকি? গাড়ি ফেলেই বা পালিয়ে যেতে পারলো কই? আমাদের বিচ্ছুরা ওদের জান কবজ করেছে। ওদের লাশ বাংলার ঝাড়-জঙ্গলায় পড়ে রয়েছে। বনের শৃগাল, কুকুর কাক, চিল আর শকুনের খোরাক হয়েছে।

দাদা অবাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বললে তুমি? এটা পাকিস্তানী সেনানায়কদের গাড়ি?

তিনি গাড়ির কাছে এসে গাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছিলেন। তারপর অফিস রুমে ঢুকে ওয়ার বুলেটিনটি তাঁর এক সহকর্মীর হাতে দিয়ে আনন্দ উৎসারিত বড় গলায় বললেন, তোমরা সবাই বাইরে এসো, দেখো এসে বাংলার সাহসী ছেলেরা পাকিস্তানী জেনারেলদের কাছ থেকে যুদ্ধের গাড়ি ছিনিয়ে এনেছে। ওই দেখো, পাকিস্তানের সৈনিকদের গাড়ি এখন আমাদের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটাতে এখন আর অস্ত্র নেই। তোমরা বাইরে এসে এক নজর দেখে যাও বাঙালি ছেলেদের কী সাহস। পাকিস্তানী সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা আরো কয়েকটি গাড়ি নাকি আমাদের গড়ের মাঠে রাখা হয়েছে লোকজনদের দেখানোর জন্যে।

তাঁর কথা ও হাঁকডাক শুনে তাঁর কৌতূহলী সহকর্মীরা বাইরে এসে গাড়িতে হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছিল। সাংবাদিক দাদা গর্বিত কণ্ঠে জোরে জোরে বললেন, দেখলে তো, এই গাড়িটিতে আরামে বসে বসে পাকিস্তানী সৈন্যরা মেশিনগান দিয়ে গুলি করে আমাদের বাঙালি ভাইদেরকে হত্যা করেছে। যেন ওরা পাখি মেরেছে। এবার বেটারা যাবে কোথায়? বাংলার ছেলেরা এবার ওদেরকে একটা একটা করে গুলি করে মারবে। আমি বলছি, বাঙালি এবার জেগেছে। বাঙালি যুবকরা এবার এদেরকে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে দেবে না। এদেরকে এবার প্রাণ দিতে হবে। এবার ওদের রক্ষা নেই। কারা যেন বলেছে বাঙালি যোদ্ধার জাত নয়। ওদেরকে ধরে এনে এখন আগুনের এক একটা ফুলকিদের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও দেখি, ওরা এসে দাঁড়াক দেখি রাইফেলধারী বাঙালি তরুণের সামনে? বাঙালিরা কি শুধু কবিতা-কাব্যই রচনা করতে পারে? ওই হাত দিয়ে শুধু কলমই ধরতে জানে না, শুধু ফুলই ফোটাতে জানে না—দেশাত্মবোধের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাইফেল-মেশিনগানও ধরতে জানে, আগুনের ফুলকিও ঝরাতে পারে। এই বাংলার মাটি বর্ষায় বৃষ্টির পানিতে যেমন নরম হয় তেমনি চৈত্রে আবার হিমালয়ের পাষণ্ড পাথরের মতো শক্তও হয়।

দাদার মুখ দিয়ে বাঙালি-কীর্তনের খৈ ফুটছিল। এই উচ্ছ্বাসের ঝরনায় অবগাহন করে পুলক অনুভব করার জন্যে আমার আর এখানে দেরি করা চলে না। কলকাতার খবরের কাগজ ও সংবাদ সংস্থার অফিসে আমাকে ঘুরতে হবে। দাদাকে ছোট একটা নমস্কারের ভঙ্গিতে সালাম জানিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাতে বললাম। দাদার আবেগ-উচ্ছ্বাসে ছেদ পড়লো। দাদা এমন সময় এটা প্রত্যাশা করেননি। পাকিস্তানী সেনাদের কাছ থেকে বঙ্গশার্দুলদের ছিনিয়ে আনা সামরিক লরির দিকে আরেকবার তাকিয়ে বললেন, তোমরাই পারবে বিশ্বকবির সোনার বাংলার স্বপ্ন সার্থক করতে।

তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে আমরা মিলিয়ে গেলাম কলকাতার রাস্তার জনারণ্যে।

কলকাতার গড়ের মাঠে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা সামরিক লরি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হলো। কলকাতার খবরের কাগজগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা হলো সামরিক লরি ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাওয়ার খবর। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দখল করা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ফেলে যাওয়া লরি ও অস্ত্রশস্ত্রের ছবি।

কলকাতার সকল পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত এ খবর দেখে কলকাতার মুজিবনগরীদের হতাশার কালো মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সূর্যের হাসি ফুটে উঠেছিল। যেখানে যার সাথে দেখা করমর্দন, বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি আর মুখে জয়বাংলা ধ্বনি। মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে কলকাতার এপার-ওপারের বাঙালিদের। মুজিবনগর সরকারের নীরব সদর দফতর আবার সরব হয়ে ওঠে। পাকিস্তানীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা সামরিক সরঞ্জাম দেখার জন্যে গড়ের মাঠে সারা কলকাতা শহর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। ঢল নেমেছিল আবালবৃদ্ধবনিতার। মুখে মুখে জয় বাংলার বাঙালিদের বীরত্বের অনেক মনগড়া রূপকথার কাহিনী। আমার কাজ বেড়ে গেছে। স্বাধীন বাংলা সরকারের নেতৃবৃন্দের দিল্লী থেকে বিরসবদনে ফিরে আসার পর থেকে আমাদের সদর দফতরে যে ঝিমানো হতাশাময় ভাব জেঁকে বসেছিল, তা কেটে গেছে। আমি নিজেও ঝিমিয়ে পড়েছিলাম চরম হতাশায়।

ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল রিখীর মুখে হাসির রেখা। আমাকে বললেন, চুটিয়ে ডিসপ্যাচ লিখো। লিখো পাকিস্তানীদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে অবস্থানরত সৈনিকদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সম্মুখ সমরে হেরে গিয়ে এবং সামরিক গাড়িসহ সরঞ্জাম হারিয়ে। বিপুলসংখ্যক হতাহতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে আর রি-ইনফোর্সমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। যারা অগ্রবর্তী ঘাঁটি এলাকায় বাংকারে ছিল তারা বাংকার ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পে গেলে আবার তাদেরকে এ অগ্রবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে, এ ভয়ে বাংকার ছেড়ে যাওয়া কোনো পাকিস্তানী সৈনিক তাদের মূল ক্যাম্পে হাজিরা দিচ্ছে না। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈনিক মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণকারী সৈনিকরা আমাদের কাছে বলেছে, ঘাঁটি থেকে তাদেরকে কোনো রসদ সাপ্লাই দিচ্ছে না। যে খাবার ও গোলা-বারুদ ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা জোরদার হওয়ায় পাকিস্তানী সেনাদের অগ্রবর্তী ও পেছনের মূলঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের সাপ্লাই লাইনে মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। ভীতবিহ্বল পাকিস্তানীরা এখন হতাশ হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানীদের অনেক সীমান্ত ঘাঁটি এখন মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর দখলে। ফ্রন্ট লাইন থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা পেছনে হটে যাচ্ছে। ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। অনাহার অনিদ্রা, বিশ্রামহীনতায় এরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাতিয়ার বহন করার ক্ষমতাটুকুও এদের দেহে নেই। অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই এরা পালাচ্ছে।

॥ একুশ ॥

মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্ভবত একাত্তরের জুলাই-আগস্ট মাসে মুসলমানদের ঈদ উৎসব ঈদুল-ফিতর হয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এটা একটি পরম আনন্দের দিন হলেও বিদেশ-বিভূঁইয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন পরিবেশে ঈদুল-ফিতর মুজিবনগরীদের জন্যে ছিল যেন বিষাদের দিন।

পবিত্র ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে সেদিন মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের সকল দফতর ছিল সেদিন বন্ধ।

সেদিন যুদ্ধবিরতিও ঘোষিত ছিল। কিন্তু কার্যত মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধবিরতি পালন করেনি। সেদিন রণাঙ্গনে রাইফেল-বন্দুক হাতে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঈদুল-ফিতরের আনন্দ-উৎসব রণাঙ্গনে একজন শত্রু হননের আনন্দের চেয়ে বড় ছিল না। ঈদুল-ফিতরের দিন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়দৃপ্ত শপথ ছিল মাতৃভূমিকে পাকিস্তানী বাহিনীমুক্ত করার।

মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরের ছোট মাঠে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ঈদুল-ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে মুজিবনগরে খুব ঘটা করে ঈদুল-ফিতর উদযাপনের ব্যাপক প্রচার করা হয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে মুসলিম দেশগুলোর কাছে ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানীদের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে।

ইতিহাসের জঘন্যতম নাৎসী হিটলার, গোয়েবলসদের ঘৃণ্যতম উত্তরাধিকার পাকিস্তানী সামরিক জান্তার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত মুসলিম দেশগুলোর বিভ্রান্তি ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল ধারণা মোচন করে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া যে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, কোনো মুসলিম দেশের বিরদ্ধে বিধর্মীদের যুদ্ধ নয়। এটা স্বাধীনতাকামী একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই। বরং যারা একটি জাতির উপর তাদের শাসন-শোষণ-নিপীড়ন অব্যাহত রাখার হাতিয়ার হিসেবে পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করছে, প্রকৃত পক্ষে তারা হচ্ছে ধর্ম বা ইসলাম বিরোধী। আল্লাহর পবিত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও লুটপাট করছে, আগুন দিয়ে জনপদ পুড়িয়ে দিচ্ছে, পবিত্র ধর্মের উপর কালিমা লেপন করেছে—তারা আসলে ধর্মের ছদ্মাবরণে ঢাকা ঘৃণ্য ফ্যাসিস্ট শক্তি। ধর্মের দুশমন, মানবতার দুশমন এই ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধেই আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ। এটাকেই প্রকৃত অর্থে সত্যিকারের জেহাদ বলা যেতে পারে। এজন্যে আগে থেকেই স্বাধীন বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের দখলকৃত মুক্ত এলাকায় ঘটা করে ঈদুল-ফিতর উদযাপনের ব্যাপক আয়োজনের খবর ফলাওভাবে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, সরকারিভাবে আয়োজিত ঈদুল-ফিতরের এই জামায়াতে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী ছাড়া ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কিংবা কলকাতায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় অন্য কোন নেতা যোগদান করেননি। ঈদুল-ফিতরের জামাত পরিচালনা করেছিলেন মওলানা দেলোয়ার হোসেন। বাংলাদেশের ভোলা নিবাসী এই মওলানা আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কোরান পাঠ এবং কোরানের তাফসির ব্যাখ্যা করতেন।

ঈদুল-ফিতরের এই জামাতের আগে মওলানা দেলোয়ার হোসেন প্রথমে আমাকে ধরে বসেন যেন ঈদের জামাতের ছবি তোলার সময় তাঁর (মওলানা দেলোয়ারের) ছবি তোলা না হয়। ঈদের জামাতের ছবি তোলার সময় উক্ত মওলানার ছবি কেমন করে

বাদ দেয়া যায়? মওলানাকে বোঝালাম। মওলানার মুখ এতে মলিন হয়ে গেল। এরপর তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যেন তাঁর ছবিটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে না দিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে দিই। যাতে কোনক্রমেই তাঁর এই ছবি পত্র-পত্রিকায় ছাপানো না হয়। কারণ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এই ছবি দেখলে দখলকৃত বাংলাদেশে ভোলায় তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে এবং তাঁর বউ-ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচার করবে।

মওলানা সাহেবের কথা সঠিক ছিল। কিন্তু তাঁর ছবি বাদ দেয়া যায়নি এবং কলকাতার সকল পত্রিকায় মুজিবনগর সরকারের ঈদের জামাতের ছবি ছাপা হয়েছিল। তবে এ ছবি ছাপা হওয়ার পর মওলানা সাহেবের বাড়িঘর হানাদার বাহিনী কর্তৃক পুড়িয়ে দেয়া কিংবা তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধ মা-বাবার উপর নির্যাতন চালানোর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ঈদুল-ফিতরের নামাজ আদায়ের পর যথারীতি ঈদের কোলাকুলি হলো। ঈদ মোবারক বিনিময় হলো। সব আনুষ্ঠানিকতাই হলো। কিন্তু ঈদুল-ফিতর উপলক্ষে সেমাই, পোলাও, গোশত খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ জন্যে আমরা সবাই মনমরা হয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে আমার জীবনে কোনোদিন এমন নিরানন্দের ঈদ হয়নি। তবে সকালের দিকে আমাদের ব্যারাকে সাধারণ মানের সেমাই রান্না করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলী, ঢাকার শাহাবুদ্দীন এবং আমি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে হাজির হলাম ঈদের দিনের ভালো খাবারের প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু হায়! প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে ঈদের কোনো আমেজই পাইনি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিজেই ঈদের কোনো খাবার পাননি। প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব খুবই শীতল। ঈদের দিনে আমাদেরকে আপ্যায়ন করার কোনো উদ্যোগ ছিল না এবং অপারগতার জন্যে তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনার ভাবও ছিল না। আমি নিজে ব্যথিত হয়েছিলাম, খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলীও খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। শুধু ঈদের কোলাকুলিতে পেট ভরবে না। ঈদের এই আনন্দের দিনেও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের দফতরের পাষাণ নীরবতা ভঙ্গ করার সাহস আমার ছিল না। হিমালয়ের মতো স্তব্ধতা নিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ বসেছিলেন।

তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে রহমত আলী আমাকে বললেন, চলুন তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় যাই। বেগম জোহরা তাজউদ্দীন খুব ভালো রাঁধুনী। ওখানে নিশ্চয়ই ঈদের পর্যাপ্ত খাবার তৈরি করা হয়েছে।

সিআইটি রোডের ওই বাসায় তাজউদ্দীন সাহেবের বৌ-ছেলেমেয়ে ছাড়াও তাজউদ্দীন সাহেবের পাতানো মামা, বর্তমান গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানার জামালপুরের আফতাব উদ্দীন, রহমত আলীর শ্যালক থাকেন। রহমত আলী সাহেবের সঙ্গে দুপুরের পর তাজউদ্দীন সাহেবের সিআইটি রোডের বাসায় গেলাম। হায় পোড়াকপাল! ঈদের আনন্দ! কোনো আয়োজন ওই বাসায় একবার উঁকিও দেয়নি নীরব নিস্তব্ধতার পাষাণপুরীতে। রহমত আলী ও আমি একই সঙ্গে ভাবী বলে ডাক দিয়ে বেগম জোহরা তাজউদ্দীনের কাছ থেকে ঈদের এমন আনন্দের দিনে কোনো সাড়াটুকু পাইনি।

জ্বরে পুড়ে যাওয়া একমাত্র ছেলের শিয়রে বসা নির্বাক বেগম জোহরা তাজউদ্দীনের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বাসায় চুলায় হাঁড়ি পর্যন্ত চড়েনি। পাশের ঘরে তাজউদ্দীন সাহেবের বিত্তবান অথচ কঞ্জুস মামা, তিনি আমাদেরও সকলের কমন মামা আফতাবউদ্দীন, রহমত আলীর শ্যালক রতন, সবার মুখ কালো। কারো পেটে খাবার পড়েনি। সবাই উপোস। শুনলাম, ঈদের দিনও তাজউদ্দীন সাহেব একবারের জন্যেও বাসায় আসেননি। ঈদের দিন বাসায় খাবারের কি আয়োজন আছে কিংবা নেই, কি রান্না হবে ছেলেমেয়েরা খেয়েছে কিনা, স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিমশীতল তাজউদ্দীন আহমদ এসব চিন্তাভাবনার সঙ্গে একটিবারও নিজেকে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তাটুকু পর্যন্ত অনুভব করেননি। তাঁর অফিস থেকে বাসায় একটিবার টেলিফোন করে খোঁজ নেয়ারও প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অনুভব করেননি। এটা কি তবে তাজউদ্দীন সাহেবের অভিমান? এ প্রশ্ন কাকে করবো?

সিআইটি রোডের একই বহুতল ভবনের অন্য ফ্লাটে সপরিবারে বসবাসরত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক ও অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসা থেকে ঈদের দিনের কিছু মিষ্টিজাত খাবার তাজউদ্দীন সাহেবের বাসায় পাঠানো হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা এবং রতন ও আফতাব মামা সে সব খাবার ভাগ করে খেয়ে নীরব হয়ে শুয়ে রয়েছে। রহমত আলীর শ্যালক রতন জানায়, ভাবী পর্যন্ত কোনো দানাপানি মুখে দেননি। এরকম হলো কেন কিংবা এমন কি হয়েছে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মতো পরিবেশ পর্যন্ত ছিল না। কতক্ষণ-অপেক্ষা করার পর শেষে আমরা নীরবে চলে যাওয়ার সময় ভাবী কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমাদের দেখে বললেন, রহমত আলী, নজরুল, গতরাত থেকে ছেলেটির ভয়ানক জ্বর। সে কিছুই খাচ্ছে না। আপনাদের ভাই বাসার কোনো খোঁজ-খবরই নিচ্ছেন না। বাসায় কোনোদিনই আসেন না। আমরা কি খাই না খাই, কোনো কিছুরই খবর নিচ্ছেন না। আপনাদের ভাইকে বলবেন যেন বাসায় আসেন। তিনি না আসতে চাইলে আপনারা তাঁকে নিয়ে আসবেন।

ঈদের খাবারের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। শুনেছি, মাঝেমধ্যে আফতাব মামা বাজার-সওদা করে দিতেন। আফতাব মামা, রতন ওখানেই খেত। মাঝে মাঝে রহমত আলী সাহেবও বাজার-সওদা করে নিয়ে ওই বাসায় যেতেন। ভাবী নিজের হাতেই রান্না ও সব কাজকর্ম করতেন। কলকাতা শহর, তার উপর এপার বাংলার অপরিচিত কাজের লোক পাওয়া যাবে কোথায়? ভাবীর হাতের রান্না খাওয়ার লোভে আমিও মাঝে মাঝে রহমত আলী সাহেবের সঙ্গে সিআইটি রোডের বাসায় যেতাম। ভাবী কিন্তু মোটেই বিরক্তবোধ করেননি। বরং বলতেন, ওখানে কি খান, না খান। হয়তো কষ্ট করেন। ওখানে খাওয়ার অসুবিধা হলে এখানে এসে যা-ই থাকে খেয়ে যাবেন। কি করা। কেউ তো আর শখ করে আসিনি।

তাজউদ্দীন সাহেবের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্মী শ্রীপুরের রহমত আলী এবং আমি—আমরা দু'জনেই বড় মাছের শুঁটকি এবং চিংড়ি মাছের খুব ভক্ত। কলকাতার কাঁচাবাজারে এসব খুব পাওয়া যেত।

রহমত আলী সাহেব কলকাতায় খুব একটা বেশি থাকতেন না। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন গোপন মেসেজ নিয়ে ভারতের আগরতলা, ত্রিপুরাসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে নেতৃবৃন্দের কাছে যেতেন। কলকাতায় এসে দু-একদিন থাকলে আমাকে নিয়ে বাজার থেকে শুঁটকি মাছ, চিংড়ি মাছ, শাক-শবজি ইত্যাদি বাজার-সওদা করে ভাবীর কাছে গিয়ে হাজির হতেন। ভাবী অত্যন্ত খুশি হয়ে অতি যত্নসহকারে রান্না করে আমাদেরকে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে আফসোস করতেন তাজউদ্দীন সাহেবের জন্যে।

॥ বাইশ ॥

তাঁকে নিজ হাতে তিনি খাওয়াতে পারছেন না। ভাবীও তাজউদ্দীন সাহেবের কাছে যেতে পারেন। কিন্তু কেন যান না! তিনিও বাসা থেকে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে যে কোনো সময় টেলিফোনে কথা বলতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন না?

ঈদল-ফিতরের দিন ভারত কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দফতরের লোকজনদের জন্যে বিভিন্ন ফলমূল ও মিষ্টিসহ প্রচুর শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছিল। তাজউদ্দীন সাহেব কোনো কিছুই স্পর্শ করেননি। সবই অফিসের লোকজনদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। একদিকে বাসায় ভাবীর অবস্থা অন্যদিকে বাসা ও ভাবীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের এই নির্লিপ্ততায় আমি ও রহমত আলী ভীষণভাবে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কারো সঙ্গে এ সব নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি।

ঈদের দিন সারাদিন অভুক্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছাকাছি বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প পরিদর্শনে যাবেন। খুবই গোপনে তাঁর আয়োজন লক্ষ্য করলাম। কিন্তু কারো কোনো কিছু বোঝার উপায় ছিল না। আমি কিছুটা আভাস পেয়েছিলাম জেনারেল ওসমানীর এডিসি ও আর্মি সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার সাহেবের সূত্রে। তাঁরাও সব খুলে বলেননি। ক্যাপ্টেন নূর আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন ফটোগ্রাফার, ক্যামেরা, ফিল্ম এসব ঠিক আছে কিনা। রাতে এসব কাজে লাগতে পারে। পিএম রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে যেতে পারেন।

রহমত আলী সাহেব এ খবর জেনেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সূত্রে। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাজউদ্দীন আহমদ সারাদিনের মধ্যে, এমনকি সন্ধ্যার পরও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ও রাজনৈতিক সহকারী, প্রধানমন্ত্রীর অনেক গোপন রাজনৈতিক বার্তা বহনকারী রহমত আলী সাহেবের কাছেও একটিবার বলেননি যে ঈদের দিন রাতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে যাবেন। তাঁর সঙ্গে ফটোগ্রাফার যেতে হবে। এসব ঠিক করে রাখতে হবে, একথাটি আমাকে পর্যন্ত একটিবার বলেননি। ক্যাপ্টেন নূরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আমি নিজ উদ্যোগে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের ফটোগ্রাফার সুজিত রায়কে সব ঠিক রাখতে এবং এসব নিয়ে রাতে আমার দফতরে হাজির থাকতে বলে রেখেছিলাম। ফটোগ্রাফার মুক্তিযোদ্ধা সুজিত আরও কিছু ফিল্ম

রোল কিনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ঈদের দিন রাত প্রায় ১০টার পর প্রধানমন্ত্রীর সদর দফতরের লোকজন সব চলে যাওয়ার পর রহমত আলীকে জানানো হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রহমত আলী ও আমাকে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর একজন কর্মকর্তা গোপনে জানালেন আমরা যেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে গিয়ে ঘোরাফিরা না করে নিজ নিজ অফিসে অবস্থান করি। সময় হলে আমাদেরকে তিনি এসে ডেকে নিয়ে যাবেন।

দেশকে পাকিস্তানী বাহিনীমুক্ত করার জন্যে যুদ্ধরত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন পদস্থ বাঙালি অফিসার। তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সব সময়ই তটস্থ ও ব্যস্ত থাকতেন। স্বভাবগত স্বল্পভাষী এই সিকিউরিটি অফিসার রাত প্রায় বারোটায় এসে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামনে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দফতর কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িটিতে তখন গভীর নীরবতা। সবাই গভীর নিদ্রায় বিভোর। কেবল আমরা কয়েকজন প্রাণী সজাগ। আমরা তখন নির্বাক। আমাদের কথা বলার শব্দে রাতের এ স্তব্ধতা ভঙ্গ এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এ ভয়ে আমাদের মুখে নিজেরাই যেন তালাবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বাইরের রাস্তায় অপেক্ষারত ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একটি পুরো কনভয়। কনভয়ের সম্মুখভাগে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সিগন্যাল জীপ। ওয়ারলেস সেট সজ্জিত এই সিগন্যাল জীপ প্রধানমন্ত্রীর বহরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ফটোগ্রাফার সুজিতকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্যে নির্ধারিত একটি গাড়ির পেছনের একটি সামরিক জীপে গিয়ে উঠলাম। এর পরই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর প্রহরাবেষ্টিত হয়ে তাঁর জন্যে নির্ধারিত গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলী প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে মাঝে রেখে এক পাশে রহমত আলী এবং অন্য পাশে দেহরক্ষী সিকিউরিটি অফিসার। সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে আমি বসা। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে গাড়ি আস্তে আস্তে বের হয়ে রাস্তায় নামলো। জনমানবশূন্য নীরব-নিথর কলকাতা মহানগরীর রাজপথ। রাত বোধহয় তখন সাড়ে বারোটা।

রাত সাড়ে বারোটায় কলকাতা মহানগরী স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো নজীর নেই। এ মহানগরী সারা রাতই জাগ্রত ও ব্যস্ত থাকে। নিশীথের কলকাতা মহানগরীকে দেখার কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে পশ্চিবঙ্গের লেখকদের রচিত অনেক রম্যকাহিনীতে নিশীথের কলকাতা সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়েছি। কলকাতায় আসার পর কয়েকজন সাংবাদিক আমার কৌতূহল বৃদ্ধির মানসে নিশীথের কলকাতা মহানগরীর রহস্য সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়েছেন। শুনেছি রাত যত গভীর হয় প্রাচ্যের এই মহানগরী ততো বেশি রহস্যময় ও স্বপ্নের অমরাপুরীতে পরিণত হয়। রাতে আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই মহানগরী। বিত্তবানদের জন্যে জীবনের এক নতুন স্বাদ ও স্বপ্ন নিয়ে হাজির হয় কলকাতা মহানগরীর রাত।

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয় কলকাতার রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে বসা ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন অস্ত্রধারী অফিসার বললেন, রাত বারোটা ১ মিনিট থেকে কলকাতা শহরে কার্ফু চলছে। আমরা যে এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হবো সেসব এলাকায়ও কার্ফু জারি করা হয়েছে রাত বারোটা ১ মিনিট থেকে। তাই কলকাতার রাস্তাঘাট এত ফাঁকা ও কোলাহলবিহীন।

সিআইটি রোডে কনভয় এগিয়ে যাওয়ার সময় সেই বহুতল ভবনের সন্নিকটবর্তী হলে তাঁর পাশে নিরাপত্তা অফিসার প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, স্যার বাসায় নামবেন কি? গাড়ি থামাব?

খুব ছোট করে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী, নো।

কৌতূহলভরা দৃষ্টি দিয়ে নিশীথের কলকাতা মহানগরীকে দেখছিলাম চলন্ত গাড়িতে বসে। কিন্তু কান ছিল উৎকর্ণ। এ গভীর রাতে তাজউদ্দীন সাহেবের এই পাষণ্ডতা দেখে বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছিলাম। অলক্ষ্যে অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার শীতল হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পাইনি তবে সারাটা পথ আমার অনুভূতি ব্যথায় টনটন করছিল। নিশীথের কলকাতার রূপ দেখার নেশা আমার নিস্তেজ হয়ে গেল। তাজউদ্দীন সাহেব কি মানুষ না অন্য কিছু? তাঁর কি হৃদয় ও মন বলতে কিছু আছে? সারাটা পথে কেবল মনের মধ্যে এ প্রশ্নই বারবার গুমরে গুমরে উঠছিল।

কখন কলকাতা শহর থেকে বের হয়ে গেছি সে খেয়াল ছিল না। আমরা তখন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকার রাস্তায় গিয়ে পড়েছি। হুঁস ফিরে পেলাম যখন আমাদের গাড়ি হঠাৎ থেমে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কনভয়ের সামনের গাইড থেকে সিগন্যাল এসেছে গাড়ি থামানোর জন্যে। শুনে মনে ভয় ধরে গিয়েছিলো ভীষণ। কারণ, আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো যে, পশ্চিমবঙ্গের পল্লী এলাকাগুলো নক্সালপন্থীদের এক একটি দুর্গ। আমরা যেন এ সম্পর্কে সতর্ক থাকি। যেন চোখ কান খোলা রাখি।

চীনপন্থী এই নক্সালীরা পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছে চীনের মদদে। সুযোগ পেলে মুজিবনগর সরকারের কোনো নেতাকে অস্ত্রবলে হাইজ্যাক করে নিয়ে স্বাধীনতার দাবি ও মুক্তিযুদ্ধ পরিত্যাগ করবার জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। গভীর নিশীথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে হঠাৎ গাড়ি থেমে যাওয়ায় মনে হয়েছিলো তবে কি আমরা নক্সালপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি? কোনো কিছু জিজ্ঞেসের ব্যাপারে আগে থেকেই বারণ ছিল। তাই কোনো কিছু জিজ্ঞেস করি নাই। ফ্রন্টসীটে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে বসা। আমাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখে গাড়ির সামরিক ড্রাইভার বললেন, ভয়ের কিছু নয়। আমাদের সামরিক কনভয় পাস করছে। এসব রাস্তায় কার্ফু দেয়া আছে। সামরিক কনভয় গাড়ি সাইড করে আমাদেরকে জায়গা দিলেই যাত্রা শুরু করবো। সামরিক বাহিনীর গাড়িগুলো সাইড করতে যতক্ষণ সময় লাগবে ততক্ষণই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাদেরকে সিগন্যাল মেসেজ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সাইড দেয়ার জন্যেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো আমাদের কনভয়কে সাইড দিয়ে দিলো এবং সিগন্যাল দিলো অগ্রসর হওয়ার জন্যে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশাল কনভয় রাস্তার এক সাইডে সরে গিয়ে থেমে রইল। তাদের দীর্ঘ লাইনের সাইড দিয়ে আমাদের গাড়িগুলো অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কনভয়ের গাড়ির ভেতরে বসা সমরসেনাগণ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের গাড়ি তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সামরিক সালাম দিয়েছেন। এই বিশাল কনভয় ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার্স থেকে বের হয়ে গভীর রাতের কলকাতা মহানগরীর রাজপথ অতিক্রম করে গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত পথ ধরে এগিয়ে চলছে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে। অথচ কলকাতার কোনো নাগরিক কিংবা কলকাতা বাইরের গ্রামের অধিবাসীরা তা টেরই পেল না। শতাধিক সামরিক লরির কনভয়। জলাপাই রংয়ের বড় বড় লরির মধ্যে বসা অস্ত্রহাতে ভারতীয় জওয়ান। বুঝতে আমার বাকি রইল না যে, এরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে সীমান্তে গিয়ে কৌশলগত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করছেন।

আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে যে, এই বিশাল সামরিক বাহিনী বড় বড় সামরিক গাড়ি বোঝাই কামান-বন্দুকসহ অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম নিয়ে কলকাতার রাস্ত াঘাট পার হয়ে গ্রামের উপর দিয়ে সীমান্তের দিকে ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে অথচ কলকাতার মানুষ তো দূরের কথা একটা মাছিও টের পেল না। জানতে পারলো না। আমরা কলকাতা পার হয়ে যখন গ্রামের মধ্য দিয়ে রাতে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার আশপাশে কোনো জনপ্রাণীও দেখতে পাইনি। ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার বলছিলেন যে রাতে কার্ফ্যু জারী করে আমাদের সেনাবাহিনী কলকাতা শহর পাড়ি দেয়। প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার উপর আমরা সেনা কিংবা অস্ত্রশস্ত্র পারাপার করি না।

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। কারণ, আমরা পাকিস্তানে প্রকাশ্য দিবালোকে সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র চলাচল করতে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, বেসামরিক প্রশাসনে ইউনিফর্ম পরা এমনকি সিভিলিয়ানদের বিচার করার জন্যে সামরিক আদালত, সামরিক বিচারক পর্যন্ত দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কথায় বলে বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। পেশাদার ভারতীয় সৈনিক পেশায়ই তাদের কি সুন্দর দেখতে। চমৎকার তাদের আচার-আচরণ, আদব-কায়দা। কলকাতা শহর থেকে বের হওয়ার পর রাতে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে যাওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অভিমুখী রাস্তায় যেখানেই তাদের সম্মুখীন হয়েছি, ভারতীয় বাহিনীর কনভয়ের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার তাদের গাড়ি থেকে নেমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সামরিক সালাম জানিয়েছেন। সিগন্যাল কোরের ভারতীয় সৈনিক পথ দেখিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অগ্রসরমান মোটর বহরকে। রাতে সারাটি পথে দু'চোখ ভরে দেখেছি অগ্রসরমান সশস্ত্র ভারতীয় বাহিনীকে। গাড়ি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম, রসদ। সামরিক ট্রাকের উপর জলপাই ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। তাদের দেখে মনে ভরসা পেলাম, ভাবলাম—ভারতীয় অফিসার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নেমে আদবের সঙ্গে সালাম দিচ্ছে। আর আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেতনধারী

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী খুঁজছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে ধরে নিয়ে হত্যা করতে। বাংলাদেশে তারা নির্বিচারে চালাচ্ছে গণহত্যা, শিশুহত্যা, নরহত্যা, নারী নির্যাতন। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে। মানুষ প্রাণের ভয়ে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়িঘর, সহায়-সম্পত্তি ফেলে রেখে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ভারতীয় এলাকায়। একদিকে রক্ষক আরেক দিকে ভক্ষক। একদিকে মানুষকে রক্ষার জন্যে হাতের অস্ত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে গর্জে উঠছে, অন্যদিকে অস্ত্র দুর্বিনীত হয়ে মানুষ হত্যা করছে। একই অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি ভয়ানক পার্থক্য! অস্ত্রকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যের মধ্যেও কত পার্থক্য। অস্ত্রকে যতই ভয় পাই, যতই অবিশ্বাস করি, অস্ত্রের তো আসলে নিজের কোনো দোষ নেই। দোষ মানুষের, যে মানুষ এটাকে ব্যবহার করে, দোষ তার। অস্ত্র কেবল মানুষের বিশ্বস্ত দাস হিসেবে তার উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করে। পাকিস্তানী হিংস্র জানোয়াররা বাংলাদেশে এই অস্ত্র দিয়েই মানুষ খুন করে চলছে। আর ভারতীয় অস্ত্র এগিয়ে এসেছে পাকিস্তানী হিংস্র জানোয়ারদের হাত থেকে বাংলার মানুষকে রক্ষা করার জন্যে।

গাড়িতে বসে ভেবে ভেবে চোখে অশ্রু এসে গিয়েছিল। হঠাৎ এক জঙ্গলের সামনে গিয়ে আমাদের সামনের ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জীপটি একপাশে সরে গেল। একজন অফিসার প্রধানমন্ত্রীর দরজার পাশে এসে বললেন, এসে গেছেন স্যার। গাড়ি থেকে নামুন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন পরম শ্রদ্ধাভরে আনন্দাশ্রু মিশ্রিত এক আবেগ-আপ্লুত অনুভূতি নিয়ে পা রাখলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। বাংলার মাটির পবিত্র পরশে জীবন আমার ধন্য হয়ে গেল। সামনেই আম বাগানের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। মিটমিট করে হারিকেন জ্বলছে। ক্যাম্পের অফিসার এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কোনো প্রটোকলের ধার ধারলেন না। বুকে জড়িয়ে ধরলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে। তারপর ক্যাম্পের ভেতর গিয়ে একজন একজন করে অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের সঙ্গে বুকে বুক মিলালেন। আমাদের সকলের চোখে আনন্দাশ্রু। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পরনে পায়জামা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। চোখে সেই কালো মোটা ফ্রেমের স্বচ্ছ চশমা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গভীর রাতে এই কোলাকুলির ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরাম্যান সুজিত ক্যামেরার সুইচ টিপ দিলে ফ্লাশগানের ঝলসানো আলোতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দুচোখের চিকচিক করে ওঠা অশ্রু কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রধানমন্ত্রী রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। আমরা কেউ চোখের অশ্রু সংবরণ করে রাখতে পারিনি—রাখার জন্যে চেষ্টাও করিনি।

॥ তেইশ ॥

এটা ছিল কুষ্টিয়া জেলার একটি মুক্ত সীমান্ত এলাকা। ঘন আমবাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। জায়গাটার নাম আমাদেরকে বলা হয়নি। জানতেও চাইনি। জানতে চাইলে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই কারো কাছে জিজ্ঞেসও করিনি। প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ রাখলেন। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন।

বললেন, সুবিধার কথা ভুলে গেছি কি কি অসুবিধায় আছেন জানতে এবং দেখতে এসেছি। আজ আনন্দ নয়, আপনাদের সঙ্গে একান্ত হয়ে মাতৃভূমি উদ্ধার করার শপথ নিতে এসেছি। এসেছি বাংলার ধূলি গায়ে মেখে নিতে, যেন এই অঙ্গীকার জীবন বেঁচে থাকতে না ভুলি।

রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী বললেন, হানাদার বাহিনীর দখলীকৃত বাংলাদেশের ঘরে আমাদের মা-বোনদের জীবনে আজ ঈদ নেই, ঈদের আনন্দ নেই। বাংলার ঘরে ঘরে আজ ভয়ভীতি, হতাশা কান্নার রোল। পবিত্র ঈদের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে নিষ্ঠুর হানাদার বাহিনী। বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে এই দস্যুদের উৎখাত করে আমরা মুক্তবাংলায় ঈদ করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার তাড়া করলেন। বললেন, মধ্যরাত প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রভাত হয়ে গেলে কলকাতায় যাওয়া যাবে না। রাতে রাতেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

ঈদ উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কিছু সেমাই রান্না করা হয়েছিল। তাই এনে দেয়া হলো প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে। আমরা খেয়ে নিলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মিষ্টিজাতীয় কোনো খাবার খেতেন না। তবু কিছু মুখে দিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বহরের এক গাড়িতে করে কিছু ফলমূল, বিস্কুটও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী এসব খাদ্যদ্রব্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করলেন এবং সারাদিনের মধ্যে এই কিছু মুখে দিলেন। ঈদের দিন কলকাতায় সারাদিন বহু অনুরোধ করেও কিছুই খাওয়ানো যায়নি তাঁকে। তিনি বললেন, আমার মুক্তিযোদ্ধারা কেউ খেতে পায়নি। নিজ জীবনকে বিপন্ন করে ট্রিগার হাতে কোথায় কোন্ জঙ্গলে বসে রয়েছে। খাওয়ার চিন্তা করার সময় কই তাঁর? ঈদের দিনের কথা তো তাঁর মনেই নেই। বনের অজানা অখ্যাত গাছের কিছু লতাপাতা ও ফুল মিলিয়ে মালা গেঁথে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে দেয়া হয়েছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে।

সত্তরের নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনী বিজয়ের পরে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের মাল্যদানের হিড়িক দেখতে দেখতে মাল্যদানের প্রতি মন আমার আগে থেকেই বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁকে যখন এই গভীর রাতে বন-জংগলের মধ্যেও জীবন মরণের এক ক্রান্তিলগ্নে কোথাকার অজানা, অজ্ঞাত অখ্যাত গাছের ফুলের মালা দেয়া হয়, তখন খুবই বিরক্তবোধ করছিলাম। একে তো চোখে ঘুম নেই, তার উপর দীর্ঘ ভ্রমণজনিত কিছু ক্লান্তি—বলতে গেলে সবারই মধ্যে যেন একটা অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব। তাজউদ্দীন সাহেব এটা লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু আমাদের সবার বিরক্তি ভারাক্রান্ত অনুভূতিকে অচিন্তনীয় আবেগ অশ্রুতে ভাসিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, মালা আমি নিই না, মালা পাবেন বঙ্গবন্ধু। তবু আজকের এ রাতের এ মালা আমি নেবো। বাংলার বনবাদাড়ের গাছগাছড়ার ফুল দিয়ে তৈরি এ মালা আমি নেবো। আজ যদি আমার মরণ হয়, অন্তত এ সান্ত্বনাটুকু নিয়ে আমি মরতে পারবো যে, মুক্ত বাংলার মাটিতে জন্ম একটি গাছের ফুলের মালা গলায় নিয়ে আমি মরতে পারলাম।

আবেগে অশ্রুতে দু'চোখ আমার ছলছল হয়ে উঠেছিল।

এরপর পাশাপাশি আরো কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প পরিদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে বুকে বুক মিলিয়ে আমরা রওনা হলাম কলকাতার পথে। প্রধানমন্ত্রী ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, কম্বল, বিছানার চাদর, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি বিতরণ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। ফেরার পথে ভারতীয় সীমানার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে স্থাপিত একটি ফিল্ড হাসপাতালে গেলেন প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখার জন্যে। হাসপাতালের বেডে বেডে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতালের ভারতীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আহতদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। হাসপাতালে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তিনি খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় বিতরণ করেন। যুদ্ধাহতদের তিনি সান্ত্বনা দেন। তাদের বাড়িঘরের ঠিকানা নেন। তিনি আশ্বাস দেন যে তাঁদের এই রক্তদান কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। যে কোনো মূল্যেই হোক বাংলাদেশ স্বাধীন করা হবে। হানাদার বাহিনীর একটি সৈনিক বাংলার মাটিতে থাকা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

ফিল্ড হাসপাতাললে চিকিৎসাধীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিকিউরিটি প্রধান মিস্টার বোস তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সময় সম্পর্কে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, স্যার, রাত আর বেশি বাকি নেই। সূর্য ওঠার আগেই কার্ফ্যু শেষ হয়ে যাবে। রাস্তায় যানবাহন ও লোক চলাচল শুরু হয়ে যাবে। তখন আমাদের কলকাতায় ফিরে যেতে ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হবে।

তাজউদ্দীন ফিল্ড হাসপাতালের চিকিৎসাধীন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে যে কোনো মূল্যে মাতৃভূমি মুক্ত করার অঙ্গীকার করে বিদায় নিলেন। সারা মুখমণ্ডলে তাঁর গভীর দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার ছায়া। অপেক্ষমাণ গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আমাদেরকে নিয়ে গাড়ির বহর পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের শেষ রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কলকাতা অভিমুখে ছুটে চলল। সীমান্ত এলাকা ছেড়ে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হলে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির। গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসা ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার মিস্টার বোস প্রধানমন্ত্রীকে দেখালেন রাস্তার অদূরের কয়েকটি শরণার্থী শিবির। শেষ রাতের আবছা আধারের আবরণে ঢাকা শরণার্থী শিবিরে লোকজনের কোলাহল, শিশুদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো, সেখানে ঈদ আসেনি। তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের হায়েনা বাহিনী এদেরকে নিজ মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পবিত্র ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপনের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এটাই নাকি পাকিস্তানী সামরিক জান্তার ইসলাম রক্ষার জেহাদ? ধর্ম কার জন্যে? ধর্ম মানুষের জন্যে না ধর্মের জন্যে মানুষ? মানুষই যদি না থাকলো, তাহলে ধর্ম পালন করবে কে?

প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসে মনের মধ্যে এ প্রশ্নগুলো নিরন্তর আলোড়িত হচ্ছিলো। একবার ইচ্ছে হয়েছিলো প্রধানমন্ত্রীকে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এটা হবে আমার ধৃষ্টতা। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে বসে ভালো করে স্বাধীন মতো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে সাহস পাইনি। কারণ, রাতে প্রধানমন্ত্রীর চলন্ত গাড়িতে বসে নড়াচড়া করলে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসা ভারতীয়

নিরাপত্তা অফিসার আবার এই নড়াচড়ার কি অর্থ করে বসেন, কিংবা এই নড়াচড়ার মোটিভ কি এ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন, এ ভয় সারাক্ষণ আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

অদূরে কিসের যেন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এক অসতর্ক মুহূর্তে অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করে বসলাম, এটা কিসের আওয়াজ?

আমার পাশে চলন্ত গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের উপর হাত রেখে বসা ভারতীয় সামরিক ড্রাইভার বললেন, এটা টিউবওয়েল চাপার আওয়াজ। শরণার্থী শিবিরের লোকজনেরা পানির কল চেপে পানি উঠাচ্ছে। রাতের ঘুম এদের চোখ থেকে পালিয়ে গেছে। ক্ষুধার অনলে জ্বলন্ত চোখে ঘুম আসবে কেমন করে?

ভাবলাম, খাবার দিতে পারুক আর না পারুক অন্তত পানি খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে সদাশয় ভারত সরকার টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছেন। ভারত সরকারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম।

আমাদেরকে নিয়ে গাড়ি ছুটে চলছে কলকাতার দিকে। পূর্ব দিগন্তে অপসৃয়মান আঁধারের আড়াল থেকে উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভায় আকাশের বুক লাল হয়ে উঠেছিল। ড্রাইভার চাপাকণ্ঠে বললেন, কলকাতা আর খুব বেশি দূরে নেই। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পথে ভারতীয় সেনাবাহিনী-সীমান্ত অভিমুখী কনভয় চোখে পড়েনি। ওরা পথ ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমে তাদের কৌশলগত অবস্থানের দিকে চলে গেছে।

ভোর রাতের আবছা আঁধারে গাড়িতে বসে দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের রাস্তা থেকে দূরে সবুজ ঘন বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে জলপাই রংয়ের সামরিক ইউনিফর্ম পরা ভারতীয় সৈনিকরা। বনের সবুজ গাছপাতার আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে। জলপাই রঙের ত্রিপল দিয়ে ঢাকা সামরিক লড়ি, কামানবাহী সামরিক যানগুলো বনের পাশে গিয়ে অবস্থান নিচ্ছে। পানিবাহী সামরিক ট্যাংকগুলো বন-জঙ্গলের কাছে গিয়ে স্থান করে নিচ্ছে। সৈনিকদের কেউ কেউ বনের ভেতরে তাঁবু খাটাচ্ছে। সামরিক ড্রাইভার বললেন, রাত ভোর হয়ে গেছে। তাই কনভয়গুলো আর সামনে মুভ করবে ন। দিনের বেলায় বনেই ক্যামুফ্লেজ (গা-ঢাকা দেয়া) করে থাকবে। রাতে লোক চলাচল বন্ধ হলে আবার চলতে শুরু করবে। সীমান্ত এলাকায় গিয়ে বাংলাদেশ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে ঘাঁটি গাড়বে। অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ ও রসদের ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। ট্রানজিট ক্যাম্পের আশপাশের এলাকায় সিগন্যাল কোরের লোকজন অবস্থান নিয়েছে। মাটির উপর দিয়ে টেলিফোনের তার পাতা হয়েছে। বড় রাস্তার খানিক দূরে অ্যারো মার্ক চিহ্নিত স্টিকার বসিয়ে সামরিক অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। সারা পথে গাড়িতে বসা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পাশে বসা রহমত আলী ও নিরাপত্তা অফিসার মিস্টার বোসের কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিংবা চোখ বুজে বসেছিলেন। আমার কিন্তু সারারাত চোখে ঘুম আসেনি। চোখ খুলে রেখে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একাগ্র মনে দেখছিলাম কলকাতা শহরের বাইরের গ্রামাঞ্চল। এই বাংলারই অন্য অংশ পূর্ববঙ্গ। একই রকম গাছপালা। ঝাড়-জঙ্গল, পথঘাট, মাঠভরা আখ ক্ষেত, পাট ক্ষেত, ধান ক্ষেত, শেষ রাতের শিশির ভেজা এক অপরূপ বাংলা।

আরো কিছু অগ্রসর হলে কলকাতার শহরতলির কোনো এলাকার মসজিদ থেকে ফজরের নামাজের আজানের সুর ভেসে আসছিল। আমাদের গাড়ি যত কলকাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আজানের ধ্বনি তত স্পষ্ট হচ্ছিল।

ভাবছিলাম, এই হিন্দুস্থানেও আজান শুনলাম। মুসলমাদের জন্যে জিন্নাহ পাকিস্তান বানিয়ে গেছেন। মুসলমানরা শুধু পাকিস্তানে থাকবে, আর হিন্দুরা হিন্দুস্থানে থাকবে। পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর টু-নেশান থিওরী (দ্বিজাতিতত্ত্বের) মূল কথা তো ছিল মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্যে হিন্দুস্থান। ভারতের যে মুসলমানরা ইসলামিক দেশ পাকিস্তানে চলে যায়নি, তারা কি তাহলে সত্যিকার মুসলমান নয়? তাহলে এই যে হিন্দুস্থান মুল্লুকে ফজরের আজান দিচ্ছে তা কি প্রকৃত মুসলমানের আজান নয়? সত্যি আমার বড় কৌতূহল জন্মেছিল, যেখান থেকে আজানের এই সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছিল সেখানে দেখার জন্যে, সেখানে কোনো মসজিদ আছে কিনা কিংবা সেই মসজিদে কোনো মুসলমান মুসল্লী আসেন কিনা নামাজ পড়তে। কিন্তু গাড়িটি আমার কথায় চলে না, চলবেও না। তাই ইচ্ছে করলেই তো আর যাওয়া যাবে না।

মুসলমানদের দেশ পাকিস্তান এবং হিন্দুদের দেশ হিন্দুস্থানের তো একটা নির্দিষ্ট সীমানা আছে। কিন্তু ধর্মের তো কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা বা সীমানা নেই। মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের তো কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া এবং ইউরোপীয় দেশ ইসলামী রাষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও তো সেসব দেশে মুসলমান আছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্ম পালন করেন। তাহলে শুধু পাকিস্তানই মুসলমানদের দেশ হবে কেন? মুসলমানদের পবিত্র দেশ সৌদী আরবে পবিত্র হজ্জ পালন করতে গেলে মুসলমানদের জন্যে কেন পাসপোর্ট-ভিসা লাগে? তাহলে রাষ্ট্র আর ধর্ম এক জিনিস নয়? তাই যদি হয় তাহলে জনাব জিন্নাহ রাষ্ট্র ও ধর্মকে এক করে ফেললেন কেমন করে তাঁর টু নেশান থিওরীতে? রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক হয় কেমন করে? আসলে রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট এক ভিন্ন ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রকাঠামোর ভৌগোলিক অবস্থান সময় ও জনগণের প্রয়োজনে ভিন্ন ও পরিবর্তন হয় এবং হতে পারে কিংবা অন্য কোনো শক্তি রাষ্ট্র দখল করে নিতে পারে। কিন্তু ধর্ম আল্লাহ সৃষ্ট জীবনবিধান। এই ধর্ম মানুষ বিভক্ত কিংবা পরিবর্তন অথবা দখল করে নিতে পারে না বা ধর্ম দখল করে নেয়ার বিষয়সম্পত্তিও নয়। তবে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার নিজ ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে।

একই ধর্মাবলম্বী পিতা-মাতার একাধিক পুত্রসন্তান এক সময় সংসারে পৃথক হয়ে যায়। এটা কোনো ধর্মের কারণে নয়—সাংসারিক স্বার্থের কারণে। এই পৃথক হওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক স্বার্থের। তেমনি কোনো রাষ্ট যখন বিভক্ত হয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিংবা অন্য কোনো দেশ কর্তৃক যখন কোনো দেশ দখলীকৃত হয় তখন এটা ধর্মের জন্যে করা হয় না। দেশ দখল করা হয়, কিংবা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের কারণে। ধর্মের কারণে নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে এজন্যে ব্যবহার করা হয়। কিছু মানুষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণে পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে, সচেতন মানুষকে

বিভ্রান্ত করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা অনাসৃষ্টি, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিশ্বে রাষ্ট্রও হয় একটি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রয়োজনে। ধর্ম যে কোনো দেশে ও যে কোনো স্থানেই পালন করা যায়। সব ধর্মের লোক নিয়েই একটি দেশ বা রাষ্ট্র হয়। কিন্তু একই ধর্মের ভিত্তিতে সব রাষ্ট্র মিলে এক রাষ্ট্র হয় না, হতে পারে না। তদুপরি রাষ্ট্রীয় অনুশাসন দিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং হয়ে থাকে। পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধান। ধর্মীয় বিধান নয়। ধর্ম পালন করতে গেলে এই রাষ্ট্রীয় বিধান অবশ্যই পালন করতে হয়।

সৌদি আরবে হজ্জ-পালন করতে অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের অবশ্যই পাসপোর্ট ভিসা লাগবে। এটাই বাস্তব। তাহলে জনাব জিন্নাহ কেন শুধু মুসলমানদের কথা বলে ইসলামের ধুয়া তুলে মুসলমানি নামে পাকিস্তান নামক এক আজব দেশ তৈরি করলেন? সব ধর্মাবলম্বী লোক নিয়েই একটি রাষ্ট্র হয়। কোনো রাষ্ট্রের সব ধর্মাবলম্বী মানুষের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণভিত্তিক নীতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি তৈরি এবং পরিচালিত হয়। পাকিস্তানভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা তো শতকরা ৯৫ ভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানী মুসলমান সৈনিকরা কেন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করছে? কেন মুসলমান নারীদের উপর ধর্ষণ নির্যাতন করছে? এটা কি ধর্মের কারণে না স্বার্থের কারণে? এসব ভাবনার কোনো কূলকিনারা ছিল না আমার অন্তর্লোকে।

হঠাৎ ড্রাইভার বললেন, আমরা কলকাতা শহরে এসে পড়েছি। কলকাতা শহরে কিছু গাড়িঘোড়া চলাচল শুরু হয়েছে। কাঁচাবাজারে মালামাল আনা-নেয়া হচ্ছে।

আবার সিআইটি রোড ধরে গাড়ি যাচ্ছে। সিআইটি রোডের সেই বহুতল বাড়িটির কাছে গিয়ে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে যায়। সিকিউরিটি অফিসার মিস্টার বোস প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বললেন, স্যার বাসায় উঠবেন, গাড়ি থামাবো?

তাজউদ্দীন সেই আগের মতো মাথা নেড়ে বললেন, না।

বাংলার মুক্তাঞ্চল থেকে ফিরে আসার সময় সারা পথের মধ্যে এই তাঁর মুখে কথা শুনলাম।

মিস্টার বোস আমতা আমতা করে বললেন, স্যার, বাসায় ছেলেটির গায়ে একশ ডিগ্রীর বেশি জ্বর। গত দু'তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছে।

॥ চব্বিশ ॥

আমরা খুব ভোরে আট নম্বর মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে গিয়ে পৌঁছলাম। কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া সেই ভবনে বসবাসরত আর কারো ঘুম ভাঙ্গেনি।

রহমত আলী সাহেব কলকাতায় অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্যে বরাদ্দ সিআইটি রোডের ওই বাড়িতেই রাতে ঘুমোতেন। সেদিন সারারাত জার্নির কারণে নির্ঘুম থাকায় আমরা সবাই মোটামুটি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। থিয়েটার রোডে গাড়ি থেকে নেমে গেটে গার্ডের সালাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘরে চলে গেলেন নিঃশব্দে। আমি চলে গেলাম ব্যারাকে। ব্যারাকে গিয়ে ক্যাম্পখাট খুলে বিছানা

পেতে শুয়ে পড়লাম। রহমত আলী সাহেব প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছিয়ে দিয়ে সিআইটি রোডের উদ্দেশে চলে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর আপাতনিষ্ঠুরতার ব্যাপারে আমাদের গভীর ক্ষোভ আঁচ করতে পেরেছিলেন। দু'তিন দিন পর রাতে রহমত আলী সাহেব এসে আমাকে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। আমরা গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ পূর্ণ নীরবতার পর তাজউদ্দীন সাহেব মুখ খুললেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলে চললেন কতকগুলো নিষ্ঠুর কথা। বললেন, আপনারা দু'জনই আমার পরিবার ও সন্তান সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাদের অবস্থা দেখে মনে হয়েছিলো যেন আমি সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী সম্পর্কে খুবই উদাসীন। আপনারা আমার ছেলের প্রচণ্ড জ্বর, স্ত্রীর অসহায় অবস্থাকেই বড় করে দেখেছেন। চোখের সামনের দৃশ্যগুলোই আপনাদের মনে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। ভাবিয়ে তুলেছে আপনাদেরকে—হয়তো আমি প্রধানমন্ত্রী তাই। কিন্তু ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে হাজার হাজার শিশু না খেয়ে অসুখে-বিসুখে কাতরাচ্ছে, কত মা তার বুকের শিশুর মুখে খাবার দিতে পারছে না, অসুস্থ শিশুর মুখে একফোঁটা ওষুধ দিতে পারছে না। দখলীকৃত বাংলাদেশে লাখ লাখ বাঙালি নিষ্ঠুর হানাদার বাহিনীর হামলা-নির্যাতনের মুখে কেমন করে দিনরাত কাটাচ্ছেন অসহায় অবস্থায়, তাঁদের আর্তচীৎকার সর্বক্ষণ আমার কানে বাজে। সর্বক্ষণ আমার মনকে বিষাদময় করে রাখে। আমি আমার সন্তানের কান্না সেখানে শুনতে পাই। লাখ লাখ মা-বোন-স্ত্রীর কান্না শুনতে পাই। সিআইটি রোডের নিরাপদ বাড়ির আশ্রয়ে থেকে আমার সন্তানের জ্বরের তাপ, আমি বাসায় না যাওয়ায় আমার স্ত্রীর কান্না, ক্ষোভ কি এর চেয়েও বেশি? রহমত আলী, আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েও বেঁচে থাকার কথা ছিল না। আমি বেঁচে আছি, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বেঁচে আছে এবং পরম নিরাপদে আছে। পাকিস্তানী সশস্ত্র জল্লাদ বাহিনী আমাদের কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আমরা, এটাই তো বড় পাওয়া। দেশকে মুক্ত করা ছাড়া এখন আমাদের আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকতে পারে না।

হায়েনা বাহিনীর দখলীকৃত বাংলাদেশে মানুষের কি অসুখ-বিসুখ নেই? সেখানে যারা দেশকে মুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ করছে তাদের মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, ভাইবোন পাকিস্তান জল্লাদ বাহিনীর জিন্দানখানায়। শত্রু হননের এম্বুশে বসে তারা তাদের পরিবারের কথা কি ভাবছে, না ভাবতে পারছে? যুদ্ধ করার সময়ও তো কত মুক্তিযোদ্ধা শত্রু বাহিনীর হতে নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে। হয়তো আরো মরবে। এদের মধ্যে যারা বিবাহিত তাদের নিশ্চয়ই বউ-ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা তো জানবেও না যে তাদের আপনজন মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছে। এদের গোরকাফন কোথায় কিভাবে হয়েছে, কিংবা ঝাড়ে-জঙ্গলে পড়ে রয়েছে না নদীর পানিতে ভাসছে, সে খবর তাদের আত্মীয়-জনদের জানা তো দূরের কথা, আমরাই অনেক খবর জানি না। ইচ্ছে করলেও সব খবর জানতে পারবো না। এসব কি আমরা ভাবছি? এদের কথা কি স্মরণ করছি?

তাজউদ্দীন বললেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের ছেলেমেয়ে-স্ত্রী তো নিরাপদেই আছে কলকাতা শহরে। এদের কথা চিন্তা করার জন্যে তো সবাই রয়েছে। যেমন আপনারা, মিস্টার বোস, মিস্টার চ্যাটার্জি সবাই তো আমার ছেলেমেয়ের ও স্ত্রীর সুখ-দুঃখের চিন্তার জন্যে রয়েছেন।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা শত্রুবাহিনীর হামলায় পা হারিয়েছে, হাত হারিয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। কেউ গুলির আঘাতের যন্ত্রণা চেপে ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে। এদেরও তো অনুভূতি আছে। তাঁদেরও মা-বোন-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে স্বজন রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথা চিন্তা করার সময় কোথায়? মাইন বা গুলির আঘাতে যন্ত্রণাকাতর ওই মুক্তিযোদ্ধা তার ব্যথা–বেদনা চেপে ধরে সকল অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা দেশমুক্ত করার অগ্নিশপথে সমর্পণ করেছে। শেষ সম্বল নিজ প্রাণটিও দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। শত্রুর হাতে মৃত্যুর পর গোর-কাফন হবে কি হবে না, কিংবা কোথায় গোর-কাফন হবে; আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার মৃত্যুর খবরটুকু জানতে পারবে কিনা এই ভাবনাটুকু কি তার মনে একটিবার উদয় হয়? কোথায় তার অনুভূতি? যদি প্রশ্ন করেন, তার কি কোনো অনুভূতি আছে? এ পরিস্থিতিতে এর কী জবাব আছে? পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে যদি আমার মৃত্যু হতো তাহলে আমার পরিবার-ছেলেমেয়েদের অবস্থা কি হতো? কে ভাবতো তাদের কথা? যাঁরা এরই মধ্যে নিহত হয়েছেন তাঁদের রেখে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনদের কথা এ মুহূর্তে আমিও কি একটিবার ভাবছি? আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনিও কি ভাবছেন?

আমি যদি বঙ্গবন্ধুর মতো পাকিস্তানীদের জিন্দানখানায় বন্দী থাকতাম, তাহলে কে দেখতো আমার ছেলেমেয়েদের? অথবা আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যদি বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ও ছেলেমেয়েদের মতো পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর হাতে বন্দী থাকতো? আমি কি করতে পারতাম তাদের জন্যে?

একবার ভাবুন, ঢাকায় পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর হাতে বন্দী বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের কথা। তাঁরা কি অবস্থায় আছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায় থেকে কি তাঁদের কথা ভাবতে পারছেন? কিংবা তাঁরাও কি ঢাকায় বন্দী অবস্থায় থেকে ভাবতে পারছেন বঙ্গবন্ধু কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তিনি বেঁচে আছেন কিনা, কিভাবে বন্দী অবস্থায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের রাতদিন কাটছে এটা কি আমরা ভাবতে পারছি?

তাজউদ্দীন সাহেবের কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। চোখে অশ্রু ছলছল করছিল। তাঁর কথাগুলো আমার মনের মধ্যে তীরের মতো বিদ্ধ হয়েছিল। লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছিল। মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকানোর নৈতিক বলও আমাকে ত্যাগ করে দূরে সরে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এমনভাবে কথা বলতে পারেন আগে তা শুনিনি। লোকের কাছে, এমনকি তাঁর ভক্তকর্মীদের কাছেও অভিযোগ শুনেছি—তাজউদ্দীন সাহেব জনসভায় দাঁড়িয়ে ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না, মাঠে তিনি বক্তৃতা জমাতে পারেন না। কিন্তু সেদিন তাঁর সামনে বসে তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো শুনছিলাম তা আমার হৃদয়কে মোচড় দিয়ে ব্যথাতুর করেছিল, আমাকে অলক্ষ্যে অশ্রুসিক্ত করেছিল।

আমাকে অনুতপ্ত করেছিল। কেন ভাবতে গিয়েছিলাম তাজউদ্দীন সাহেবের বউ-ছেলেমেয়েদের কথা? আমি কি স্বার্থান্ধ? কোনো স্বার্থের কারণেই কি আমি তাজউদ্দীন সাহেবের বউ-ছেলেমেয়ের কথা খুব বেশি করে ভেবেছিলাম? স্বাধীন বাংলার তাজহীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সামনে বসে মনের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা আমাকে বারবার তীরের মতো বিদ্ধ করছিল।

তাজউদ্দীন সাহেবের কথাগুলো তীরের মতো বিদ্ধ হলেও আমার চিন্তার ভিতকে মজবুত করে তুলছিল। সে মুহূর্তে যদিও আমার কামনা ছিল তাজউদ্দীন সাহেবের কথা থেমে যাক, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে তিনি থেমে গেলে চিন্তার পরিধিকে অদৃশ্যলোকে প্রসারিত করা থেকে বঞ্চিত হতাম। তাজউদ্দীন সাহেব থামেননি। তিনি বলছিলেন, চিন্তাটা শুধু কলকাতায় ভারত সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারের জন্যে কেন? আমরা কি এখানে আমাদের বউ-ছেলেমেয়েদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্যে এসেছি? অসুখ-বিসুখের কি কারো প্রতি বিশেষ দয়ামায়া আছে? অসুখ-বিসুখ কি শুধু নিরাপদ স্থানে আশ্রিত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের ছেলেমেয়েকেই দেখেছ? পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সেদিন রাতে বাংলাদেশের যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলো দেখে এলেন, অসুখ-বিসুখ জ্বর-জ্বারির দৃষ্টি কি সেখানকার ছেলেমেয়েদের উপর পড়েনি? দখলীকৃত বাংলার অসহায় কোটি কোটি মানুষের ঘরেও তো অসুখ-বিসুখ হতে পারে। মন খুলে বলুন, তাজউদ্দীনের বউ-ছেলেমেয়েরা কি তাদের চেয়েও অসহায় অবস্থায় আছে? সত্যি আমি দুঃখিত। খুব সাধারণ বিষয় নিয়ে আপনারা আমাকে একটি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেন। ভারত সরকারের সুরক্ষিত আশ্রয়ে কলকাতা শহরে আমাদের কে কোথায় অসুখে পড়েছে, কিংবা দু-এক বেলা খেতে পাচ্ছে না এসব চিন্তা ছাড়েন তো! যারা নিরাপদে বেঁচে আছেন তাদের একজন দু'জনের কথা ভাবলে তো চলবে না। পাকিস্তানী জল্লাদদের হাতে জিম্মি দেশের কোটি কোটি মানুষকে কেমন করে মুক্ত করবো, দেশকে কেমন করে উদ্ধার করবো, সেসব বিষয় নিয়ে ভাবুন, চিন্তা করুন।

এরপর আর এক মুহূর্তও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সামনে বসে থাকতে ইচ্ছে করেনি। ইচ্ছে হয়েছিলো বের হয়ে পড়ি। কিন্তু জেদের বশে তাঁর সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়াটা হয়তো চরম বেয়াদবি হতো, চরম ধৃষ্টতা হতো।

রহমত আলীর সুন্দর ফর্সা মুখ মলিন হয়ে গিয়েছিল। তাজউদ্দীন সাহেব বুঝেছিলেন, আমরা জব্দ হয়ে গেছি। বললেন, রাত হয়ে গেছে অনেক। এবার আপনারা আসুন।

আমাদের মুখে আর কোনো কথা নেই। সালাম জানিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এসেছিলাম।

থিয়েটার রোডের বাড়িতে আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে ক্ষুব্ধ রহমত আলী বললেন, মানুষটার সঙ্গে পারা গেলো না নজরুল সাহেব। তিনি একবার আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন না। কি খেলাম, কি পরলাম, হাতে টাকা-পয়সা আছে কিনা কোনো খোঁজ-খবর তিনি নেননি এ পর্যন্ত। তাঁর কাজে পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা, আসাম, আমাদের রংপুর, দিনাজপুর সীমান্তে ভারতীয় এলাকা জলপাইগুড়ি প্রভৃতি

অঞ্চলে ছোটাছুটি করতে হয়। ভালো কাপড়-চোপড় আনতে পারিনি সঙ্গে। যেসব কাপড়-চোপড় সঙ্গে আছে তাও ময়লা, লন্ড্রিতে ধোয়াতেও পয়সার দরকার। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এসব একটু খেয়াল করতে চান না। শুধু যাতায়াতের ভাড়ার টাকার ব্যবস্থা করে ব্যস খালাস। কি করবো, বাড়ি ফিরে যাওয়ারও তো কোনো উপায় নেই। না হয় বাড়িতে গিয়ে কিছু টাকা-পয়সা ম্যানেজ করে নিয়ে আসতে পারতাম।

॥ পঁচিশ ॥

রহমত আলী গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের এক সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের ছেলে। তেজগাঁও পলিটেকনিকে লেখাপড়া করার সময় ছাত্রলীগের একজন সাহসী কর্মী হিসেবে তেজগাঁও শিল্প এলাকার ছাত্র ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে ৬ দফা আন্দোলন করেছিলেন।

ঢাকায় শ্বশুর অবস্থাসম্পন্ন লোক। ধানমন্ডিতে শ্বশুরের বিশাল বাড়ি। নিজে থাকেন এবং ভাড়া দেন। রহমত আলী ছাত্রাবস্থায় শ্বশুরের সংসারেই ছিলেন। তরুণী বধূর মনরক্ষার জন্যে কোনো বায়নাও তাঁকে পূরণ করতে হয়নি। ভাগ্যবান জামাই। তাঁর দায়িত্ব শুধু দয়া করে এসে শ্বশুরের বাড়িতে খেয়ে যাওয়া আর রাতে ঘরে ফেরা।

তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ষাটের দশকে আইয়ুব-মোনেমী সামরিক গণতন্ত্রের আমলে ৬ দফা আন্দোলন করে খুব সাহসী এবং শক্ত হয়ে উঠেছিলেন রহমত আলী। তবে সুযোগ-সুবিধা ভোগের সঙ্গে কোনো আপোস করেননি উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের এই কৃষকনন্দন। এখন কলকাতায় এসে এক রসবোধহীন নেতা তাজউদ্দীন আহমদের পিছু নিয়ে, রিক্তহস্ত তাজউদ্দীন কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, বুঝতে চান না। অথচ তাঁর সমপর্যায়ের অনেক ছাত্র-যুবকর্মী কলকাতা বোম্বে দিল্লী ডাটসাঁইটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে কুছ পরোয়া নেই। তাদের টাকা-পয়সার অভাব নেই। রহমত আলী জেদে ক্ষোভে দুঃখে এবং রাগে একদিন আফসোস করে বললেন, আমারই কপাল মন্দ। এমন এক নেতার পেছন ধরেছি, যাঁর কাছে গেলে ফরমায়েশ ছাড়া টাকা-পয়সা পাওয়া যায় না।

তারপর নিজেই সান্ত্বনার সুরে বললেন, তবু ভালো, আল্লাহ আল্লাহ করে দেশটা স্বাধীন হোক আগে।

সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো যুদ্ধের পূর্বাপর আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী পরিবেশন যুদ্ধ কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর অবতারণা করতে হচ্ছে।

মুজিবনগরের হতাশাপূর্ণ থমথমে ভাব তখনও কাটেনি। বরং এ থমথমে ভাব এবং হতাশার কালো আঁধার তখন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় মুজিবনগরের আকাশে তখন নানা গুজব শতসহস্র পাখা মেলে উড়ে উড়ে যেন হতাশার কালো মেঘ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হতাশার এই কালো মেঘের মধ্যে নানারকম উড়ো কথা ও গুজব আওয়াম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগসহ দলের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থক ও মুজিবনগরে অবস্থানরতদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস-সংশয় এবং নানা বিভ্রান্তি। যে কথাগুলো এতদিন

গোপন ছিল তা কলকাতার এপার বাংলার লোকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। স্বাধীনতা চাও—না মুজিবকে চাও? দুটি একসঙ্গে পাওয়া যাবে না। যে কোনো একটি পেতে হবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হোয়াইট হাউস পর্যন্ত বিশ্বসফর অসমাপ্ত রেখে দিল্লীতে ফিরে আসা, মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো এবং দিল্লী থেকে মুজিবনগর নেতৃবৃন্দের বিমর্ষ অবস্থায় কলকাতায় ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত গুজবের ঝড় বইছিল মুজিবনগরে। স্বাধীনতার প্রশ্নে এক কঠোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মুক্তিযুদ্ধকে আকাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়।

ওয়াশিংটন ফেরত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্রিফিং নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরে এসে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ যে কথাগুলো চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তা তখন রহস্যের পর্দা ভেদ করে বের হয়ে মুজিবনগরীদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। কথাগুলো ছিল এরকম মুজিবনগর সরকার যদি পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ভারতের সহায়তায় ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অটুট থাকেন তাহলে তাঁদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচার করে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। বাঙালিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক তারা কোনটি চায়। তারা কি শেখ মুজিবকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেতে চায়, না স্বাধীন বাংলাদেশ চায়? পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ করলে শেখ মুজিবকে ফিরে পাওয়া যাবে না। মুজিবকে ফিরে পেতে হলে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে। বাঙালিরা এখন ভেবে দেখুক, কোনটা তাদের বেশি প্রিয়। মুজিব না বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার অগ্নিশপথে বলীয়ান বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে পিশাচদের কী চমৎকার কূটকৌশল! সে সময় কলকাতার রাস্তায় এপার বাংলার স্বাধীনতাকামীদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলেই যে কথাটি প্রথম উচ্চারণ করতো, তা ছিল মুজিবকে চাও, না স্বাধীনতা চাও? মুজিবকে বাঁচাতে হলে স্বাধীনতার দাবি ছাড়তে হবে। আর স্বাধীনতা চাইলে মুজিবকে হারাতে হবে। কোনটা চাও? জনে জনে বিভ্রান্তি। কি চমৎকার কূটকৌশল। শত্রুদেশ পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলে সামরিক জান্তার ট্রাইব্যুনালে বিচারের কাঠগড়ায় ফাঁসীর রজ্জু কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, আর অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি। একের বিরুদ্ধে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বাংলার স্বাধীনতাপাগল মানুষকে বিভ্রান্ত করার কি সুন্দর চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হয়েছে !

পাকিস্তানে সামরিক জান্তার হাতে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকে জিম্মি করে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের সংকল্পকে তছনছ করে দেয়ার এক কূটিল চক্রান্ত মুজিবনগরের মুজিবভক্ত ও স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিলো বৈকি! বিভ্রান্তির কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে তৎকালীন আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুবলীগ ও শ্রমিক লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা হতাশায় দিশেহারা হয়ে

সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভের আশায় দলের উঁচু স্তরের নেতা ও মন্ত্রীদের কাছে ছুটে যেত পাগলের মতো। প্রকৃত অবস্থা কি এবং কি ঘটবে, তা জানার জন্যে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ছোটাছুটি করতো দলের প্রবীণ নেতাদের কাছে। মুজিবকে চাই, না স্বাধীনতা চাই এ প্রশ্নের কোনো সঠিক ও সুস্পষ্ট জবাব পেত না নেতাদের কাছ থেকে। সব নেতাই মুখে যেন তালা লাগিয়েছেন।

বিভ্রান্তি ও গুজব সাগরের অতলে নিমজ্জিত দ্বিতীয় সারির নেতা-কর্মীদের মধ্যে যাঁরা বড় নেতাদের কাছে থেকে জ্ঞান আহরণ করে আট নম্বর থিয়েটার রোডের দফতরে আসতেন তাঁদের কারও কারও কাছে শুনেছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী বলে দাবিদার মুজিবনগর সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর সিআইটি রোডস্থ বহুতল বাসভবনে বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা গিয়ে ঘুরঘুর করছে। মুজিব বলতে অজ্ঞান রামভক্ত হনুমানরূপী এই প্রবীণ নেতা দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের কাছে অশ্রুসজল কণ্ঠে মুজিবের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজের বিজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুজিবের প্রাণ রক্ষা করাই ঐতিহাসিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন, মুজিব ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশ কল্পনা করা যায় না। মুজিব ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও আমাদের মাঝে জীবন্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। দলের সর্বশক্তি এবং মিত্রদের সাহায্য-সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

॥ ছাব্বিশ ॥

কেউ কেউ বলেছেন, মুজিবনগর সরকারের এই মন্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব মেনে নেয়ার শর্তেও বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হায়েনাদের কবল থেকে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। কেউ এই শক্তিধর নেতার নামে এমন গুজবও ছড়িয়েছে যে, মুজিবভক্ত এই নেতা পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের শর্তে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে উদ্ধারের জন্যে মার্কিন পররাষ্ট্র সেক্রেটারী হেনরী কিসিঞ্জারের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। পাশাপাশি অতি সংগোপনে এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ও অন্যেরা শেখ মুজিবের জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশ স্বাধীন করতে চাচ্ছেন। এঁদের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অর্জনই বড়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিরে আসুন; এটা এঁরা চান না। এ ধরনের পরস্পরবিরোধী ও আত্মঘাতী গুজবে কলকাতা, আগরতলা, জলপাই-গুড়িসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে মুজিবনগরীদের ক্যাম্পগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কোনো কোনো অঞ্চলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। শুনেছি এ পরিস্থিতিতে আগরতলায় তাজউদ্দীনের অস্থায়ী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। আট নম্বর থিয়েটার রোডের দফতরে বসে আরও শুনেছি যে, এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে তাজউদ্দীন মন্ত্রীসভা রক্ষা পায়। এমন গল্পও শুনেছি যে, শ্রীমতী গান্ধী নাকি তাজউদ্দীন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উদ্যোক্তাদেরকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে কিংবা তাঁর রাজনৈতিক সচিবকে দিয়ে খুব শাসিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন

যে, ভারতের মাটিতে বসে এ ধরনের দলাদলি করতে দেয়া হবে না। মুজিবনগর সরকারের উত্থান-পতন ভারতীয় এলাকার মধ্যে থেকে করতে দেয়া হবে না। মুজিবনগর সরকারের উত্থান-পতন ঘটাতে এবং নতুন সরকার গঠন করতে হলে নিজ দেশে অর্থাৎ দখলীকৃত বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে করতে হবে। কেবল মানবিক কারণে বাংলাদেশের শরণার্থী ছাড়া ভারতের মাটিতে মুজিবনগরের বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে—একথা ভারত স্বীকার করে না। ভারতীয় সীমানার মধ্যে বিপ্লবী মুজিবনগর সরকারকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষায় বিশ্বাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত-বাংলাদেশ বৈরী অন্যান্য দেশ একথা জানতে পারলে বহির্বিশ্বে ভারতের কূটনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতও দায়িত্ব নিতে পারে না। এ জন্যেই ভারত তার সীমানার আওতায় বিপ্লবী মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করছে না এবং স্বীকার করবেও না। পাল্টা মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্যোক্তাদের এই তৎপরতার কেন্দ্র ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার আগরতলায়। মূল ভারত ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্নতার কারণে পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি পার্বত্য রাজ্য সম্পর্কে দিল্লী প্রশাসন সদা-সতর্ক থাকেন। দিল্লী থেকে দূরে ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের এ ধরনের কার্যকলাপ দিল্লী প্রশাসন মোটেই ভালো নজরে দেখছে না। এটা দিল্লীর জন্যে এক নতুন টেনশন।

এসব কারণেই দিল্লী সরকার বাংলাদেশের আশ্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় সীমানার মধ্যে পাল্টা মুজিবনগর সরকার গঠনের তৎপরতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি হননি।

মুজিবনগরের কথা চালাচালি করার লোকদের মুখে এমন কথাও শুনেছি যে, ইন্দিরা প্রশাসন নাকি পাল্টা মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্যোক্তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, ভারতের সীমানা ছেড়ে নিজেদের সীমানার মধ্যে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো। ভারতীয় সীমানার মধ্যে অবস্থান করে ভারতের সার্বিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকিমূলক এমন কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো যাবে না। ভারত তার সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনে শরণার্থীদেরকেও তার ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে কোনো দ্বিধা করবে না।

দিল্লী প্রশাসনের এই রক্তচক্ষু দেখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের নবীন-প্রবীণ এই অংশ তাদের পাল্টা সরকার গঠনের উদ্যোগ ও পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের এক ক্রান্তিলগ্নে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকার এভাবে অন্তর্ঘাতমূলক একটি অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়।

এরই মধ্যে একদিন রাতে আমরা কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। তাজউদ্দীন সাহেব অনেক দিন পর মুখ খুললেন। হাসির সঙ্গে বলে উঠলেন, কোনটা চাই? জীবিত মুজিবকে চাই, না স্বাধীন বাংলাদেশ চাই?

আমরা থমকে গেলাম। অবাক ও বিস্মিত হলাম। কি জবাব দেবো আমরা। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, কোনটা চাই।

তাজউদ্দীন সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমরা দুটোই চাই। মুজিবকেও চাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতাও চাই এবং আমরা ইনশাল্লাহ দুটোতেই কামিয়াব হবো। আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবো।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সব সেক্টরেই মোটামুটি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যে হতাশার ভাব কেটে গিয়ে জয়ের নেশা তীব্রতর হয়েছিল। কিন্তু হাতে ছিল না তাদের যুৎসই অস্ত্রশস্ত্র। সেক্টর কমান্ডারগণ কলকাতায় এলে জেনারেল ওসমানীকে চাপ দিতেন অস্ত্রের জন্যে। জেনারেল ওসমানীকে অস্ত্রের জন্যে সেক্টর কমান্ডারদের চাপ মোকাবিলা করতে হতো।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সেক্টর কমান্ডারদের এই চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি। অস্ত্রের সংকট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন অবহিত ছিলেন। কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বলতে গেলে নিরুপায়। অস্ত্রশস্ত্র তো মুজিবনগর সরকারের অধীনে মজুত ছিল না। তিনি বড়জোর ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাগাদা দিতে পারতেন, অনুরোধ করতে পারতেন অস্ত্রের জন্যে।

মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ছিলেন আরও বেশি অসহায় ও নিরুপায়। অস্ত্রের জন্যে সেক্টর কমান্ডারদের চাপ দিলে তিনি ছুটে যেতেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে। শুনেছি জেনারেল ওসমানী অস্ত্রের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করলে প্রধানমন্ত্রী খুবই বিব্রত বোধ করতেন। তিনি শুধু বলতেন, যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ জোরদার করুন। ভারী অস্ত্রশস্ত্রের যখন দরকার হবে তখন তার কোনো অভাব হবে না।

সিলেটের অধিবাসী জেনারেল ওসমানী বাংলায় গেরিলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না। সিলেটি উচ্চারণে তিনি বলতেন গরিলা যুদ্ধ। অস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নিরুৎসাহব্যঞ্জক কথায় জেনারেল সাহেব খুব খুশি হতে পারতেন না। তিনি খুবই বিমর্ষ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। সে উত্তেজনায় তিনি কেবল ছট্‌ফট্‌ করতেন, তবে অন্য কোনোভাবে তাঁর এই উত্তেজনা প্রকাশ পেত না।

॥ সাতাশ ॥

গেরিলা যুদ্ধের কোর্স অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করে বাংলার দুর্ধর্ষ সিংহশাবকরা সে সময় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করার মতো কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করেছিল। দেশমাতৃকাকে হানাদার বাহিনীর হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত করার দীপ্ত শপথে বলীয়ান আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এ সময়ে অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সুসংহত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের কৌশল ও দক্ষতা তারা করায়ত্ত করেছিল এবং সামগ্রিক যুদ্ধের উপর বঙ্গশার্দুলরা মোটামুটি তাদের কমান্ড প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকৃত বাংলাদেশের থানা সদর তো বটেই, হাটবাজার, এমন কি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলার অমিতবিক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দমনীয় গেরিলা আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সাধারণ মাইন, হাত বোমা এবং গোপন অবস্থান থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল কিংবা কাটা রাইফেল ও স্টেনগান দিয়ে হামলা

চালিয়ে কাগুজে-বাঘ পাকিস্তানী সৈন্যদের মনে কাঁপন ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তানের তথাকথিত বীর সেনারা কবে কোথায় যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলো তার কোনো উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তবে মার্শাল ল'জারি করে নিরস্ত্র নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করার কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ইতিহাস ছাড়া পেশাদার সৈনিক হিসেবে তাদের বীরত্বগাঁথার কোনো নজীর নেই। বৃটিশ-ভারতে এরা ছিল স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের দাবিয়ে রাখার এবং বৃটিশ প্রভুদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার বা যন্ত্র।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সৈনিকদের পেশার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিংবা দেশাত্মবোধের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কাজেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদীবোধ বর্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর কোনো নৈতিক মনোবল ছিল না। তারা একটি ভাড়াটে সেনাবাহিনী হিসেবে প্রভুর নির্দেশ পালন করেছিল। তাই তারা যুদ্ধের ব্যাপারে পাকিস্তান রক্ষার চেয়ে নিজের প্রাণ রক্ষাকে পহেলা নম্বরের ফরজ বলে মনে করেছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাচকা মারে পর্যুদস্ত হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হানাদার বাহিনীর সৈনিকরা ভয়ে সীমান্তবর্তী এলাকা ছেড়ে তাদের মূল ঘাঁটিতে সমবেত হতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে শত্রু বাহিনীর সৈন্যদের এক সঙ্গে পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের সেক্টর কমান্ডারগণ এ বিষয়টি জেনারেল ওসমানীর দফতরের নজরে এনেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ মুজিবনগরের সদর দফতরে এসে শত্রুসেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলার পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁরা জানান যে, এ সময় কিছু কামান, ট্যাংক, মেসিনগান, রকেট লাঞ্চার, এন্টি এয়ারক্রাফট গান, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হাতবোমা ইত্যাদি মাঝারি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে আমাদের নিয়মিত বাহিনীর সৈনিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দায় কিংবা শত্রুবাহিনীর ক্যাম্প ঘেরাও করে হামলা চালিয়ে এদেরকে জেলা সদর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হতো।

সেক্টর কমান্ডার মেজর সি আর দত্ত (পরে মেজর জেনারেল) জেনারেল ওসমানীকে জানিয়েছিলেন যে, কিছু হাইপাওয়ার মাইন, হাতবোমা, মাঝারি পাল্লার কামান আর এয়ার সাপোর্ট পাওয়া গেলে আমরা চারদিক থেকে শত্রুবাহিনীর ক্যাম্প ঘেরাও করে হামলা চালিয়ে তাদেরকে হতাহত এবং ক্যাম্প থেকে বিতারিত করতে পারবো। আমরা ওদের কনসেনট্রেশন ঘাঁটির উপর হামলা করার জন্যে এগিয়ে গেলে ওদের বিমানগুলো আমাদের উপর বোমাবর্ষণ করতে পারে। এই ভয়ে আমরা ওদেরকে ঘেরাও দিতে পারছি না। এখন সম্মুখযুদ্ধের সময়। তদুপরি ওদের কাছে রয়েছে মাঝারি রেঞ্জের কামান। আমরা তাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এটা টের পেলে ওরা আমাদের উপর কামান থেকে গোলাবর্ষণ করবে। এখন মাঝারি ধরনের অস্ত্র দিন আমাদেরকে। আমরা শত্রুদেরকে গ্রামাঞ্চল থেকে হটিয়ে জেলা শহরে ধাওয়া করে নিয়ে সেখানে তাদেরকে অবরোধ করে রাখবো। সারা গ্রামাঞ্চল হানাদার বাহিনীমুক্ত হয়ে যাবে। জেলা সদরের সঙ্গে ওদের সাপ্লাই লাইন আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেবো। স্যার, আপনারা আমাদেরকে কিছু অস্ত্র দিন। প্রধানমন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দকে বলুন জরুরী অস্ত্র দিতে।

সেক্টর কমান্ডারের তেজোদ্দীপ্ত কথা শুনে জেনারেল ওসমানী তীব্র উত্তেজনায় ফনা তোলা গোখরো সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছিলেন। ছটফট করছিলেন। তাঁর গোঁফগুলো উত্তেজনায় খাড়া হয়ে গিয়েছিল। দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছিল। সেক্টর কমান্ডারগণ এসে অস্ত্রের কথা তুললেই জেনারেল সাহেব কেমন অসহায় হয়ে পড়তেন। তিনি জানতেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে মাথা কুটলেও কোনো অস্ত্র পাওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী অস্ত্রের ব্যাপারে দিল্লী সরকারকে অবহিত করলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র হস্তান্তর করা হবে।

ভারত সরকারের অনুমতির পরও অস্ত্র পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে ভারত সরকারের কেন জানি কেমন রাখ-ঢাক ব্যাপার। এ ব্যাপারে তাদের মনোভাব স্পষ্ট ছিল না—কেমন যেন রহস্যময়।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক গতি পরিবর্তনের এবং আকাঙ্ক্ষিত বিজয় করায়ত্ত করার এক মাহেন্দ্রক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের অক্ষমতার বেদনায় জেনারেল ওসমানী ছটফট করতেন। কিন্তু এই অক্ষমতার কথা কাউকে বলারও ছিল না। রুদ্ধদ্বার অফিসে পরম নিরাপদে বসে একজন বর্ষীয়ান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কেরানীর মতো কেবল ফাইল ওয়ার্ক ছাড়া তাঁর আর যে কিছু করণীয় ছিল না, তা বুঝতে কারো কষ্ট হয়নি।

একদিন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তার দফতরের রণ প্রচার কুশলী কর্নেল রিখী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, কর্নেল সাহেব কবে তক আমরা দেশে ফিরে যেতে পারবো বলে আপনার ধারণা?

কর্নেল রিখী একটু হেসে বললেন, সবুর করো। নিজেরা যেদিন তোমাদের মুসলমান ভাই দখলদার সৈন্যদেরকে তোমাদের মাটি থেকে উৎখাত করতে পারবে, সেদিনই দেশে ফিরতে পারবে বীরবেশে। দেশ স্বাধীন করতে এসেছো। ধৈর্য ধরতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে। এত অধৈর্য হলে চলবে না। অধৈর্য হলে তো আর বিজয় আসবে না। এবার তুমি শোনাও তোমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কতদূর অগ্রসর হয়েছে। দেশের ভেতরে কতদূর সীমানা দখল করেছে?

আমি বললাম, বাংলাদেশের কেবল জেলা সদর এলাকা বাদে সারা গ্রামাঞ্চলই আমাদের দখলে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দমনীয় আক্রমণে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত পাকিস্তানী সেনারা কেবল জেলা সদর এবং কোনো কোনো এলাকায় থানা সদরে অবস্থান করছে। এখন আমরা তাদেরকে আক্রমণ করতে পারছি না অস্ত্রের অভাবে। সাধারণ গ্রেনেড, থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে তো পাকিস্তানীদের মোকাবিলা করা যাবে না।

আমাদের কয়েকজন সেক্টর কমান্ডারের কাছে শুনেছি, এখন মাঝারি পাল্লার কামান, এন্টি-এয়ারক্রাফট, অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা, মেশিনগান ইত্যাদি বড় ধরনের অস্ত্র হলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জনগণকে নিয়ে থানা বা জেলা সদর অবরোধ করে তাদের আক্রমণ করতে পারতো। এতে দখলদার বাহিনী থানা সদর ও জেলা সদর ছেড়ে দিয়ে নিকটস্থ ব্যারাকে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। কিন্তু তা হতে পারছে না অস্ত্রের

অভাবে। শুনেছি আপনাদের সরকার আমাদেরকে সেরকম অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছেন না। এভাবে কতদিন তারা আমাদেরকে ভারতের মাটিতে বসিয়ে খাওয়াবে?

কর্নেল রিখী একটু হেসে বললেন, নজরুল সাহেব তো দেখছি যুদ্ধ সম্পর্কে বেশি এক্সপার্ট হয়ে গেছেন। খুব বড় বাকওয়াজ হয়ে গেছেন।

আমার কাছে মনে হয়েছে, কর্নেল রিখী আমাকে উপহাস করছেন। আমি লজ্জিত হয়ে চুপ করে বসে রইলাম তাঁর সামনে। আর কি কথা বলবো তা খুঁজে পেলাম না। আমার হতাশা আঁচ করতে পেরে কর্নেল রিখী নীরবতার ছেদ ঘটালেন। বললেন, নজরুল! তোমাদেরকে ভালো অস্ত্র না দেয়ার জন্যে আমাদেরকে অভিযুক্ত করছো। তোমাদেরকে বড় অস্ত্রশস্ত্র দিলে তোমরা তা রাখবে কোথায়? গোলাবারুদ, এন্টি এয়ারক্রাফট, কামান, ট্যাংক ইত্যাদি বড় বড় অস্ত্র দিলে তোমাদের পাকিস্তানী ভাইয়েরা তা কেড়ে নিয়ে যাবে। শুধু ঘেরাও করে তাদেরকে তোমরা কাবু করতে পারবে না। তাদের বেসের উপর বিমান হামলা চালাতে হবে। ট্যাংক নিয়ে হামলা চালাতে হবে নিচ থেকে। কিন্তু তোমরা যুদ্ধবিমান চালাবে কোথা থেকে? যুদ্ধবিমান কোথায়? অপারেট করতে তোমাদের ঘাঁটি থাকতে হবে। তোমাদের বিমান-যোদ্ধা থাকলে কি হবে? তাঁরা বোঝেন, শুধু বিমান হলে চলবে না। যুদ্ধবিমান চালাবার জন্যে শক্তিশালী গ্রাউন্ড বেস অর্থাৎ সংকেত ব্যবস্থা, যুদ্ধবিমানের জন্যে ফুয়েলিং ব্যবস্থা, বিমান থেকে ব্যবহারযোগ্য বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদের মওজুদ, বিমান ঘাঁটিতে উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্র ও অন্যান্য রসদ সবই বিমান ঘাঁটিতে থাকতে হবে। শুধু থাকলেই চলবে না, এ সবের উপর তোমাদের বিমানবাহিনী কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বও থাকতে হবে।

তোমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জেলা বা থানা সদরে পাকিস্তানীদের বেস-এর উপর হামলা চালাতে গেলে তাদের পেছনে ট্যাংকসহ শক্তিশালী গোলন্দাজ সাপোর্ট থাকতে হবে। গোলান্দাজ সাপোর্টের জন্যে যে সব রসদ লাগবে তা তো তোমাদের মুঠোর মধ্যে নেই। পাকিস্তানী বাহিনীর বেস-এর দিকে অগ্রসরমান মুক্তিযোদ্ধাদের সম্ভাব্য পাকিস্তানী বিমান হামলা মোকাবিলার জন্যে শক্তিশালী মাউন্টেড এন্টি-এয়ারক্রাফট লাগবে, তেমনি মাথার উপর এয়ার আমব্রেলা থাকতে হবে। এসব তোমরা পাবে কোথায়? নজরুল, তোমাদের জেনারেলও এসব জানেন। এসব তোমাদেরকে দিলেও তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না সম্পূর্ণ ব্যবস্থার উপর তোমাদের নিজেদের নিরংকুশ কমান্ড না থাকলে। তোমাদের নেতৃবৃন্দ এবং তোমার বস জেনারেল সাহেব জানেন, পাকিস্তানী বাহিনীর উপর মুখোমুখি সার্বিক আক্রমণ চালাবার জন্যে বিপুল সামরিক সরঞ্জাম, নগদ অর্থ, উপকরণ, এতদসংক্রান্ত যাবতীয় সম্পদের ওপর একক কমান্ড থাকতে হবে সম্মুখযুদ্ধের জন্য। এটা অন্যকে দেয়ার বা অন্য দেশের লোকের হাতে হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং তা ন্যস্ত করা সম্ভবও নয়। তাই বলছি, শুধু সামান্য কিছু অস্ত্র দিলেই হবে না। পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হলে এজন্যে সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে নামতে হবে। আংশিকভাবে কিছু করতে গেলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এ ধরনের কিছু করতে গেলে তা হবে হঠকারিতা।

এধরনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে দু'দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া তা সম্ভব হবে না। তবে তোমার–আমার এসব নিয়ে

চিন্তাভাবনা করার কিছু নেই। এটা আমাদের আওতাবহির্ভূত ও অনধিকার চর্চা। যাঁরা সর্বোচ্চ দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন না মনে করলে তা হবে নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার সমতুল্য। তুমি এত সব নিয়ে ভাবছো কেন? তোমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত, সেটা কি করে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে পালন করা যায়, তুমি তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো। একটা যুদ্ধ করতে কি কি দরকার হয় তা জানতে চাইলে সেটা আমি তোমাকে জানাতে পারবো এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অনুযায়ী। যুদ্ধে কখন কি অস্ত্র লাগবে, তা নির্ণয় করার যুদ্ধবিশারদ আমি নই। বিশারদ তাঁরাই যাঁরা বাস্তবে রণক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ নেন। তারাই বলতে ও বুঝতে পারেন কোনটা কখন যুদ্ধের অস্ত্র। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় অস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়। কাজেই তোমাদের কখন কি অস্ত্র জোগাতে হবে তা তোমাদের যোদ্ধারা বলতে পারবেন এবং তাঁরাই তা স্থির করবেন।

যুদ্ধের সময় তুমি এবং আমি যে কাজ করছি, কিংবা একজন নার্স ও ডাক্তার যে কাজ করছেন তা কি যুদ্ধ নয়? তা কি এক রকম অস্ত্র নয়? যে ড্রাইভার অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের বহন করছে, কিংবা সৈন্য ও রসদ সরবরাহের রাস্তা তৈরি করছে সে কি সৈনিক নয়? তারা যা করছে তা কি যুদ্ধের অস্ত্র নয়? অতএব, এসব অনধিকার চর্চা ছেড়ে আপন কাজে মনোযোগ দাও।

আমি খুবই লজ্জিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার চিন্তা-চেতনা এভাবে গঠিত হয়েছে। অভ্যস্ত হয়ে গেছি এভাবে চিন্তা করতে। শৈশব থেকে সামরিক শাসন ও সামরিক নেতৃত্ব দেখতে দেখতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিংবা দেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন, একথা চিন্তায় আসতেও পারেনি। সে পথও কঠোর সামরিক আইন আর কার্ফ্যু জারি করে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। দেখেছি সামরিক নেতৃত্ব। চিন্তা-চেতনা তো তাকে ঘিরেই। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার সুযোগ হয়নি। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিন্দা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শিখেছি, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দেশের স্বার্থবিরোধী বলে সামরিক শাসনকর্তার বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে শুনেছি। একমাত্র দেশপ্রেমিক সামরিক শাসনকর্তা—তিনিই দেশের একমাত্র রক্ষক। তিনি দেশ রক্ষা না করলে দেশ থাকবে না। এসব চিন্তা করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে সামরিক নেতৃত্বমুখী মন-মানসিকতা ও আস্থা গড়ে উঠেছে। তাই তো অস্ত্রের কথা আমরা চিন্তা করছি। বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমাদের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব রয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে চিন্তা-ভাবনা করছেন, তা যেন আস্থায় আনতে পারছি না। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড কাউন্সিলের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখী তো সামরিক নেতৃত্ব দেখেননি। দেখেছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে অনুগত সামরিক নেতৃত্ব। তাদের সর্বাধিনায়ক তো সেনাবাহিনীর কোনো জেনারেল নন। তাঁদের সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট—যাঁর ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সীমিত। আর আমরা দেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দেখে অভ্যস্ত হয়েছি সেনাবাহিনীর জেনারেলকে। এসব দেখে দেখে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে গেছি। আমাদেরকে চিন্তা করতে শেখানো হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানেই দুর্নীতিপরায়ণ, বিদেশি দালাল, বেঈমান ইত্যাদি। আর সামরিক নেতা মানেই ফেরেশতাতুল্য। সাধু সন্ন্যাসী।

কর্নেল রিখী আর আমার চিন্তা-চেতনার মধ্যে কত তফাৎ। তাই তো বলতে পারলেন, অস্ত্রশস্ত্রের চিন্তা-ভাবনা তোমার-আমার কাজ নয়। এটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক্তিয়ার। আমি এ চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী কেন হতে পারিনি, কেন এ চিন্তা-চেতনায় অধিকারী হতে পারিনি, এ প্রশ্ন তীক্ষ্ণ তীরের মতো মনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিদ্ধ করছিল।

॥ আঠাশ ॥

স্বাধীনতা চাই, না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চাই—এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নে কলকাতায় মুজিবনগরীদের মধ্যে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল ঘনীভূত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্র লীগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের একটি অংশ শেখ মুজিব ও স্বাধীনতার দাবিকে একটি অপরটির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রেনেড, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের চেয়ে আরও শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের অভাবের কারণে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে মুজিবনগর সরকারের দৃশ্যমান তৎপরতাহীনতায় সৃষ্ট হাতশার অন্ধকারের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বড় রকম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছিল।

সিদ্ধান্ত হয় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশ আহ্বান করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ব্যাপারে রাজনৈতিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই কাউন্সিল অধিবেশনে দলের কাউন্সিল ছাড়াও নির্বাহী কমিটির সদস্য, পাকিস্তান-কাঠামোর মধ্যে '৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএদেরকে উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করা হবে। কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বসে শুনেছিলাম দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের একমাত্র মালিক কাউন্সিল ডাকার এই পরামর্শ দিয়েছিল দিল্লীর ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক মহল। 'পূর্ববাংলার' জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসলে কি চান সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এবং এই সিদ্ধান্ত দিল্লীর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে লিখিত আকারে জানানোর জন্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় শহর শিলিগুড়িতে এক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে এই কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হবে। কলকাতা, ত্রিপুরার আগরতলা, আসামের গৌহাটিসহ বাংলাদেশের চারপাশে ভারতের পূর্বাঞ্চালীয় রাজ্যের শহরগুলোতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতা, আওয়ামী লীগ দলীয় তৎকালীন এমএনএ ও এমপিএ-দের একত্রিত করার জন্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থানরত এমএনএ ও এমপিএ-দেরকে কাউন্সিল অধিবেশনে হাজির করার জন্য। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর শহরগুলোতে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে চলে ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা। চলে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট ইস্যু ও নেতৃত্বভিত্তিক রাজনৈতিক মেরুকরণের জোর তৎপরতা। কলকাতায় মুজিবনগরী বাঙালিদের মুখে মুখে একই কথা—চলো চলো শিলিগুড়ি চলো। শিলিগুড়িতে হবে চূড়ান্ত সমাধান। নেতৃত্ব, অস্ত্র আর বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার ফয়সালা হবে শিলিগুড়িতে।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যেও বাঙালিদের মুখে ফুটে ওঠে আশার উদ্দীপ্ত আলো। সকলের দৃষ্টি এখন শিলিগুড়ি কনফারেন্সের উপর নিবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সদর দফতরে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে একই কথা, সবুর করো। শিলিগুড়ি কাউন্সিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শিলিগুড়ি কনফারেন্সের পর যুদ্ধ শুরু হবে। অস্ত্র পাওয়া যাবে। স্বাধীন দেশে ফিরতে পারবে ইত্যাদি কথাবার্তা সবার মুখে মুখে।

আওয়ামী লীগেরই কোনো কোনো মহলে আবার উল্টো কথাও শোনা গেল। শিলিগুড়ি কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে রদবদল আসবে। মুজিবনগর সরকারেও রদবদল হবে। বঙ্গবন্ধুকে আগে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনার পর স্বাধীনতা যুদ্ধ জোরদার করা হবে। এমন কথাও বলা হলো যে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে এলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দেবে। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হবে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, কিসিঞ্জার সব ফয়সালা করে দেবেন। অযথা রক্তপাত করে লাভ হবে না কোনো। পাকিস্তানী সৈন্যরা যেভাবে মানুষ মারছে ও বাড়িঘরে আগুন দিচ্ছে, তাতে বাংলাদেশে অবস্থানরত মানুষ ভীত ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে চলে যাবে। বেশিদিন যুদ্ধ চললে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের এই জোয়ার টিকিয়ে রাখা যাবে না। আগে তো মানুষ বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষই যদি বেঁচে থাকতে না পারলো তাহলে স্বাধীনতা কার জন্যে? তাহলে স্বাধীনতা দিয়ে কি হবে? তাজউদ্দীন ভুল পথে অসগ্রর হচ্ছেন, তাজউদ্দীন ভুল করছেন। এভাবে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে না ইত্যাদি কথার অভাব ছিল না। আশার আলোর মাঝখানেও উৎকণ্ঠার কালোমেঘের ছায়া যেন শিলিগুড়ির উপর দিয়ে বয়ে চলছিল।

এদিকে, মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে তৎকালীন এমএনএ এমপিএগণ কলকাতায় গিয়ে হাজির হচ্ছেন। যারা অধিকৃত এলাকায় গোপনে অবস্থান করছেন তাঁদের উপর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মুক্ত এলাকায় চলে আসার জন্যে। এ জন্যে নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হয়, যেন এই সময়সীমার মধ্যে মুক্ত এলাকায় ফিরে আসেন তাঁরা। এ সময়সীমার মধ্যে যেসব এমএনএ ও এমপিএ মুক্ত এলাকায় ফিরে না আসবেন তাঁদেরকে হানাদার বাহিনীর দোসর বলে চিহ্নিত করা হবে। এবং তাঁদের আওয়ামী লীগের সদস্যপদ এমএনএ এবং এমপিএ-এর পদ বাতিল বলে গণ্য করা হবে। পত্র-পত্রিকা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মারফতও একথা ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় দেশের ভেতরে অবস্থানরত এমএনএ এমপিএগণকে প্রয়োজন বোধে ধরে মুক্ত এলাকায় নিয়ে আসার জন্যে। কোনো এমএনএও এমপিএ মুক্ত এলাকায় না আসতে চাইলে কিংবা দখলদার বাহিনীর সঙ্গে কোনো রকম সহযোগিতা করলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

॥ উনত্রিশ ॥

দিল্লীসহ সবাই তাকিয়েছিল আওয়ামী লীগের শিলিগুড়ি কনফারেন্সের দিকে, কি সিদ্ধান্ত হয় তা জানার জন্যে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমএনএ, এমপিএ, দলের নির্বাহী সংসদ কাউন্সিল সদস্যদের যৌথ এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোভুক্ত থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফিরিয়ে আনার উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে। কলকাতার মুজিবনগরীদের মধ্যে ঘনীভূত বিভ্রান্তি, হতাশা, আশা ইত্যাদির এক অবিমিশ্র প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি।
কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের দফতরে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, এমএনএ ও এমপিএদের আনাগোনা, লবি পাল্টা লবি বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নানা রকম বুদ্ধি ও জ্ঞানদান করছেন। একই তৎপরতা পাশে জেনারেল ওসমানীর দফতরে। সিলেটের আওয়ামী লীগ দলীয় রাজনীতিকরা ভিড় করছেন, পরামর্শ করছেন, পরামর্শ নিচ্ছেন। পারস্পরিক রাজনৈতিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বিনিময়ের মহাসমারোহ। শুনেছি অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীর দফতরেও লোকজনের আনাগোনার অভাব ছিল না। এমনকি লন্ডন, প্যারিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশে অবস্থানকারী বাঙালি উঠতি অভিজাত বুদ্ধিজীবী হিতাকাঙ্ক্ষীরাও উড়ে এসেছিলেন কলকাতায়। মুজিবনগর সরকারের করণীয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিদানের জন্যে। অবশ্য এদের অনেককেই ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ত্রিসীমানায় কোনোদিন একজন সাংবাদিক হিসেবে দেখতে পাইনি! তবে হয়ত আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে পরিচয়-যোগাযোগ থাকতে পারে। কারণ, এই শ্রেণীটা যখন যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সিঁড়িতে উঠতি অবস্থায় থাকেন তাঁদের সঙ্গে একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটা দেখার অভিজ্ঞতা আমার ছিল ঢাকার রাজনৈতিক জগতে।

মুজিবনগরে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতাকামী বাঙালির জীবন-মরণ প্রশ্নে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে বিদেশ থেকে উড়ে আসা এই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আনাগোনা, ফিসফিস করে কথা বলা, বুদ্ধি-জ্ঞান বিতরণের এই তৎপরতা দেখে আমার মতো চুনোপুঁটি প্রাণী ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে মরছিলাম এবং নিজেকে খুবই অসহায় মনে করেছিলাম। মাঝে মাঝে নিজেকেও যে একজন বুদ্ধিজীবী কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করিনি তা নয়। চরম বিপদে দিশেহারা ব্যক্তির হিতাকাঙ্ক্ষীর অযাচিত পরামর্শদাতার অভাব হয় না। আজ সত্যি দুঃখ এবং লজ্জায় মুখ লুকোতে চাই। এখন মনে করি যে, সেদিন রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মাঝে মাঝে আস্থা হারিয়ে নিজেকেও একজন বড় বুদ্ধিমান এবং নেতাদেরকে বুদ্ধি দেয়ার মতো বিজ্ঞ বলে মনে করতাম। আমার মতো একজন চুনোপুঁটিও নিজেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করিনি!

এ পরিস্থিতিতে আমার মতো ব্যক্তির সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা না বলায় কিংবা পরামর্শ না করার জন্যে মাঝেমধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কিংবা জেনারেল ওসমানীর উপর রাগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হতো না, তা নয়। কিন্তু শিলিগুড়ি কনফারেন্সের

ইতিবাচক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পর আমার ইচ্ছে হয়েছিলো নেতৃত্বকে অসহায় মনে করার অপরাধের জন্যে এবং নিজেকে একজন বিজ্ঞ বলে মনে করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কিংবা জেনারেল ওসমানীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে শত সহস্রবার ক্ষমা চাই। নেতৃত্ব সম্পর্কে আমার মতো ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির এ ধরনের ধারণার অপরাধবোধ আমাকে অনুতপ্ত করেছিল। সর্বদা অনুশোচনার অদৃশ্য অনলে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলাম। অপরাধবোধ আর অনুশোচনা আমার টুটি চেপে ধরছিলো বারবার। কেমনভাবে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় সে সম্পর্কেও ভাবছিলাম।

এরপর থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং জেনারেল ওসমানীর সামনে যেতে খুব লজ্জাবোধ করতাম। বিশেষ করে তাজউদ্দীন সাহেবের সামনে যেতে আমি সাহস পেতাম না। তবে একদিন চট করে মাথায় এক বুদ্ধি এসে যায়। কলকাতার নিউমার্কেট থেকে বলা নেই কওয়া নেই লাল গোলাপ ও পদ্মফুল দিয়ে তৈরি একটি তোড়া কিনে এনে জেনারেল ওসমানীর রুমে ঢুকে তাঁর সামনে গিয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়ালাম। কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই জেনারেল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত থেকে ফুলের তোড়াটি হাত বাড়িয়ে নিলেন। গোঁফের নিচ দিয়ে তাঁর মুখে সে সময় হাসির একটি রেখা দেখতে পেয়েছিলাম। আবেগে বাক আমার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলো। মনে হয়েছিলো জেনারেল ওসমানী ফুলের তোড়াটি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে অপরাধ ও গ্লানির উত্তপ্ত জ্বর ছেড়ে গিয়ে যেন বসন্তের এক স্নিগ্ধ হাওয়া আমার সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে চলছিল। আমি আর জেনারেল ওসমানীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। অশ্রু মুছতে মুছতে বের হয়ে পড়েছিলাম।

শিলিগুড়ি কনফারেন্সে আমার যাওয়ার আদৌ কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবু মনের মধ্যে আশা উঁকি মেরে উঠেছিল, জেনারেল ওসমানী বোধ হয় আমাকে সঙ্গে নিতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের আমাকে নেয়ার কিংবা যেতে বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর একান্ত রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলীকেও একটিবার বলেননি তাঁর সঙ্গে শিলিগুড়ি কনফারেন্সে যেতে। আর জেনারেল ওসমানীও তাঁর চৌকস এডিসি ক্যাপ্টেন নূরকেও সঙ্গে নেননি শিলিগুড়ি কনফারেন্সে।

কলকাতা থেকে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ সব শিলিগুড়ি চলে গেছেন। কলকাতা মহানগরী ও মুজিবনগর সরকারের দফতর মুজিবনগরীদের অনুপস্থিতিতে খাঁখাঁ করছে। আমরা যে-সব হতভাগা কলকাতায় পড়েছিলাম, তারা মনে করতাম যেন এক মহা পুণ্যব্রত পালন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদেরকে মনে করতাম পরম সৌভাগ্যবান, পুণ্যবান। আমাদের কেবল প্রাণটি পড়েছিলো কলকাতায়। প্রাণমন চিন্তা-চেতনা উড়ে গিয়েছিলো শিলিগুড়ি কনফারেন্সে। সর্বক্ষণ ভাবতাম, হায় শিলিগুড়ি কনফারেন্স না জানি কি রেখেছে আমাদের কপালে। পলাশীর আম্রকুঞ্জে ডুবে যাওয়া হতভাগা বাঙালির স্বাধীনতাসূর্য আবার শিলিগুড়িতে কালো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বাংলার আকাশে উদয় হোক, এই ছিল সকলের কামনা। বস্তুত শিলিগুড়ি আমার কাছে মনে হয়েছিলো এক তীর্থস্থান।

বৈচিত্র্যময় ভারতের পাহাড়ঘেঁষা প্রকৃতির আরেক লীলাভূমি শিলিগুড়িকে দেখার আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার আগ্রহ। কেমন করে

একটি ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, কেমন করে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কেমন করে স্বাধীনতার অগ্নিপুরুষ বাংলার নেতাদের মুখ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে বাণী উচ্চারিত হয়। মুজিবকে বাঁচাবো—না জাতিকে বাঁচাবো, মুজিবকে ফিরিয়ে আনবো, না বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনবো? হিমালয়ের মতো দুর্লঙ্ঘনীয় এই অবাঞ্ছিত বিতর্কের কেমন করে ফয়সালা হয় সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি দেখার জন্যে প্রাণমন সর্বক্ষণ আকুলি-বিকুলি করতো কলকাতায় বসে। ঢাকায় থাকার সময় কলকাতা এক স্বপ্নের শহর মনে হলেও সে মুহূর্তে কলকাতা এক বিষাক্ত ও শ্বাসরুদ্ধকর নগরী বলে মনে হয়েছে। মনে হতো পাখা থাকলে শিলিগুড়ি উড়ে যেতাম। কলকাতা শহর থেকে শিলিগুড়ি কোন্ দিকে তা জানা ছিল না, তবু কলকাতার উত্তর-পূর্ব আকাশের দিকে দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ থাকতো। কান খাড়া থাকতো আট নম্বর থিয়েটার রোডে শিলিগুড়ি থেকে কোন খবর আসে তা জানার জন্যে।

॥ ত্রিশ ॥

শিলিগুড়ি কনফারেন্স পলাশীর মতো বাঙালিদের সঙ্গে পরিহাস করেনি। এ কনফারেন্সে আওয়ামী লীগের যৌথ কাউন্সিল সভা বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন এবং ৭১-এর ১০ এপ্রিল মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শিলিগুড়ি থেকে নেতৃবৃন্দ বিজয়ীর বেশে কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে অনাবিল আনন্দের হাওয়া। সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে দেয় শিলিগুড়ি কনফারেন্সের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

কলকাতার ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে খুশির আমেজ। ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধবিশারদদের মতে শিলিগুড়ি কনফারেন্সের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মুজিবনগর সরকারকে একটি অনিবার্য সংঘাত এবং বাংলাদেশকে নিজেদের মধ্যকার একটি অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের রাজনৈতিক সহকর্মীরা কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁদের মুখে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক নেপথ্য কথা শুনেছি।

বঙ্গবন্ধুকে চাই, না স্বাধীনতা চাই—এই অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক শিলিগুড়ি কনফারেন্সেও উঠেছিল। এ নিয়ে কাউন্সিল অধিবেশনে স্লোগানও নাকি উঠেছিল। অধিবেশনের সভাপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে আগে ফিরিয়ে আনার প্রচণ্ড দাবির প্রবল স্রোতের মধ্যে কোন কথা বলে কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন এই ভয়ে প্রথমে মুখ খুলতেই ভরসা পাননি। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছেন। মুখ তাঁদের শুকিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নাকি সাহস করে প্রথম মুখ খুলেছিলেন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছিলেন কনফারেন্সে।

শুনেছি আওয়ামী লীগের তখনকার সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ সেদিন অকপটে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন যে, আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা পেলেই বঙ্গবন্ধুকে

আমাদের মাঝে পাবো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে যদি, খোদা না করুন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হয় পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে, তাহলে বঙ্গবন্ধু শহীদ হয়েও স্বাধীন বাঙালি জাতির ইতিহাসে অমর ও চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। তিনি একটি নতুন জাতির জনক হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত হবেন। ব্যক্তি মুজিব, ব্যক্তি সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীন, মনসুর আলী, মোশতাক, কামরুজ্জামান কেউ বেঁচে থাকবেন না। একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে। বঙ্গবন্ধুকেও মরতে হবে। আমরা কেউ চিরদিন বেঁচে থাকবো না।

আল্লাহর পিয়ারা দোশত, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-ও চিরদিন বেঁচে থাকেননি। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় আজ পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তেমনি, আমরা যদি বাঙালিকে একটি জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, আমরা যদি বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক আরেকটি রাষ্ট্রের মানচিত্র স্থাপন করতে পারি, তাহলে সেই স্বাধীন জাতি এবং নতুন রাষ্ট্রের মানচিত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রভাতসূর্যের মতোই উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে।

আমরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে যার যার পথে ভারতে চলে আসি, তখন কিন্তু জানতাম না বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন, না শহীদ হয়েছেন। ভারতে এসে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমিও জানতাম না সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী কিংবা হেনা সাহেব (কামরুজ্জামান) জীবিত আছেন কিনা। আমি নিজেও বাঁচতে পারবো এ কথাটি একবারও ভাবতে পারিনি। এখানে আসার পর, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ঘোষণা না করেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের কাছে বন্দী রয়েছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমিও মনে করতে পারিনি যে তিনি জীবিত আছেন। পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর কামান, বন্দুক, ট্যাংক, মেশিনগানের গোলাগুলির মধ্যে বঙ্গবন্ধু আর বেঁচে নেই— একথা ভেবে এবং সম্ভবত মেনে নিয়েই তো আমরা নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে চলে এসেছি।

বঙ্গবন্ধু আজীবন রাজনীতি করেছিলেন, জেলে থেকেছেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন দেশের জন্যে জীবন দিতে। তিনি নিজেও বারবার বাংলার পথে প্রান্তরে বলেছেন, বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে তিনি জীবন দিতে কুণ্ঠিত নন। আজ যদি বঙ্গবন্ধু মুজিবের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পাই, তাহলে সেই স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যেই আমরা পাবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। আমি নিশ্চিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিছুতেই পাকিস্তানীদের কাছে তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে কোনো আপোস করবেন না, আত্মসমর্পণ করবেন না, এবং করতে পারেন না। এটাই আমার প্রথম এবং শেষ বিশ্বাস।

বাংলাদেশ যদি আজ এত রক্তের বিনিময়েও স্বাধীন না হয়, তাহলে এই বাংলাদেশ চিরদিনের জন্যে পাকিস্তানী দখলদারদের দাস ও গোলাম হয়ে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানীর মর্যাদাও বাঙালি কোনোদিন আর পাকিস্তানীদের কাছে পাবে না। প্রভুভক্ত প্রাণীর মতো আমরা যতই আনুগত্যের লেজ নাড়ি না কেন, পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে আর বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর এই

অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েও আসেন, তবু তিনি হবেন পাকিস্তানের গোলামীর জিঞ্জির পরানো এক গোলাম মুজিব।

বাংলাদেশের জনগণ কোনোদিন সেই গোলাম শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলে গ্রহণ করবে না, মেনে নেবে না। আমার স্থির বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানীদের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। বাঙালি জাতির গলায় গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তিনি নিজে বরং ফাঁসীর রজ্জু গলায় তুলে নেবেন হাসিমুখে। এটাই আমার বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এটাই আমার ঈমান। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোনো বিকল্প নেই। বাঙালিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই, বঙ্গবন্ধু মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, আর কোনো পরিচয় নেই। স্বাধীন বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। পরাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন না। গোলামের পরিচয় নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসবেন না কোনোদিন। জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করবো। পরাধীন দেশের মাটিতে আমার লাশও যেন ফিরে না যায় সে জন্যে জীবিতদের কাছে আর্জি রেখে যাই। আমার শেষকথা, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা বাংলার মাটিকে দখলদার মুক্ত করবো। বাংলার মুক্ত মাটিতে মুক্ত মানুষ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আমরা ফিরিয়ে আনবো। মুজিব স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসবেন এবং তাঁকে আমরা জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো ইনশাআল্লাহ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণ রক্ষার জন্যে বিশ্ব-মানবতার কাছে আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের এই আবেগময় ভাষণের পর জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে শিলিগুড়ি কনফারেন্স গর্জে উঠেছিল। শিলিগুড়ির আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। এরপর সব নেতারই এই একই ভাষায় তাঁদের তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন। এভাবেই নিষ্পত্তি হয় একটি বিভ্রান্তিমূলক ও আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের।

॥ একত্রিশ ॥

কারো কারো মতে, শিলিগুড়ি কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক। কারণ শিলিগুড়ি কনফারেন্সেই আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৭০-এর নির্বাচিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সদস্যগণ মুজিবনগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। শিলিগুড়ি কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ঐতিহাসিক প্রস্তাবে অধিকৃত বাংলাদেশকে হানাদার বাহিনীমুক্ত করার লক্ষ্যে যে কোনো কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিঃশর্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

শিলিগুড়ি কনফারেন্সে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ একটি ঐতিহাসিক দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, অধিকৃত বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে নিজ পরিচয়ে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে জনগণের নির্বাচিত এই প্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার পরিগণিত হবে। অধিকৃত বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কোনো সরকার গঠন করা হলে সেটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার বলে গ্রহণ করা কিংবা মেনে নেয়া হবে না।

ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক দলিল। শুনেছি এ ধরনের একটি দলিল রচনায় বুদ্ধি এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন তখনকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ রাজনৈতিক সচিব ডিপি ধর। শিলিগুড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের এই কনফারেন্সের সময় নাকি মিস্টার ডিপি ধর শিলিগুড়িতে অবস্থান করছিলেন। ভারতের কলকাতা, আগরতলার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর ফেলে শিলিগুড়িকে বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স অনুষ্ঠানের জন্যে স্থান নির্বাচনের নেপথ্যেও ছিল শ্রী ডিপি ধরের একটি অদৃশ্য ভূমিকা। এ ব্যাপারে আরো যিনি নেপথ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি হলেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা কুমিল্লার কাজী জহিরুল কাইয়ুম। শুনেছি কাজী জহিরুল কাইয়ুম নাকি তাজউদ্দীন আহমদের ডান হাত ছিলেন। কুমিল্লারই আরেক আওয়ামী ব্যক্তিত্ব ও মুজিবনগর সরকারের এক মন্ত্রী নাকি চেয়েছিলেন আগরতলায় তাঁদের সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করা হোক। দিল্লী প্রশাসনও নাকি আগরতলায় এমন একটি ঐতিহাসিক কনফারেন্স করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কাজী জহিরুল কাইয়ুম থাকতেন তাঁর চাচা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের এককালের প্রভাবশালী সদস্য নবাব মোশাররফ হোসেনের পার্ক সার্কাসের নিকটবর্তী উড রোডস্থ বাসায়। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সাবেক পূর্ববঙ্গের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা ভারতে চলে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই নাকি পার্ক সার্কাস এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। কলকাতা নিবাসী অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সাবেক পূর্ববঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিক সমর্থন ও সহায়তা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। অবিভক্ত ভারতে সাবেক পূর্ববঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস যাঁরা করতেন কিংবা তাঁরা এখন কোথায় আছেন, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। তবে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কোর্স করতে গিয়ে সাবেক পূর্ববঙ্গীয় রাজনীতির অনেক অজানা তথ্য জানার এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় রাজনীতির অনেক দিকপালের নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শুনেছি কুমিল্লার চিওড়ার কাজী বাড়ির বিখ্যাত নবাব মোশাররফ হোসেন ভারতীয় কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি নাকি ভারতের টী কিং (চায়ের রাজা) এ নামে দিল্লীতে পরিচিত ছিলেন। কলকাতার পার্ক সার্কাস এবং শিলিগুড়িতে নাকি শিলিগুড়ি

হাউজ নামক বসতবাড়ি রয়েছে নবাব মোশাররফ হোসেন সাহেবের। এ পরিবার এবং কলকাতায় বসবাসকারী সাবেক পূর্ববঙ্গীয় জীবিত কংগ্রেস ও তাদের কংগ্রেসপন্থী আত্মীয়-স্বজনরা দিল্লীর কংগ্রেস প্রশাসনের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের নেতৃবৃন্দের যোগসূত্র রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নবাব মোশাররফ পরিবারের সঙ্গে দিল্লী কংগ্রেস নেতৃত্বের নাকি একরকম দুধ-ভাতের সম্পর্ক ছিল। নবার মোশাররফ হোসেনের পরিবারের পরিচয়ের সুবাদেই কাজী জহিরুল কাইয়ুম দিল্লীর কংগ্রেস মহলে প্রভাব বিস্তার করার মতো একটি কার্যকর পরিচয় করে তুলেছিলেন। এমনকি কোনো কোনো ব্যাপারে দিল্লীর কংগ্রেস লবি এবং কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতামত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দূতের ভূমিকা পালন করতেন কাজী জহিরুল কাইয়ুম।

সেদিনের আওয়ামী লীগের কুমিল্লা নেতৃত্বের ইচ্ছার বিপরীতে আগরতলার পরিবর্তে শিলিগুড়িতে আওয়ামী লীগের এই ক্রান্তিকালীন কনফারেন্সের স্থান নির্বাচনে দিল্লীর লবির পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেস লবির আশীর্বাদপুষ্ট কাজী জহিরুল কাইয়ুমের মুখ্য ভূমিকা ছিল বলে শুনেছিলাম। শিলিগুড়ি কনফারেন্সের সাফল্যের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশের আগে শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে আনার নামে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের কিংবা প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার গোপন বাসনা স্তিমিত হয়ে যায়।

শিলিগুড়ি কনফারেন্সের পর মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে দিল্লী প্রশাসনের যোগাযোগ আরো গভীরতর করার ব্যাপক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

॥ বত্রিশ ॥

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে সমরাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক রসদ মজুত, সেনা মোতায়েন আরো জোরদার করা হয়। প্রতিদিনের ভারতীয় সংবাদপত্রে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘর্ষের খবর ফলাও ভাবে প্রকাশ হতে থাকে। প্রতিদিন ভারতীয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার অনেক জায়গা দখল করে নেয় পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানী সীমান্ত বাহিনীর সংঘর্ষ, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর। তৎপর ও কর্মচঞ্চল হয়ে পড়ে কলকাতাস্থ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের জনসংযোগ দফতর। দিল্লী থেকে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বিষয়ক আরো জাঁদরেল কর্মকর্তাদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায় ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের দিল্লীতে আনাগোনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরেও কর্মচঞ্চলতা চোখে পড়ার মতো।

জেনারেল ওসমানীর দফতরে কর্মরত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসারদের ঘন ঘন বৈঠক কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। কলকাতা মহানগরীর এখানে-সেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত-সংঘর্ষের কথাবার্তা প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। সর্বত্রই একটি চাঞ্চল্য ও উত্তপ্ত পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও

তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতিতে উত্তাপের আভাস। আমাদের নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতেও উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের বিশাল সীমান্ত এলাকার বাতাস উত্তপ্ত।

ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখী একদিন আমাকে বললেন, কি নজরুল ছাহেব, খবর ক্যায়া? কুছ মালুম হ্যায়?

ঠোঁটে তার চিকন হাসি। এ সময় তাঁর দফতরে উপস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাদা পোশাকধারী কর্মকর্তাগণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ, কেমন যেন মনে হচ্ছে। কেমন যেন গরম গরম মনে হচ্ছে।

কর্নেল রিখী বললেন, চোখ-কান খোলা রেখো।

এদিকে বাংলাদেশ সরকারের সদর দফতরে কলকাতা প্রবাসী বাঙালিরা এসে ভিড় করছেন। পরিস্থিতির উত্তাপ তাঁদের গায়েও লেগেছে। দৈনিক খবরের কাগজগুলো পড়লেই আঁচ করা যায় পরিস্থিতি কোনদিকে এগোচ্ছে।

বৃটিশ-ভারতে বৃটিশ প্রভুর পদলেহনকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এককালের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ষাট-এর দশকে একবার বলেছিল যে, বাঙালিরা নাকি মার্শাল রেস অর্থাৎ যোদ্ধার জাতি নয়। পাঞ্জাবী ও পাঠান, বেলুচিরা মার্শাল রেস। সত্তর দশকের সূচনাতেই ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কথিত অ-মার্শাল জাতি বাংলার সিংহশাবকরা তথাকথিত মার্শাল জাতি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে পরাস্ত, পর্যুদস্ত করে অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছিল। সৌভাগ্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের যে, একাত্তর সালে তিনি জীবিত ছিলেন না তাঁর কথিত অমার্শাল বাঙালি তরুণদের হাতে তাঁর তথাকথিত মার্শাল জাতির নিশানবরদার পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ সৈন্যদের কাপুরুষোচিত পতন দেখার জন্যে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সুসজ্জিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় অতি সাধারণ, বলতে গেলে বর্তমান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় খেলনা অস্ত্র নিয়ে শার্দুলরা পাকিস্তানী দখলদার দস্যুদের নাস্তানাবুদ করেছিল এবং তারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা ছেড়ে তাদের যুদ্ধকালীন অস্থায়ী ক্যাম্প-ঘাঁটি গুটিয়ে থানা বা মহকুমা সদর ছেড়ে জেলা সদরে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কিন্তু অকুতোভয় বঙ্গশার্দুলদের এই দুর্দমনীয় শৌর্য-বীর্য বীরত্ব সেদিন পাকিস্তানীদের তথাকথিত বীরের জাতির দম্ভ-অহংকারই বাংলার দুর্জয় ঘাঁটিতে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়নি, এই বঙ্গশার্দুলরা সেদিন বিশ্বের ক্ষমতাদর্পী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস আর পাকিস্তানের মিত্র চীনকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। বাঙালি তরুণ-যুবকদের বীরত্ব দেখে গোটা বিশ্ববাসী সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। সারাবিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই বাঙালি। ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো মার্কিন প্রভুদের। তারা সেদিন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ থামাবার তথা পাকিস্তানকে রক্ষার জন্যে জাতিসংঘকে পর্যন্ত ব্যবহারের পাঁয়তারা করেছিল। মোগলদের রেখে যাওয়া দিল্লীর লালকেল্লাও সেদিন কম বিস্মিত হয়নি। কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল বাঙালি মোগলদের লাহোর দুর্গেও।

ভারতে সে সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। একাত্তরের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় পত্রিকাগুলোতে একটি চাঞ্চল্যকর খবর চোখে পড়ে। উপমহাদেশে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর। ভারতীয় কূটনীতিকদের ঘন

ঘন মস্কো যাত্রা। মস্কোর কূটনীতিকদের ঘন ঘন দিল্লী আগমন। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্পষ্টত অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে। পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের, বিশেষ করে পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঘন ঘন চীন-পিকিং-পিণ্ডি ছোটাছুটি, চীনা কূটনীতিকদের পাকিস্তানে ছোটাছুটি চীনের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা সেদিন শুনেছিলাম চীন পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এবং পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে। পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো গলা চড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধলে পাকিস্তানের অকৃত্রিম বন্ধু চীন পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়াবে। এমনকি পাকিস্তানকে চীন সৈন্য দিয়ে পর্যন্ত সাহায্য করবে। অর্থাৎ চীনা সৈন্যরা পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে ভারতের বিরুদ্ধে।

কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক সংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আরো বেশি করে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার জন্যে দিল্লী কংগ্রেসকে তাগাদা দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন কুমিল্লার কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাহেব। কলকাতার থিয়েটার রোডে বসে শুনেছি যে, কলকাতার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতার সুবাদে দিল্লী কংগ্রেস নেতৃত্বকে কাজী জহিরুল কাইয়ুম বেশ প্রভাবিত করে তুলেছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জহিরুল কাইয়ুমের গভীর সম্পর্ক ও যোগসূত্র সৃষ্টির পেছনে ছিলেন কলকাতার বাঙালি ব্যারিস্টার জেপি মিত্র এবং কলকাতায় বসতি স্থাপনকারী ব্যারিস্টার অজিত দত্ত। ব্যারিস্টার অজিত দত্ত ছিলেন তখনকার বাংলাদেশের কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্বর্গীয় কামিনী দত্তের পুত্র।

এই দুই ব্যারিস্টার আইন-আদালত ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে। এঁরা মুক্তিযুদ্ধের জন্যে তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে বেসরকারি পর্যায়ে অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত সংগ্রহ করতেন বলে শুনেছি। তাঁরা বিদেশী কূটনীতিকদেরকে প্রভাবিত করেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে। শুনেছি ভারতের বাইরে থেকেও বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে এঁরা গোপনে অস্ত্র আমদানী করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি সরবরাহ করতেন কংগ্রেস নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে।

খুলনা-বরিশাল সেক্টরে ছিলেন মেজর জলিল। তাঁর দফতর ছিল পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত সংলগ্ন হাসনাবাদে। তিনি প্রায়ই কলকাতায় যাতায়াত করতেন। এ সুযোগে কাজী জহিরুল কাইয়ুম সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলিলকে একদিন ব্যারিস্টার অজিত দত্ত ও ব্যারিস্টার জেপি মিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর থেকে মেজর জলিল এই ব্যারিস্টারদ্বয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র সরাসরি মেজর জলিলকে সরবরাহ করতেন। তাই অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের অভাব মেজর জলিলের সেক্টরে ততো অনুভূত হয়নি এবং মেজর জলিল অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের জন্যে কলকাতায় এসে জেনারেল ওসমানীকে পীড়াপীড়ি করে তাঁর বিরক্তভাজনও হতেন না। জেনারেল ওসমানী মেজর জলিলের উপর খুশি ছিলেন এজন্যে।

॥ তেত্রিশ ॥

একাত্তরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশের পক্ষে সোভিয়েট ব্লকভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অবস্থান গ্রহণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসমাজতান্ত্রিক দেশ ভারতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক-বিশ্বের গভীর কূটনৈতিক বন্ধনের সুবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়। এছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)ও এব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন আদায়ে কলকাতায় অবস্থানরত অধিকৃত বাংলাদেশের মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সিপিবি নেতা কমরেড মনি সিংহদের অবদানও কম ছিল না। যদিও বাংলাদেশের মোজাফফর ন্যাপ এবং সিপিবি মুজিবনগর সরকারের অংশীদার ছিল না কিংবা মুজিবনগর সরকার ন্যাপ ও সিপিবি নেতাকর্মীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছিল উদাসীন, তবু সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্যে ন্যাপ-সিপিবির নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক মোজাফফর ও সিপিবির মনি সিংহ সেদিন মস্কোকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিঃশর্ত সমর্থন দেয়ার জন্যে। একদা মস্কোপন্থী বাম রাজনীতিক বলে অধিক পরিচিত আবদুস সামাদ আজাদ ব্যাপকভাবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সফর করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের সার্বিক সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের এই ভূমিকা ও অবদানের কথা মুজিবনগর সরকারের প্রচারণায় ছিল অনুপস্থিত। হয়ত সেদিন বৈরী পশ্চিমা শক্তিকে খুশি করা কিংবা পশ্চিমা শক্তির সমর্থন লাভের জন্যে কৌশলগত কারণে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশের মস্কোপন্থী বাম রাজনৈতিক দলগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশ-গ্রহণের কথা আড়াল করে রাখা হয়েছিল। তবে মস্কোপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা সেদিন প্রচারণা কিংবা কোনো স্বীকৃতি ছাড়াই মাতৃভূমিকে দখলদার বাহিনীমুক্ত করার সার্বিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটিতে মওলানা ভাসানীর নাম ছিল। তিনি কলকাতায় উপদেষ্টা কামিটির দু'একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের রাজনীতিতে পিকিংপন্থী কিংবা পিকিংঘেঁষা নেতা হিসেবে চিহ্নিত হতেন।

বাংলাদেশের এই আপোসহীন বর্ষীয়ান নেতা ভারতের দুশমন চীনের আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তানী দখলীকৃত এলাকা ছেড়ে ভারত-ভূমিতে অবস্থান করায় দিল্লী প্রশাসন কেবল পরম আনন্দিতই হননি, পরম স্বস্তিও বোধ করেছিলেন। কলকাতায় অবস্থানকারী মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দেরও পরম স্বস্তিবোধ করছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং মুজিবনগর সরকারের কলকাতায় অবস্থানগ্রহণকে কেন্দ্র করে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের অপপ্রচারে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের যে শিরঃপীড়া ছিল, মওলানা ভাসানীর ভারতীয় সীমানায় উপস্থিতিতে তাঁদের সেই

শিরঃপীড়ারও অবসান হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পদধুলি গ্রহণ করে দোয়া চেয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর সমসাময়িক একজন নেতা হওয়ায় মওলানা ভাসানীর প্রতি ইন্দিরা গান্ধী সরকারেরও ছিল অগাধ সমীহ। ভারতে অবস্থানকালে যাতে এই জননেতার সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সেদিকে দিল্লী প্রশাসনের খুবই সজাগ দৃষ্টি থাকতো। তবে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং চীনের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পর্কে দিল্লী প্রশাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না। দিল্লী প্রশাসন সেদিন কলকাতায় অবস্থানকারী মওলানা ভাসানীর সেবা-যত্নের ব্যাপারেই শুধু সজাগ সতর্ক ছিলেন না, পশ্চিম বঙ্গে নকশালপন্থী এবং চীনপন্থী সিপিএম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত থাকতে পারেননি। নকশালপন্থী ও সিপিএম নেতা-কর্মীদের সম্ভাব্য আনাগোনা কিংবা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে এদের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা সে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা গলদঘর্ম হয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম মওলানা ভাসানী অসুস্থ। চিকিৎসকরা তাঁর পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। এই বর্ষীয়ান জননেতার অসুস্থতার খবরে দিল্লী কর্তৃপক্ষও নাকি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাই অসুস্থ ভাসানীর সঙ্গে যাতে যখন-তখন কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে না পারে সে ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের উৎকণ্ঠা ছিল পাকিস্তানী কিংবা চীনা কর্তৃপক্ষ যে কোনো মহূর্তে চীনের আস্থাভাজন বাংলাদেশের এই বর্ষীয়ান নেতাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যেতে পারে। মওলানার জীবন নাশ করে ভারতের জন্যে বিশ্বকূটনীতিতে এক মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এতে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ উদ্যোগ ভণ্ডুল হয়ে উঠতে পারে।

ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল রিখীর দফতরে সাদা পোশাকধারী ভারতীয় কেন্দ্রীয় সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেক কানাঘুষা শুনেছিলাম। শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপের মহাসচিব মশিউর রহমান ওরফে যাদু মিয়া মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কলকাতায়। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মশিউর রহমানকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করার। দেখা করলেও মওলানার সঙ্গে তিনি নাকি মন খুলে কথা বলতে পারেননি মওলানার সেবায় নিয়োজিত সাদা পোশাকধারী সেবিকাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির কারণে। এ অভিযোগ মশিউর রহমান করেছিলেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় অবস্থানরত ভাসানীভক্ত ও ভাসানী ন্যাপ নেতা-কর্মীরাও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছিলেন।

ইস্টার্ন কমান্ডে একদিন সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার কোর্সের একজন শিক্ষক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন মওলানা ভাসানীকে চিনি কিনা? তাঁর সম্পর্কে আমার বা আমাদের নেতৃবৃন্দের ধারণা কি?

আমাদের নেতৃবৃন্দের মওলানা ভাসানী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার দায়দায়িত্ব নেয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি কোনক্রমেই ছিলাম না। আমি সহজ সরলভাবে আমার ব্যক্তিগত

অনুভূতি ও ধারণায় বলেছি। বলেছি, একজন সাংবাদিক হিসেবে মওলানা ভাসানীকে চিনি। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় আছে। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে মতাদর্শ প্রশ্নে চীন-সোভিয়েট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভক্ত হয়ে পড়লে আমাদের দেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতেও ভাঙ্গন ধরে। মস্কো ও পিকিং গ্রুপ নামে বিভক্ত ন্যাপের একাংশের নেতৃত্ব নেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং অন্য অংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মওলানা ভাসানী। এর বেশি কিছু আমি জানি না বলে ভারতীয় সাইকোশিক্ষকদের কাছে বলেছিলাম। আমার এটুকু বক্তব্যে যে তারা সম্পূর্ণভাবে খুশি হননি তা ধারণা করতে পেরেছিলাম। আমার জন্যে এ সম্পর্কে কথাবার্তা বলা ছিল এক স্পর্শকাতর ব্যাপার।

দিল্লীর সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার পণ্ডিতদের ধারণা ছিল পাকিস্তানের আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর একটি বিশেষ দলের চীন সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র আছে, সেই সূত্রে মওলানা ভাসানীর কিছু দুর্বলতা ছিল ভুট্টোর প্রতি।

কূটনৈতিক জগতে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারলাম পাক-ভারত যুদ্ধ আসন্ন। দিল্লীর বদ্ধমূল ধারণা আসন্ন পাক-ভারত যুদ্ধে চীন-পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়াবে সশরীরে। পিকিং থেকে পাকিস্তানী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এমন একটি আশ্বাসবাণী নিয়ে দেশে ফিরে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ভারত-পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীনা ভাইয়েরা পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াবে।

সেদিনকার খবরের কাগজগুলোতে খবর বের হয়েছিলো যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীন পাকিস্তানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। এসব খবরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ভারতের সাতটি প্রদেশের ভাগ্য সম্পর্কে। ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ দফতরে শুনেছিলাম, দিল্লী নিশ্চিত যে বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তাতে চীনা সৈন্যরা পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেবে। দিল্লীর সমরবিশারদরা অপেক্ষা করছিলেন হিমালয় অঞ্চলে শীত পড়ার জন্যে। প্রচণ্ড শীত পড়লে হিমালয় অঞ্চলে ঘন বরফ পড়বে এবং হিমালয় অঞ্চলে একবার বরফ গলা শুরু করলে চীনা সৈন্য সেই বরফের দরিয়া পার হয়ে এসে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করতে পারবে না। ভারতের জন্যে বরফগলা হিমালয় ন্যাচারাল প্রটেকশন ওয়াল হিসেবে কাজ করবে। আর চীনাদের ভারত অভিযানের পক্ষে সৃষ্টি হবে ন্যাচারাল বেরিয়ার (প্রাকৃতিক বাধা)।

ইস্টার্ন কমাণ্ডের গণসংযোগ দফতরে বসে ভারতীয় রণকৌশলবিদদের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন শুনে আমার মনে হয়েছিলো সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য চীন-ভারতের হিমালয় কূটনীতির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। হিমালয়ের বরফগলা মহাসমুদ্রে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। হিমালয়ের বরফ গলবে। বরফের পানির নহর সৃষ্টি হবে। তারপর শুরু হবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বাঙালির স্বাধীনতার ভাগ্য।

॥ চৌত্রিশ ॥

চারদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ-সংঘাত গুলি বিনিময় নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকাসহ বিশ্বের পত্রপত্রিকায় ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বৃদ্ধির খবর বের হচ্ছে।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, জেনারেল ওসমানী দিল্লী গেলেন। তাঁদের দিল্লী সফরকে কেন্দ্র করে কলকাতায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগ, নেতাকর্মীদের মধ্যে নানা গুঞ্জরন শুরু হয়েছে। তাঁরা বলে বেড়াচ্ছেন এবার নেতৃবৃন্দ দিল্লী থেকে সুসংবাদ নিয়ে আসবেন। এবার একটা দফারফা হবে।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। দু'দেশেরই সৈন্য-সামন্ত দুদেশের সীমানার মধ্যে মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে। এসব খবর সংবাদপত্রে দেখে কলকাতার মুজিবনগরীদের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ বয়ে চলছে। তাঁরা বলতেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখা সাধ্য কার? সবাই দিল্লীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নেতৃবৃন্দ দিল্লী থেকে কি খবর নিয়ে আসেন তা জানার জন্যে।

এদিকে ভারতের পূর্বাঞ্চলেও রণপ্রস্তুতি কম ছিল না। হাল্কা ও মাঝারি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেনেড, টাইম বোমা, মাইন, ৩০৩ রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হচ্ছে। আগেই বাংলাদেশের ভেতরের রাস্তাঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল, ব্রীজ, কালভার্ট, ফেরীঘাট ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এবং ম্যাপ পর্যন্ত তৈরি করে রাখা হয়েছে ইস্টার্ন কমান্ডের সমর পরিকল্পনাবিদদের কাছে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের নদ-নদীতে কত ফুট পানি থাকে, ট্যাংক কিংবা সামরিক লরি পারাপার করা যাবে কিনা, গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নদীর উপর ব্রীজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিলো ভারতীয় সমরবিশেষজ্ঞের কাছে। অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুবিধাজনক, নিরাপদ স্থানে ছোট, হালকা ও মাঝারি ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের মওজুদ গড়ে তোলা হয়েছিল। এপার বাংলার মানুষের সঙ্গে দৈহিক গঠন ও গায়ের রং, সবদিক থেকে সাদৃশ্য আছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এমন বাংলাভাষী কমান্ডো সৈনিকও অধিকৃত বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা বেশে ঢুকে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় একএকটা দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাংলাদেশের ভেতরে কোনো কোনো এলাকায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও অনাহারে কাবু হয়ে পড়া হানাদার সৈনিকদের বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানী সৈনিকদের সাথে মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তারা স্বাধীনতার উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভা দেখেছে দখলকৃত বাংলার আকাশে।

কলকাতায় অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যেও হতাশার কালো মেঘ কেটে গিয়ে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বিজয়ের অত্যাসন্ন মুহূর্তে আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতির মাঝখানেও যে বেদনা গুমরে গুমরে উঠত, তা ছিল পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী বঙ্গবন্ধুর কথা। বাংলাদেশ সরকার, ভারত সরকার এবং সোভিয়েত সরকারসহ বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষার জন্যে রক্তপিপাসু পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছিল। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতায় অবস্থিত কনসালের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতাদের সহায়তায় বাংলাদেশের কাজী জহিরুল কাইয়ুমের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোধ হয় নূরুল ইসলাম সাহেবও এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মুজিবভক্ত নূরুল ইসলাম সাহেবের কাছে শুনেছি, জহিরুল কাউয়ুম সাহেব, কলকাতাস্থ মার্কিন কূটনীতিকের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে হোয়াইট হাউসের সাহায্য লাভে তাঁর (মার্কিন কূটনীতিক) ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্যে আবেদন করেছিলেন। মার্কিন কূটনীতিককে তিনি বলেছিলেন, মুজিবকে তোমরা বাঁচাও। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজম ঠেকাতে মুজিবের মতো নেতার আমাদের দরকার হবে। শেখ কমিউনিস্ট নন।

কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাহেবের কথায় আশ্বস্ত হয়ে উক্ত মার্কিন কূটনীতিক নাকি এ ব্যাপারে তাঁদের দিল্লীস্থ দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের মতামত অবহিত করবেন বলে কাজী সাহেবকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কাজী জহিরুল কাইয়ুম উক্ত মার্কিন কূটনীতিকের পেছনে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকেন। কিছুদিন পর কলকাতার ঝানু মার্কিন কূটনীতিক কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাহেবকে জানান যে, এ ব্যাপারে হোয়াইট হাউস, পাকিস্তান এবং বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। প্রস্তাবিত এ বৈঠকে একটি সমঝোতা হলে তবে হোয়াইট হাউসের কাছে শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্যে এপ্রোচ করা যাবে।

বুদ্ধিমান কাজী জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন কূটনীতিকের প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় যৌথ বৈঠকে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিও রাখার জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে কলকাতার মার্কিন কূটনীতিকের সায় পাওয়া যায়নি। তাঁদের যোগাযোগ ও আলোচনার এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

বেশ কয়েকদিন পর মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ দিল্লী থেকে ফিরে এলেন। সবাই কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডে অপেক্ষা করছিলেন নেতৃবৃন্দের জন্যে। সেদিন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদও থিয়েটার রোডে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সদর দফতরে এসেছিলেন।

থিয়েটার রোডের ভবনের উপরতলায় বসে তিনি মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সময় কাটাচ্ছিলেন। দিল্লী থেকে নেতৃবৃন্দের কলকাতায় আসার সময় তাঁর জানা ছিল। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এবং জেনারেল ওসমানী এক গাড়িতে করেই কলকাতার দমদম এয়ারপোর্ট

থেকে সরাসরি আট নম্বর থিয়েটার রোডে এসে পৌছুলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দমদম থেকে সোজা তাঁর বাসভবনে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর কার্যালয়ের দরজায় ঢুকতেই উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এসে কামরুজ্জামান (হেনা ভাই) এবং আবদুস সামাদ আজাদ একের পর একজন তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এ সময় খন্দকার মোশতাক আহমদও থিয়েটার রোডের বাড়ির সিঁড়িগোড়ায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁর বুকে এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি এ দুর্লভ মুহূর্তের ছবি উঠিয়ে রেখেছিলাম প্রতিরক্ষা বিভাগের ফটোগ্রাফার সুজিতকে দিয়ে। দিল্লী থেকে আগত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং জেনারেল ওসমানীর মুখ দীর্ঘ ভ্রমণজনিত কারণে ক্লান্তির মধ্যেও প্রসন্ন ছিল। তাঁদের প্রসন্ন মুখ দেখে আমাদের কারো বুঝতে বাকি ছিল না যে, দিল্লীতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাদের নেতৃবৃন্দের সাফল্যজনক কোনো আলোচনা হয়েছে। কোনো মহিলার জীবনে প্রথম সন্তান কনসিভ করার পর ইঙ্গিতবহ প্রশান্তি পরিতৃপ্তির মতো আমাদের নেতৃবৃন্দের মুখমণ্ডলে এক গভীর ইঙ্গিতবহ প্রশান্তি লক্ষ্য করলাম। আমাদেরও মন গভীর প্রশান্তি তে ভরে উঠল। যাক, এবার একটা কিছু হবে। দেশে ফিরে যেতে পারবো সম্মানজনকভাবে।

কলকাতায় প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিরা এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সক্ষাৎ করে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে যান। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা এসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করার পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে যার যার কর্মস্থলে চলে যান। আমাদের আনন্দঘন মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যাপার কি? নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। ব্যাপার একটা কিছু ঘটে গেছে নজরুল—চতুর শাহাবুদ্দিন বললেন।

প্রধানমন্ত্রী খুব ব্যস্ত। তাঁর রুমে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ সে সময় আমাদের ছিল না। তবে আসল কথা এ খবর প্রধানমন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে থাকেনি। ঘটনা পরম্পরায় জানতে পারলাম, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির ধাঁচে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত বাংলাদেশের একটি মৈত্রী চুক্তি হয়েছে নেতৃবৃন্দের দিল্লী সফরকালে। স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতরের উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে আনন্দের ভাব। মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। সদর দফতরে আমাদের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে এবার ভারতকে সরাসরি ধরা যাবে। এবার দিল্লী সরকার একটা কিছু করতে বাধ্য হবে। মৈত্রীচুক্তির শর্ত সম্পর্কে সরকারের লবি মহল থেকে যে ব্যাখ্যা শুনেছিলাম তা ছিল মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স বাংলাদেশকে সরাসরি সাহায্য করবে। এতদিন গোপনে গোপনে সাহায্য করতো। এখন আর গোপনে নয়। এবার প্রকাশ্যে খেলা হবে।

আনন্দভরা মুখ নিয়ে এপারের বাঙালিরা কলকাতা শহরে মাথা উঁচু করে হৈচৈ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আনন্দে ধেইধেই করছে। অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ঢাকার যুবকগণ যারা পাকিস্তানী হায়েনা বাহিনীর হাত থেকে প্রাণ রক্ষার জন্যে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তারা এখন সাহসের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে অভিজাত দোকানে গিয়ে দেদারছে কেনাকাটা করছে।

কেউ কেউ কলকাতা মহানগরীর বই-পুস্তক, সাহিত্য-সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র বৌবাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতের তারকাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বৌবাজার এলাকায় খোলামেলা রেস্তোরাঁয় বেণী এলিয়ে দিয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করছেন বন্ধু-বান্ধবীরা। কাব্য সংস্কৃতি চর্চার এই মধুবৃন্দাবনে এপার বাংলার অভিজাত ঘরের যুবকদের বেশ আনাগোনা। শুনেছি কলকাতার চীনপন্থী বামপন্থী আর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকারী এপার বাংলার চীনপন্থী বামপন্থীরা ভারত-বাংলাদেশের এই মৈত্রী চুক্তির সমালোচনায় মুখর। এরা এখানে সেখানে বসে এ চুক্তি সম্পর্কে বিরূপ ব্যাখ্যা দিচ্ছে এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। এতে কিছুসংখ্যক মুজিবনগরী বাঙালিদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়।

ময়মনসিংহের সৈয়দ আবদুস সুলতানের মতো বিজ্ঞ মুজিবনগরী লোকজন বলতেন, এ চুক্তিতে তো বাঙালির বিজয় হয়ে গেছে। ভারত এই চুক্তিতে সই করে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলা যায়। কারণ এতদিন ভারতের কূটনীতিক তালিকায় বাংলাদেশ বলতে কোনো দেশ ছিল না। ছিল পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের নাম। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিতে ভারত সরকার সই করার মধ্য দিয়ে ভারতের কূটনীতিক খাতার তালিকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম মুছে ফেলে তদস্থলে লেখা হয়েছে বাংলাদেশের নাম। স্বাধীন হওয়ার আগেই বাংলাদেশের এটা কূটনীতিক বিজয় ছাড়া আর কি?

এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কঠোরভাবে চুপচাপ। কোনো কথা বলছেন না কারো সঙ্গে। তবে দলের খুব উঁচু পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয় তাঁর। এসব সূত্রেই আমরা অনেক কথা শোনার সুযোগ পাই।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে থিয়েটার রোডেই এক একজনের মুখে এক একরকম কথা। ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা,প্রচার অপ্রচার এমন সব বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে একদিন নূরুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসভবনে গেলাম। এর আগে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় আমি কোনোদিন যাইনি। কোমল প্রাণের এবং মিষ্টি হাসির লোক সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঢাকায়ই আমি সাংবাদিক হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। নূরুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় তাঁর ঘরে ঢুকে সালাম দেয়ার আগেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব একগাল মিষ্টি হাসি দিয়ে স্বভাবসুলভ অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, আরে নজরুল যে! তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি তো আস নাই কোনোদিন।

খুবই লজ্জিত হলাম এমন সুন্দর প্রাণের মানুষটির কাছে এতদিন না আসার জন্যে। ময়মনসিংহের মানুষের আদর-আপ্যায়নের ঐতিহ্যের ধারা কলকাতা মহানগরীতে এসেও অক্ষুণ্ন রেখে সৈয়দ সাহেব বললেন, কি খাবে? ভাত খাও। ভেতরে যাও।

এদিক ওদিক তাকিয়ে লোক খুঁজতে লাগলেন আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নূরুল ইসলাম ভাই বললেন, না নজরুল ইসলাম ভাই, আমরা খাবো না কিছু। আমরা জানতে চাই আপনারা দিল্লীতে ভারতের সঙ্গে নাকি কি একটা চুক্তি সই করেছেন। এটা কি? কেউ কেউ বলছেন এ ধরনের চুক্তি করা ভালো হয়নি। আবার কেউ বলছেন, আমাদের কূটনৈতিক বিজয় হয়েছে, আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত, স্বাধীন হওয়ার আগেই।

সৈয়দ নজরুল সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, বলতে পারো এ চুক্তিতে আমাদের কূটনৈতিক বিজয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে লিখিতভাবে ভারতের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তবে বাংলাদেশ দখলদার বাহিনীমুক্ত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের স্বীকৃতি ঘোষণা করা হবে। এখন বাংলাদেশকে দখলদারমুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা ভারতেরও দায়িত্ব। এবার ভারত আমাদের পাশে দাঁড়াবে আমাদের মিত্রশক্তি হিসেবে। মিত্রশক্তি গঠন করে কমন এনিমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবে নিশ্চিত থাকো–এ যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজয় বরণ করবে এবং আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। আমরা একটা মুক্ত-স্বাধীন দেশে ফিরে যেতে সক্ষম হবো। কে কি প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাতে কান দিও না। এ মুহূর্তে আমাদের কাজ দখলদার দেশ স্বাধীন করে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া। পরে কি করবো তা নিজ দেশের মাটিতে গিয়ে স্থির হবে।

বাংলাদেশ-ভারত এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির সুফল ফলতে শুরু হয়ে গেছে।

ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী এবং বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে মিত্রবাহিনী গঠিত হয়। গঠিত হয় ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশ এবং বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে যৌথকমাণ্ড।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশগুলো থেকে অস্ত্রসহ পর্যাপ্ত সামরিক সাহায্য আসতে থাকে ভারতে। শুনেছি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আণবিক বোমা, সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি ট্যাংক, মিগ, বোমারু বিমান এবং অজস্র সামরিক যান আসতে শুরু করে ভারতে। এসব খবর চাপা দিয়ে রাখা হতো। সংবাদপত্রে এ ধরনের কোনো খবর ছাপা হয়নি। ভারতে আগমন ঘটে সোভিয়েত সামরিক বিশেষজ্ঞ মিশনের।

তখনকার অন্যতম সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রভাবের ফসল হিসেবে জাতিসংঘভুক্ত অন্যান্য দেশ থেকেও ভারতে আসতে থাকে সামরিক সরঞ্জামসহ বিভিন্ন সাহায্যসামগ্রী। জাতিসংঘের সাহায্য ও পুনর্বাসন সংস্থা থেকে আসে তাঁবু, মশারি, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, ঘরগোছানোর তৈজসপত্র, শিশুখাদ্য, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, নতুন নতুন অসখ্য ট্রাক। কলকাতা নগরীতে এসব মালপত্রের চালান আসতে থাকে।

একদিন আমার জীপের ড্রাইভার আকবর আমাকে নিয়ে কলকাতার কোনো এক এলাকায় নিয়ে গেলো এসব দেখানোর জন্যে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী তথা

মুক্তিবাহিনীতে কর্মরত বেসামরিক ড্রাইভার আকবর ও আবুল প্রমুখ খুব খুশি। আমার কাছে বলে, স্যার এবার যুদ্ধ লেগে যাবে দেখবেন। বিশ্বাস না হয় একদিন চলুন আপনাকে যুদ্ধের কিছু আলামত দেখিয়ে নিয়ে আসি।

পরদিনই আকবর আমাকে কলকাতার এক পার্কের কাছে নিয়ে গেলো। দেখলাম পার্কের চারপাশ দিয়ে পার্ক করা অসংখ্য নতুন খোলা ট্রাক। ট্রাকের সংখ্যা এক হাজারের মতো। আমি একসঙ্গে এত ট্রাক আগে কোনোদিন দেখিনি। তাই হতবাক হয়েছিলাম, একসঙ্গে এত নতুন ট্রাক দেখে। পার্কে এখানে-সেখানে রাখা হয়েছে আরো কিসব বড় বড় বাক্স।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠনের পর মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মিত্রবাহিনীর কর্মকর্তারা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের সঙ্গে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর কর্মকর্তারাও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছেন। ব্যাপক তৎপরতা বেড়ে গেছে মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে নিয়োজিত মিত্রবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের। মনে হতো যেন মিত্রবাহিনীর আরেকটি অফিস মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর। এবার আমাদের বিশ্বাস ও আস্থার সৃষ্টি হলো যে যুদ্ধ বাধবে এবং এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ থেকে হানাদার বাহিনীকে হয়তো তাড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পারবো। আমাদের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ বলে এক রব উঠে গেলো।

কলকাতায় অবস্থানরত এপার বাংলার বাঙালিরা এসময় স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতরের সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ করছে না। কেউ কেউ নিষিদ্ধ এলাকা মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে ঢুকে যেত। এদের মধ্যে আমার পরিচিতজনদের কেউ কেউ আমার ঘরে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করতো, কি নজরুল যুদ্ধের খবর কি? যুদ্ধ কি লেগে গেছে? কিংবা কবে লাগবে যুদ্ধ? এমন সব প্রশ্ন শুনে আমি ভীষণ বিরক্ত এবং লজ্জাবোধ করতাম। কারণ তাদের এমন প্রশ্ন, যেন আমি যুদ্ধের নীতিনির্ধারক কিংবা নিয়ন্ত্রক। যেন আমি যুদ্ধ লাগাবার মালিক। কিংবা যুদ্ধ কখন শুরু হবে তা যেন কেবল আমিই জানি।

মাঝে মাঝে আট নম্বর থিয়েটার রোডে বসে ভাবতাম, যে যুদ্ধ এত ঘৃণিত মানবতাবিরোধী, সারা দুনিয়ার নিন্দিত বিষয়, তা সত্ত্বেও কেন আমরা সে যুদ্ধ চাই? যুদ্ধ মানেই জীবনপাত, ধ্বংস, ঘরে ঘরে হাহাকার, কান্নার রোল—তা সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধের জন্যে এত পাগল হয়ে গেলাম কেন? যুদ্ধ কি তাহলে আমাদের জন্যে কল্যাণজনক, আশীর্বাদজনক? তা না হলে এমন যুদ্ধের পাগলপারা হয়ে উঠলাম কেন? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যুদ্ধকে বিদায় জানিয়েছেন। আর আমরা কেন যুদ্ধকে আহ্বান জানাচ্ছি? আসলে পরিস্থিতিই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তার জন্যে ভালমন্দ যাচাই করতে। আমরা, এপারের প্রবাসী বাঙালি, মনে করছি এ মুহূর্তে যুদ্ধই কেবল আমাদের হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। যুদ্ধ যেমন সভ্যতা ধ্বংস করে মানুষের জীবন

নেয়, তেমনি মানুষকে জীবন দিতেও পারে। একটি সভ্যতা রক্ষা এবং বাঁচাতেও পারে। একাত্তরে যুদ্ধ ছিল আমাদের জন্যে আশীর্বাদ। পাকিস্তানী ঘাতক বাহিনী আমাদের মনের মধ্যে সেদিন এই অনুভূতির জন্ম দিয়েছে যে, যুদ্ধই এখন আমাদের রক্ষা ও বাঁচাতে পারে এবং এ যুদ্ধে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। একই সঙ্গে আমরা কিছু মানুষকে বাঁচাতে এবং কিছু মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদগ্র নেশায় মেতে উঠেছিলাম। হানাদার বাহিনী কবলিত বাংলাদেশের জনগণ হানাদার বাহিনীকে মানুষ বলে গণ্য করেনি। নরহত্যায় তাদের নৃশংসতা দেখে তাদের বলতো—পশু। তাই বাংলার দামাল ছেলেরা পশুহত্যার মহোৎসবে মেতে উঠেছিল। একজন পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করতে পারলেই একজন বাঙালি যুবক নিজেকে গর্বিত বীর বলে মনে করত।

মিত্রবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে তাঁদের বার্ষিক শারদীয় দুর্গোৎসবের আবাহন শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তানকে একটু শিক্ষা দেয়ার জন্যে দীর্ঘদিনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাদের পরমারাধ্য সেই শিকার এখন তাদের হাতের মুঠোয়।

এই পরিস্থিতিতে একদিন কর্নেল রিখীর দফতরে গেলাম। আমাকে দেখে কর্নেল প্রাণখুলে একটি হাসি দিয়ে বড় গলায় বললেন, ক্যায়া নজরুল সাহেব?

হাসিমুখে একটু আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাঁকে শুভ মর্নিং জানিয়ে তাঁর কাছাকাছি একটি চেয়ারে গিয়ে বসলাম। কর্নেল রিখী তাঁর পিয়নকে ডেকে বললেন, আরে বেটা এধার আও। দ্যাকো কোন লোক আয়া। বাংলাদেশের ফ্রীডম ফাইটার কি পিআরও নজরুল ইসলাম সাহাব আয়া, উনকো চা পিয়াও।

এর পর ভারতীয় স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি ফাইল আমাকে দেয়ার জন্যে পিয়নকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, দেখো নজরুল, ইসিমে এক জবর খবর আছে।

স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম আন্ডার লাইন করা খবরটির উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। খবরটি হলো চীনের সীমান্ত ঘেঁষে মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য মোতায়েন করেছে। এ খবরটি পড়ে আমার মধ্যে তাৎক্ষণিক তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। বরং একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেছে তাতে আমাদের কি হয়েছে? আমি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকাটির অন্যান্য খবর পড়ে যেতে লাগলাম। কর্নেল রিখী আমার অজ্ঞতা বুঝতে পেরে বললেন, আরে আরে, নজরুল তুমি বুঝতে পারলে না, মঙ্গোলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঙ্গরাজ্য। চীনের সীমান্ত ঘেঁষে এটার অবস্থান। এখন মঙ্গোলিয়ায় অর্থাৎ চীনের সীমান্ত বরাবর সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছে। চীনা সৈন্যও চীন সীমান্ত বরাবর মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।

আমি তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলাম। কর্নেল রিখীর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েনের সুদূরপ্রসারী পরিণতি সম্পর্কে

আমার চেতনাবোধ নেই। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, তুমি এর মাজেজা বুঝলে না নজরুল! আরে তোমাদের পাকিস্তানের ভুট্টোজী চীনে গিয়েছিলেন সৈন্য এনে ভারতের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে তোমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বানচাল করে দিতে। এখন কি চীন পাকিস্তানকে সৈন্য ধার দিতে আর পারবে? ঘাড়ের উপর সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন রেখে চীন আর এখন পাকিস্তানকে কোনো সৈন্য সাহায্য করতে পারবে না। এখন চীনেরই অবস্থা চাচা আপন পরান বাঁচা।

॥ ছত্রিশ ॥

মঙ্গোলিয়া দেশটির নামের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তবে সে দেশের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আর প্রতিরক্ষার কৌশলগত দিক থেকে মঙ্গোলিয়ার গুরুত্ব কিংবা তাৎপর্য সম্পর্কে কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনীতা আমি অনুভবও করিনি কোনোদিন।

মঙ্গোলিয়া সম্পর্কে কর্নেল রিখী বর্ণিত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যাসন্ন যুদ্ধ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মঙ্গোলিয়ার ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থান আমার কাছে এক নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হলো।

কর্নেল রিখী পাকিস্তানের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ মিত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষী চীনের সীমানা বরাবর মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েনের প্রতিরক্ষাগত কৌশল সম্পর্কে আমাকে একটি ধারণা দিলেন।

এখনকার মতো সে সময় অর্থাৎ ১৯৭১ সালে এই উপমহাদেশে ফটোস্ট্যাট মেশিন ছিল না। তাই সেদিনের ভারতীয় ইংরেজী দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন সম্পর্কিত খবরটি টাইপিস্ট দিয়ে টাইপ করিয়ে আমাকে দিয়ে তিনি বললেন, এটা তোমার-আমার জন্যে এক বিরাট আনন্দের খবর। কারণ চীনের সীমানা বরাবর মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন করার ফলে চীন এখন তোমার-আমার কমন শত্রু পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। এটা আমাদের উভয় দেশের যোদ্ধা এবং জনগণের জন্যে পরম স্বস্তির কথা।

তুমি এ খবরটি নিয়ে বাংলায় তরজমা করে একটা ডিসপ্যাচ লিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও অন্যান্য মিডিয়াকে দাও। চীন পাকিস্তানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। এ খবর শুনে তোমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের জনগণের মনে মুক্তিযুদ্ধের সফলতা সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, তাদের সৈনিক ও সমর্থকদের মধ্যে চরম হতাশা সৃষ্টি হবে। এদের সকলের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের দর্শন মোতাবেক এই খবরের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেই স্টোরি তৈরি করো। আকাশে-বাতাসে খবর ছড়িয়ে দাও যে, মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য ও চীনা সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। এছাড়া আরো

কি কি স্টোরি বানানো যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করো। তোমাদের ইয়ং ব্রেইন কাজে লাগাও। এ সুযোগটাকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না।

পাকিস্তান ও চীন—এই দু'দেশের মধ্যকার আদর্শিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় প্রশ্নে বৈপরীত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিসপ্যাচ হতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আদর্শিক দিক থেকে বৈরিতা বিদ্যমান। একারণেই চীন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে না।

আমাদের দুশমন এই দুই দেশের মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।

কর্নেল রিখীর কথায় অনেক ঝাঁঝ ছিল। চীন ও পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রবীণ গণসংযোগ কর্মকর্তা এবং সাইকোলজিক্যাল দর্শনের বিজ্ঞ পণ্ডিত কর্নেল রিখীর মনোভাব আগে থেকেই খারাপ ছিল। গুলি খাওয়া বাঘের মতো প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল তাঁর দুই চোখে। ১৯৬১ সালে সীমান্ত নিয়ে এবং ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ—চীন এবং পাকিস্তান দুটোই ভারতের পুরনো শত্রু। দুটো দেশের ব্যাপারেই তুষের আগুনের মতো ভারতের প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। পুরনো প্রতিহিংসার আগুনে এবার ঘৃতাহুতি পড়েছে এবং বাতাস লেগেছে।

কর্নেল রিখী বলতে গেলে আমাকে এক রকম ডিকটেশন দেয়ার মতোই বললেন লিখ যে কোনো ধর্মই কমিউনিজমের চরম শত্রু। আর কমিউনিজম সব ধর্মেরই শত্রু। আর রাজনৈতিক দর্শনে বা শাস্ত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও বিধি-ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব শাসনব্যবস্থার ধ্যান-ধারণায় আপোসহীন বিরোধ বিদ্যমান। একইভাবে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে ব্যবধান অনেক। দুটি ব্যবস্থাই পরস্পরবিরোধী এবং একটি অন্যটির জাতশত্রু। এদিক থেকে চীন এবং পাকিস্তানের অবস্থান কোথায় তা ভেবে দেখো। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র। বিশ্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার হোতা মার্কিনী দর্শনের অন্ধ অনুসারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের দেশ হচ্ছে পাকিস্তান। আর চীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘোর বিধোরী কট্টর কমিউনিস্টশাসিত একটি দেশ। তুমি লিখবে, কেন চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে? চীন কি ধর্মান্ধ ও পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট অনুসারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের লুটেরা অর্থনীতির দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য করতে পারে?

ধর্মান্ধ ও পুঁজিবাদী দানবকে কমিউনিজম বরদাশত করতে পারে না। একারণেই চীন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট চীনের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, বাড়ির কাছে ধর্মান্ধ ও পুঁজিবাদী দানব পোষা হলে তার হিংস্র নখর একদিন সমাজতান্ত্রিক চীনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে।

আসলে মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক রাজনৈতিক কারণে চীন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দান করছে না। মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন চীনের একটি অজুহাত মাত্র। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন তার এককালীন রাজনৈতিক ভাবশিষ্য চীনকে স্মরণ করিয়ে

দিয়েছে পুঁজিবাদী ধর্মান্ধ পাকিস্তানকে সাহায্য করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে। অন্যদিকে পাকিস্তানের কট্টর ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তি কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের দহরম মহরমের বিরোধী। তারা মনে করছেন পাকিস্তানে কমিউনিস্ট চীনের নাস্তিক সৈন্যের উপস্থিতি ধর্মপ্রাণ পাকিস্তানী সৈন্যদের ঈমানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের ঘরে ঘরে কমিউনিস্ট চীনের নাস্তিক সৈন্য আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পাকিস্তানের মুসলমানদের এক একটি ঘর কমিউনিস্ট চীনের নাস্তিক সৈন্য আমদানী বিরোধী এক একটি দুর্গ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মনে করেন, কমিউনিস্টদের ধর্মই হচ্ছে বিশ্বে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার ও বিস্তার করা। বিশ্বে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক টার্গেট।

স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন এবং নিজেদের ঈমান-আকিদা, আল্লাহ-রসূল ও পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন-জীবিকা নির্বাহের মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। ভারত ভেঙ্গে হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস ঠিক রাখার জন্যে। হিন্দুরা তো ধর্ম-বিরোধী নয়। তারাও একটি ধর্ম মানে। তারা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু কমিউনিস্টরা তো কোনো ধর্মই মানে না। তারা ধর্মকে আফিং বলে মনে করে এবং বলে বেড়ায় যে, ধর্মীয় আফিং খাইয়ে ইসলামের নামে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে শোষকরা অবাধে শোষণ করছে। কমিউনিস্টরা একথা প্রচার করছে। এভাবে মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত করছে কমিউনিস্টরা। তারা আল্লাহর রাসূল ও কুরআনের উপর থেকে মুসলমানদের বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট করার জন্যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কাজেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানরা ভারত ভাগ করে পাকিস্তান বানায় নাই। পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের ধর্মপ্রাণ পাঠান, বেলুচিস্তানের ধর্মপ্রাণ বালুচরা মনে করেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ না করে বরং নাস্তিক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। প্রয়োজনে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে, নাস্তিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ করা একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঈমানের অংশ। মুসলমান কখনো নাস্তিক কমিউনিস্টকে বরদাশত করতে পারে না।

পাকিস্তানে মুসলমানরা চীনের সৈন্য আমদানীর প্রতিবাদে শহরে-নগরে গ্রামে-গঞ্জে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। প্রতিদিন প্রতিবাদ মিছিল করছে। চীনা সৈন্য আমদানীর বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ পাকিস্তানী মুসলমানরা ঘৃণায় ফেটে পড়ছে।

কর্নেল রিখীর এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনে আমার অজ্ঞতা সম্পর্কে ধিক্কার এলো। মনে হলো, হায় জ্ঞানের কত দীনতা আমার। কর্নেল রিখীর জ্ঞানের এক ক্রান্তিও আমার নেই!

কর্নেল রিখীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আমি নিজের অজ্ঞতাতেই আপ্লুত হয়ে পড়লাম। লজ্জিত হলাম–কি নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধ করতে এসেছি। শুধু কামান -বন্দুক দিয়ে কি যুদ্ধ জয় করতে পারবো? প্রথম যেদিন ইস্টার্ন কমান্ডে গিয়েছিলাম সাইকোলজিক্যাল

ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে ব্রিফিং নেয়ার জন্যে, সেদিনের ভারতীয় রণকৌশল প্রচার বিশারদদের কথাগুলো এখন মূল্যবান বাণী বলে মনে হয় আমার কাছে। যুদ্ধে অসির চেয়ে মসি বেশি শক্তিশালী। নিজের জ্ঞান ও মেধাকে কাজে লাগাতে হবে যুদ্ধ জয় করার জন্যে। শুধু অসি দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যাবে না।

আমার মনে খুব দুঃখ হল। হায়, যুদ্ধের ময়দানে মসির জগতে আমি ও আমরা কত গভীর অন্ধকারে রয়েছি। যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানের এত ঘাটতি নিয়ে কেমন করে আমরা তাহলে যুদ্ধে জয়ী হবো?

আমরা তো এতদিন পাকিস্তানের সামরিক রাজত্বে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো কোনো সময় ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে রাস্তায় মিছিল করেছিলো, গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েছি ভারতকে ক্রাস করবো। ভারতকে দেখায়ে দেয়াঙ্গা। কর্নেল রিখীর সামনে বসে মনে প্রশ্ন উঁকি দিয়ে উঠেছে, সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এত অজ্ঞতা নিয়েই কি এতদিন আমরা ভারতকে ক্রাস করার স্বপ্ন দেখেছি? আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে এই জ্ঞানদান করার জন্যে কর্নেল রিখীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনপ্রাণ ভরে উঠল। মনে হয়েছে কত জ্ঞান আমি পেয়েছি। যুদ্ধকালীন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সময়োচিত এই জ্ঞান তো কোনো বইপুস্তক পড়েও পাওয়া যাবে না। কোথায় মঙ্গোলিয়া আর কোথায় বাংলাদেশ? মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য মোতায়েন করছে তা নিয়ে বাংলাদেশের ভাবনার কি থাকতে পারে? কর্নেল রিখীর সামরিক বিশ্লেষণ মূল্যায়নের আলোকে দেখতে পেলাম চীন-পাকিস্তানের অশুভ আঁতাতের কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েনের মধ্য দিয়ে যেন উঁকি মেরে আমাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে।

পবিত্র রমজানের সিয়াম শেষে ঈদুল ফিতরের পবিত্র চাঁদ দেখে যেমন একজন মুসলমান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে শোকরিয়া আদায় করে, আমিও সেদিন মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েনের জন্যে মনে মনে আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করেছিলাম।

পাকিস্তানকে চীন শেষ পর্যন্ত সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সাহায্য করেনি। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিশ্বস্ত দোসর ভুট্টোর স্বপ্ন ও আস্ফালন সব চুরমার হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের নব উদ্যোমের অভিযাত্রা রণাঙ্গনে একের পর এক অঞ্চল জয় করে চললো।

মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী পাকিস্তান ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসরদের চক্রান্তের একটি জাল মাত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আরো অনেক চক্রান্তের জাল পাতা হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখার জন্যে।

॥ সাইত্রিশ ॥

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফসল মঙ্গোলিয়ায় চীন সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির ফসল বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনী ও যৌথ কমান্ড গঠন।

পাকিস্তানের উপর মারণাঘাত হানার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বিভিন্ন দেশের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগর অভিমুখে রওনা হওয়ার খবর প্রকাশের মধ্য দিয়ে। মার্কিন রণতরী সপ্তম নৌবহরের আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রবাহী বোমারু বিমান, সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ওপরই বিমান ওঠা-নামার বিশাল রানওয়ে, যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ-রসদসম্ভার, হাজার হাজার সৈন্য ধারণক্ষম, আক্রমণ ক্ষমতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রতিদিন কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলোতে বিস্তারিত বর্ণনা-বিবরণ ছাপা হচ্ছে। এসব খবর পড়ে দেখতে পেয়েছিলাম শুধু বাংলার আকাশে নয়, ভারতের আকাশেও কালোমেঘের এক অশুভ ছায়া। কলকাতায় অবস্থানরত এপার বাংলার লোকজন এবং বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ওপার বাংলার বাঙালিদের মুখে হাতশার ঘন কালো ছায়া। অনেকের মুখ-বুক শুকিয়ে গেছে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হওয়ার খবর পাঠ করে। সবার মুখের কথা যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি এর আগে কোনোদিন সপ্তম নৌবহরের নাম শুনিনি। এই প্রথম সপ্তম নৌবহরের নাম শুনলাম এবং এর ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে হতাশা এবং নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের বৃদ্ধ কমান্ডিং অফিসার সিলেটের মেজর এম. আর. চৌধুরী একদিন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, খবর পড়েছেন, ইউএসএ-র সেভেনথ ফ্লিট এগিয়ে আসছে ভারত মহাসাগরের দিকে। এর শেষ গন্তব্যস্থল বে অব বেঙ্গল অর্থাৎ আমাদের বঙ্গোপসাগর। এবার সামলাবেন কিভাবে?

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসার মেজর এম. আর. চৌধুরীর কথা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার স্পষ্ট ধারণা হলো আর আমাদের স্বাধীনতা হবে না। সর্বগ্রাসী যে মার্কিন দানব আসছে তা আমাদের শুদ্ধ গিলে ফেলবে। ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীও একদিন মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সামরিক সাজসজ্জা সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করেছিলেন। কলকাতায় সবার মুখে শুধু সপ্তম নৌবহরের কথা। এ সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প-কাহিনী মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর ঠেকায় এ সাধ্য কার?

এশিয়ায় ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাকি এই সপ্তম নৌবহর অংশগ্রহণ করেছিল। ঢাকায় একবার টেলিভিশনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবিতে দেখেছিলাম কিভাবে মার্কিনী কালো বোমারু বিমানগুলো সমুদ্রবক্ষ জুড়ে বিস্তৃত ভাসমান জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে ভিয়েতনামের ওপর বোমা ফেলে আবার জাহাজে ফিরে যাচ্ছে। এই একই দৃশ্য এবার আমার চোখে ভেসে উঠলো। আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম বঙ্গোপসাগরের বুক জুড়ে বিস্তৃত মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ সপ্তম নৌবহর থেকে যেন আকাশ কালো করে ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন বোমারু বিমান উড়ে এসে আমাদের বাংলাদেশের ওপর আঘাত হানছে। এসব বোমারু বিমানের বোমা হামলায় বাংলাদেশের ঘরবাড়ি, ফসল, জমি ও ঝাড়-জঙ্গল যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরিত বোমার কালো ধোঁয়ায় যেন চারদিক

আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সেখানকার কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহল মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগর অভিমুখে আগমনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন।

সবার মধ্যে চিন্তা-উদ্বেগ ও চরম হতাশা দেখে আমার মনে হয়েছিলো আমরা যেন অনিবার্য কেয়ামতের দিকে যাচ্ছি। কিংবা কেয়ামত যেন ঘনিয়ে আসছে আমাদের গ্রাস করার জন্যে।

দীর্ঘদিন পর এ পরিস্থিতিতে একদিন রাতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের অফিস-কাম-শয়নঘরে ঢুকলাম শাহাবুদ্দিন এবং নূরুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী টেবিলের সামনে ঘাড় নুইয়ে একাগ্রচিত্তে কাজ করে চলেছেন। কারা তাঁর ঘরে ঢুকেছে মাথা তুলে না তাকিয়েও তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিছুক্ষণ পর হাতের কাজ বন্ধ করে মাথা তুলে তিনি বললেন, তারপর খবর কি বলো তোমাদের?

তাঁর মুড ছিল তখন প্রসন্ন। সপ্রতিভ। আমাদের মধ্য থেকে নূরুল ইসলাম বললেন, পত্রপত্রিকায় যে খবর দেখতে পাচ্ছি তাতে তো খবর খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

নূরুল ইসলাম ভাইয়ের কথায় চরম হতাশার সুর। আমারও মনে হচ্ছিলো যেন ঘনায়মান কেয়ামতের আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে গিয়েছি। মনে হচ্ছিলো, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর এতদিনকার বাকবিমুখতার অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কথা বলার জন্যে উন্মুখ। কোন কোন খবরের কথা বলছো? মার্কিন রণতরী আসার কথা বলছো তোমরা? আসুক। একটা কিছু ফয়সালা তো হবে। হয় জিতবো নয়তো মরবো। একটা কিছু তো হবে। মার্কিন সেভেনথ ফ্লিট আসছে তাতে ভয়ের কি আছে, আসুক।

তাঁর কণ্ঠে বেশ সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ের সুর। বললেন, এখন আর আমরা দুর্বল নই। এখন আর আমরা একা নই। বহির্বিশ্বে এখন আমাদের মিত্র আছে। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের মোহনা হতে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। সে ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি। সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌবাহিনীর এক্সপার্টরা ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে ঢোকার মোহনায় গভীর পানির নিচে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাইন পুঁতে রেখেছেন। ওরা আর ফিরে যেতে পারবে না। আমরা চাই তারা আসুক। এটা ভিয়েতনাম নয়। তাদেরকে এটা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের মুখে রাষ্ট্রনায়কসুলভ প্রত্যয়দীপ্ত কথা শুনে প্রাণে আমার আশার দীপ জ্বলে উঠেছিল। আর গলায় ঢোক গেলার মতো পানি ফিরে এলো। তবে এ সম্পর্কে আরো কিছু জানার জন্যে মন আমার আনচান করছিল। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের এ অত্যাসন্ন মুহূর্তে কোনো ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করার মতো সাহস আমার ছিল না। কারণ মুজিবনগর এসে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রথম যে সবক শিখেছিলাম তা হলো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। নেতৃবৃন্দ যা বলেন বা বলবেন তা শুধু শুনতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর এই সুপ্রসন্ন মুড দেখে তাঁকে কয়েকটি ব্যাপারে প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে

পারলাম না। তবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, কি ব্যাপার নজরুল, একবারে চুপ কেন? যুদ্ধ হবে বলে মনে হয় নাকি? পত্র-পত্রিকায় যে সব খবর বের হচ্ছে তাতে তো মনে হয় যুদ্ধ অনিবার্য। পাকিস্তান যুদ্ধ করুক আর না করুক আমাদেরকে তো যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ ছাড়া আমরা দেশ মুক্ত করতে পারবো না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে কোনো বড় রকমের যুদ্ধ এড়িয়ে সমঝোতার মাধ্যমে একটা কিছু করার। সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা আসে না। এখন কালক্ষেপণ করার কোনো অবকাশ নেই। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমাদের দেশের মানুষ ও সম্পদ কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করছি। এ সম্পর্কে মিত্রবাহিনীর সমরনায়কদের সঙ্গেও আমরা সরাসরি কথা বলতে পারবো না। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আগামী কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় আসছেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবো। কলকাতায় তিনি জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মুখে একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো—যেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে।

ইন্দিরা গান্ধী, যিনি হতভাগ্য বাঙালিদের তাঁর দেশে আশ্রয়-আহার দিয়েছেন, পাকিস্তানীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচানোর জন্যে নিজ দেশের উপর যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন—সেই মহিলাকে একবার দেখার স্বপ্ন কলকাতায় আসার পর থেকেই মনের কোণে ধারণ করছিলাম। ভাবতে পারিনি কোনোদিন উপমহাদেশের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নেতা পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর প্রিয়দর্শিনী কন্যা, মহাত্মা গান্ধী আর রবিঠাকুরের স্নেহধন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ আমার জীবনে পাবো।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতায় আসার এবং প্রকাশ্যে জনসভা করার খবর শুনে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করলাম। এ সময় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও আমার মতোই আনন্দিত হয়েছিলেন এ খবর শুনে। নূরুল ইসলাম ভাই আনন্দে উদ্বেল হয়ে বললেন, তাহলে আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে পাবো, কি আনন্দ!

যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসার জন্যে মনের কোণে উঁকিঝুঁকি করছিল এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা আসার খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা তরঙ্গে চাপা পড়েছিল তা আবার উঁকি দিয়ে উঠলো। কারণ, আবার কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের কাছে আসার সুযোগ পাবো কিনা, তাই সেদিনই তাঁর কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে জানার আমার আগ্রহই জেগে উঠলো। নূরুল ইসলাম ও রহমত আলীর তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনের ফাঁক দিয়ে আমি জানতে চাইলাম বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আজ নয় অন্যদিন কথা হবে।

॥ আটত্রিশ ॥

মার্কিন সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগর অভিমুখে ধেয়ে আসছিল। মানবতাবিধ্বংসী এই মার্কিনী দানবকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্যে ভারত-সোভিয়েত যৌথ শক্তির পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত ছিলাম বলে আমরা মুজিবনগরীরা মোটামুটি স্বস্তিবোধ করছিলাম। আমাদের কারো কারো মধ্যে দেমাগ বেড়ে গিয়েছিলো। সপ্তম নৌবহর কিছুই করতে পারবে না, বঙ্গোপসাগর তো দূরের কথা ভারত মহাসাগরেই তো ঢুকতে পারবে না। রাশিয়ার মাইন পোতা রয়েছে ভারত মহাসাগরের মোহনায়। ওখানে আসমাত্র পানির নিচের মাইনে লেগে সপ্তম নৌবহর খানখান হয়ে উড়ে যাবে। কাজেই কুচ পরোয়া নেই এমনই একটি ভাব।

মুজিবনগরীদের মধ্যে কারে কারো মুখে শুনেছি দুই পরাশক্তি ভারত মহাসাগরেই মুখোমুখি হবে এবার। মুজিবনগর এবং ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দ ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহরের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে হুংকার তুলছেন। সাবধান করে দিচ্ছেন ভারত মহাসাগর মোহনায় সপ্তম নৌবহর প্রবেশের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে। দিল্লী, মস্কো, বিবিসি, এমনকি ভয়েস অব আমেরিকা—প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বময় খবর প্রচার করা হয় ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রবেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। সোভিয়েট ব্লকের দেশগুলোও সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগরে প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। এভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে নিক্সন প্রশাসনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিপক্ষে মোড় নেয়। এমন কি, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রয়াত জন এফ কেনেডির স্বনামধন্য ভ্রাতা সিনেটর কেনেডির নেতৃত্বে খোদ মার্কিন মুলকে বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো জনমত গড়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবতাবাদী মানুষ বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কসহ মার্কিন মুল্লুকের বড় বড় শহর ও নগরীগুলোতে এবং সারা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ প্রশ্নে অবাঞ্ছিত মার্কিনী কালো থাবা বিস্তারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভ, নিন্দা ও বুলন্দ আওয়াজ ওঠে। সারাবিশ্বের মানবতাবাদী ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ গর্জে ওঠে মার্কিন আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে। বিশ্ব-বিবেক এক অখণ্ড শক্তিতে হুংকার দিয়ে ওঠে। লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বড় বড় শহর ও নগরীতে মার্কিন বিরোধী গণমিছিল যেন সপ্তম নৌবহরের চেয়েও শত সহস্রগুণ বেশি শক্তি নিয়ে গর্জে ওঠে। বাংলাদেশের এমনই এক অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলিম জাহানের ঘৃণিত শত্রু ইসরাইলও নাকি বাংলাদেশকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। মুজিবনগর সককারের নেতৃবৃন্দের কাছে একথা শুনেছিলাম। কিন্তু মুজিবনগর সরকার চরম দুঃসময়েও ইসরাইলের এই অযাচিত সাহায্যপ্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বিশ্বব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর অভিমুখে আর এগুতে সাহস পায়নি। বিশ্বজনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় হোয়াইট হাউজের নিক্সন প্রশাসন। শান্তির ললিতবাণীর কাছে অশান্তির ক্রোধান্ধ

দানবের অস্ত্র, শক্তির দম্ভ পরাভূত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শ্বেতকপোত বিশ্বের দেশে দেশে শান্তির পক্ষে মানবতার বিবেক জাগ্রত করেছিলো। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে দিল্লী-কলকাতাসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে পাকিস্তানী দূতাবাসে নিয়োজিত কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে অন্যান্য দেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী কূটনৈতিক মিশনের বাঙালি কূটনীতিকরাও একের পর এক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গোটা বিশ্বপরিস্থিতি এসময় বাংলাদেশের অনুকূলে। পাকিস্তান ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসররা নিন্দিত হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা-মিত্রবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মরণযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ইসলামাবাদের পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সবরকমের যোগাযোগ এবং সামরিক রসদ সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠন ও বরেণ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে অসংখ্য বাণী আসছে। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানানো হয়েছে এসব বাণীতে। এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো বিশ্ববরেণ্য মনীষীরাও সেদিন চুপ হয়ে থাকতে পারেননি বাংলাদেশে মানবতার আহাজারি দেখে।

এমনই আনন্দঘন এক মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘরে প্রবেশ করার মতো এক দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিলো আমাদের কয়েকজনের। আলোচনা হচ্ছিলো বাংলাদেশের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় মুহূর্তে এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার চীনপন্থী বাম রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ছড়ানো নানা গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা সম্পর্কে। মুজিবনগরীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, তোমাদের আর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। মিত্রবাহিনীর ছদ্মবেশে যে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে তারা আর কোনোদিন ভারতে ফিরে আসবে না তোমাদের সাধের বাংলা ছেড়ে। তোমাদের দেশ এখন স্থায়ী রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। চীন আর বসে থাকবে না। চীন পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে এবার ১৯৬১ সালের যুদ্ধে ভারতের কাছে হারানো এবং ভারত চীনের কাছে হারানো কিছু সীমান্ত এলাকা উদ্ধারের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং চীন ভারতের যুদ্ধের ক্ষেত্র হবে এবার বাংলাদেশ। তোমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালি সৈনিকরা এখন ভারতীয় সেনা কমাণ্ডের অধীনে থেকে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এতে তোমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ চাপা পড়ে যাবে। এই যুদ্ধ কত বছর চলবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মোট কথা, তোমরা যত তাড়াতাড়ি স্বাধীন দেশে ফিরে যাবে বলে ভাবছো তা হবে না।

বিজয়ের এমন শুভমুহূর্তে কলকাতার বামপন্থী মহলের এ ধরনের বিষমিশ্রিত কথাবার্তা শুনে আমাদের কারো কারো মাথা হতাশায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো বইকি। আমরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আমিও মনে করতাম এসব গুজবও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবু মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়ে পড়তো।

প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনলাম এসব গুজবের কথা। তিনি আমাদের প্রতি কিছু ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, যারা এসব গুজব ছড়াচ্ছে তাদের চেয়ে দেখছি তোমরাই বেশি ক্ষতি করবে। তোমরা এখনো আমাদের স্বাধীনতার শত্রুমিত্র চিনতে পারোনি। এ মুহূর্তে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে আর বোঝাবার মতো সময় আমার নেই। তবে জেনে রাখো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। কোনো গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখার কোনো সুযোগ আর এখন নেই। ভারতের সঙ্গে আমরা মৈত্রী চুক্তি করেছি। এ চুক্তির ভিত্তিতেই ভারতীয় বাহিনী ও আমাদের মুক্তিবাহিনী মিলে মিত্রবাহিনী গঠন করেছি। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির ভিত্তিতে ভারতীয় বাহিনী তথা মিত্রবাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর সহায়ক শক্তি হয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে। কে হিন্দু বা কে মুসলিম, এ জিজ্ঞাসা করার সময় এখন নয়। এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাহত মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাকে ফিল্ড হাসপাতালে বাঁচানোর জন্যে কার রক্ত দেয়া হচ্ছে কিংবা দেয়া হবে-এ জিজ্ঞাসা করার সময় এখন নয়। ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাবে কিনা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই সব দেখা যাবে।

স্বার্থ ছাড়া দুনিয়ায় কিছু নেই। সন্তানের জনক-জননী হওয়ার স্বার্থে খারাপ সন্তান জন্ম দেন। আল্লাহ মাফ করুন, আল্লাহর নাম দুনিয়াতে প্রচার এবং আল্লাহকে অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নিয়ে তাঁর আদেশ নির্দেশ পালন করার স্বার্থে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারত দুর্দিনে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য ব্যয় করছে। চীন যদি এ সময় এসে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে আমরা কি চুপ করে বসে থাকবো? আমাদের মুক্তিবাহিনী কি চীনা সৈন্যদের স্যালুট করবে? চীন তো শোষিত নির্যাতিত বাঙালিদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বরং শোষক ও নির্যাতনকারী গণহত্যাকারী পাকিস্তানীদের পক্ষ নিয়েছে। পাকিস্তান কি শোষণমুক্ত মাও সেতুং রাজ কায়েম করেছিলো পাকিস্তানে? না, কায়েম করবে? চীন তার রাজনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। ভারতও তার স্বার্থে আমাদেরকে সাহায্য করছে। আমরাও নিজেদের স্বার্থে ভারতের সাহায্য নিচ্ছি। ভারতীয়-বাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যুদ্ধের কারণে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে, দ্বিখণ্ডিত হবে। তা না হলেও আমাদের স্বাধীনতা হবে না। পাকিস্তান ভেঙ্গেই তো আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে। পাকিস্তান ভাঙলে দুর্বল হবে। এতে ভারতের সুবিধা হবে। ভারত এতে লাভবান হবে। ঠিক এটাই ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ। সবই সত্য। কিন্তু পাকিস্তান শক্তিশালী হলেই আমাদের বাঙালিদের কি লাভ হবে?

শক্তিশালী পাকিস্তানে আমরা ছিলাম। কিন্তু কি লাভ হয়েছে? শুধু শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যানত-নিপীড়ন ছাড়া আর কি পেয়েছি আমরা গত চব্বিশ বছরে? পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বাঙালি কয়জন? মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ হতে পারে। তাও তো মেজর র‍্যাংকের উপরে বড় একটা নেই। ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ সৈন্য ও অফিসার পাঞ্জাবী, বেলুচি ও পাঠান। সেই শক্তির মধ্যে আমাদের অংশীদারিত্ব কোথায়? ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতো তাহলে কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ করতো? আমাদের বাংলাদেশও তো ভারত আক্রমণ করতো। তাহলে আমাদেরকে রক্ষা করতো কে? শক্তিশালী পাকিস্তানের শক্তি নিয়োগ করতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তান না হয়

তার শক্তি প্রয়োগ করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত কাশ্মীর দখল করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ তো ভারত দখল করে নিতো, তাতে আমাদের কি লাভ হতো? কোনোদিক দিয়েই বাংলাদেশের কোন লাভ নেই পাকিস্তানে থেকে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আমরা কি দেখেছি? কোথায় শক্তিশালী পাকিস্তান? পাকিস্তান যদি শক্তিশালীই হবে, তাহলে ভারতীয় বাহিনী ৬৫ সালের যুদ্ধে লাহোরের কাছাকাছি পৌঁছেছিলো কেমন করে? সেদিন তো আমাদের বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারী সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, জাঁদরেল সামরিক কর্মকর্তা, যুদ্ধ বিমান, বড় বড় যুদ্ধজাহাজ, সমর-সরঞ্জাম সবই তো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এসব আমাদের কি কোনো কাজে লাগাবার সুযোগ ছিল ভারতের মোকাবিলার জন্যে? পাকিস্তান এসব সমরসামগ্রী সেদিন বাংলাদেশে নিতে চাইলেই কি ভারত তার সীমানার ভেতর দিয়ে সমর সরঞ্জাম বাংলাদেশে নিতে দিত? তাহলে পাকিস্তান কেমন করে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশকে রক্ষা করতো?

৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তো লাহোরসহ পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী শহরের লোকজনেরাই ভয়ে নিজেদের বাড়িঘর ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলো। তাহলে পাকিস্তানের শক্তি সেদিন কোথায় ছিল? পাকিস্তানের খেমকেরান সেক্টরে সেদিন বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি জওয়ানরা যদি লাহোর অভিমুখী ভারতীয় বিশাল ট্যাংক বাহিনীর অগ্রগতি রোধ না করতো তাহলে তো ৬৫ সালে পাকিস্তান লাহোর শহর রক্ষা করতেই পারতো না। ভারতীয় বাহিনীর কামানের রেঞ্জের আওতায় এসে গিয়েছিলো লাহোর শহর। তবে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। সেদিন আমরা আমাদের বাঙালি সৈনিকদের অপরিমিত তেজ, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম। বাংলার কৃষক সন্তান, বাংলার যুবকদের অসীম সাহসের পরিচয় পেয়েছিলাম। বাঙালির এই অমিততেজ, শক্তি-সাহস ও সামর্থকে আমরা ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আবিষ্কার করেছিলাম। সেই শক্তিকে সংগঠিত করে নিজেদেরকে বর্হিশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পাকিস্তান তা করতে দেয়নি। তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করে নাই। আমাদেরকে চিরকাল তাদের উপর নির্ভরশীল রাখতে চেয়েছিলো। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি সেনা অফিসার ও পদস্থ সিভিল অফিসারকে তারা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো। বাঙালিদের মনোবল চিরতরে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলো তারা। তাহলে শক্তিশালী পাকিস্তান হলে তাতে আমাদের বাঙালিদের কি লাভ হতো? পাকিস্তান নামক খোয়াড়ে আটকিয়ে রেখে বাঙালিদেরকে পিষে পিষে হত্যা করার, বাঙালির শক্তি-সাহস, শৌর্য-বীর্য, সুপ্ত মেধা ও প্রতিভাকে তিলে তিলে পিষে পিষে মারার তথাকথিক শক্তিশালী পাকিস্তান আমরা চাই না, চাইতে পারি না। পাকিস্তান কোনোদিন বাঙালিদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না। তাই এই শক্তিশালী পাকিস্তানকে আমরা দুর্বল করতে চাই। পাকিস্তান আমাদের বিকাশের পথে বড় বাধা এবং পয়লা নম্বরের দুশমন। এই দুশমনদের হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। এই মুক্তির জন্যে আজ আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। অস্ত্র ধরেছি। যুদ্ধের এই অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের মুহূর্তে আমরা

কোনো অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবো না। কোনো গুজবে কান দেবো না এবং দিতে পারি না। এবার হয় বিজয়, না হয় মরণ। এর মাঝখানে আমাদের জন্যে আর কিছু নেই। যে যাই বলুক ভারতীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুশমনদের তাড়িয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করবোই। শত্রুর মোকাবিলায় এ মুহূর্তে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, তারাই আমাদের মিত্র।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় আমার পাশে বসা নূরুল ইসলাম ভাইয়ের চোখ আবেগাশ্রুতে টলটলায়মান। আমাদের বাকরুদ্ধ হয়ে এসেছিলো। আর কোনো কথা না তুলে অনেক জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমরা। আমাদের মন-মেজাজ তেজোদৃপ্ত হয়ে উঠলো। চেতনা শাণিত হলো। আমার মনে হলো, সপ্তম নৌবহরের নিচে পড়ে এখন হাসিমুখে জীবন দিতেও আর কোনো ভয় পাবো না আমরা।

॥ উনচল্লিশ ॥

একাত্তরের নবেম্বর মাসের শেষ দিকে কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে খবর বের হয় যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় আসছেন। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়ার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা সফরের বিশেষ তাৎপর্যের কথা অত্যন্ত গুরুত্ববহ বলে কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলোর খবরে উল্লেখ করা হয়। খবরে বলা হয় যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় দুদিন অবস্থান করবেন এবং অত্যন্ত কর্মব্যস্ত দিন যাপন করবেন। কলকাতা অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ৩ ডিসেম্বর মিসেস গান্ধী কলকাতার বিখ্যাত গড়ের মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে অবস্থানরত বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকার দেবেন কলকাতায়। মোটকথা, কলকাতায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচীর জালে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন।

আমরা মুজিবনগরীরা ভীষণ খুশি। নেহেরুকন্যা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাবো, তাঁর কথা শুনতে পারবো। কাজেই আনন্দের আর সীমা ছিল না এপার বাংলার বাঙালিদের মধ্যে। কলকাতায় অবস্থানরত বাংলাদেশের 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' গোছের পণ্ডিত বিশ্লেষকরা রীতিমতো এখানে সেখানে আসর বসিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা সফরের তাৎপর্য সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে দিলেন এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য দিয়ে চারপাশের উন্মুখ শ্রোতাদের মোহিত করে রাখলেন।

কলকাতায় ইন্দিরা বরণের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। থিয়েটার রোডের অন্দরে, বিশাল গড়ের মাঠে মঞ্চ তৈরি হচ্ছে জনসভার জন্যে। অনিবার্য অত্যাসন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে কলকাতায় কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের চেয়েও কলকাতায় অবস্থানরত এপার বাংলার

বাঙালিদের আগ্রহ বেশি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের হাজার হাজার শরণার্থীর মিছিলের পদভার এবং জয় বাংলা শ্লোগানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে কলকাতা মহানগরী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। জনতার উত্তাল স্রোত অবিশ্রান্ত ধারায় বয়ে চলে গড়ের মাঠের দিকে। ইন্দিরা তুমি এগিয়ে যাও, মুজিব বাঁচাও, বাঙালি বাঁচাও। তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, পদ্মা-মেঘনা যমুনা— তোমার আমার ঠিকানা। এক বাংলা একদেশ, বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, মুজিব-নজরুলের বাংলদেশ ইত্যাদি শ্লোগানে কলকাতার রাজপথ মুখরিত।

কলকাতায় মানুষ অবাক-বিস্ময়ে দেখে দেশ থেকে বিতাড়িত হাজার হাজার বাঙালি নারী-পুরুষের এই মিছিল। নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং ভিন্ন দেশে আশ্রিত অনাহারী-অর্ধাহারী ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত শীর্ণকায়া লাখো লাখো বাঙালির শ্লোগান ও আহাজারীতে কলকাতা নগরবাসীর হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কলকাতার বাঙালিরাও এপার বাংলার বাঙালিদের এই মিছিলে যোগ দিয়ে মিছিলের বিশালত্বকে বাড়িয়ে তোলে। তারাও মিছিলে যোগ দিয়ে এপার বাংলার বাঙালিদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্লোগান তোলে। কলকাতার রাজপথে এ এক নয়নাভিরাম দৃশ্য।

আমার ধারণা হয়েছিলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ গড়ের মাঠে ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় যাবেন। তাহলে সঙ্গে গিয়ে অন্তত ইন্দিরা গান্ধীকে কাছ থেকে দেখতে পাবো। এ স্বপ্ন নিয়ে আমরা ক'জন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমরা মনে মনে নিজেদেরকে খুব ভাগ্যবান ও ভিআইপি বলেও মনে করছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানতে পারলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কিংবা শীর্ষস্থানীয় কোনো সরকারি কর্মকর্তার ভিআইপি হিসেবে গড়ের মাঠে ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই এবং ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের যাওয়ার কোনো প্রশ্নও ওঠে না। বরং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের জনৈক বিজ্ঞ কর্মকর্তার কাছ থেকে মৃদু ভর্ৎসনা পেলাম। উক্ত কর্মকর্তা বললেন, আপনারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কিছুই বোঝেন না। আপনাদের নিয়েও আরো বেশি বিপদ দেখছি। মুজিবনগর সরকারের কোনো নেতা বা মন্ত্রী কলকাতায় থাকেন নাকি? তাঁরা ভারতীয় সীমানার মধ্যে নেই। এমনকি আমরা যারা এখানে রাষ্ট্রীয় কাজ করছি তারাও তো কেউ ভারতীয় এলাকার মধ্যে নেই। আমরা সবাই বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে মুজিবনগরে আছি। আর আমাদেরকে তো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে এখানে বাংলাদেশের যারা শরণার্থী এবং মুজিবনগর সরকারের কোনো উচ্চপদে বহাল নেই, এমন ব্যক্তিরা যেতে পারে শ্রীমতী গান্ধীর জনসভায়। আপনারা ইচ্ছে করলে শরণার্থী মিছিলের সঙ্গে গড়ের মাঠের জনসভায় যেতে পারেন। উপমহাদেশে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের এ মুহূর্তে বহু বিদেশী সাংবাদিক এখন কলকাতায়। মিসেস গান্ধী কলকাতার জনসভায় কি ঘোষণা দেন তা শোনার জন্যে বিদেশী কূটনীতিকরাও তাদের চেম্বারে বসা নেই। সবারই চোখ এখন কলকাতার গড়ের মাঠের দিকে।

মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্ব ভারতের মাটিতে, এটাই তো আমরা বিশ্বের কাউকে জানতে দিই নাই। এবং দেবোও না।

উক্ত কর্মকর্তার কথাবার্তা ও উপদেশবাণী আমাদের কারো কাছে বিষের মতো মনে হচ্ছিলো। কারণ, আমাদের নেতারা ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় যাবেন না। তাই আমরাও ভিআইপি এলাকায় মঞ্চের কাছে স্থান পাবো না এবং কাছে থেকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে পাবো না। আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

আমার এত আশার উজ্জ্বল মুখ নিস্প্রভ হয়ে গেলো। জওয়াহেরলাল নেহরুর সুযোগ্যা কন্যা ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধীকে কাছ থেকে দেখার যে রঙীন ফানুসটি তীব্র গতিতে কল্পনার আকাশে উড়ছিলো, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের বিজ্ঞ কর্মকর্তার কথায় তা ফেটে গিয়ে যেন মাটিতে পড়ে গেলো। নিভে গেলো ইন্দিরা দর্শনের আশার দীপটি। দূরে থেকে এই বিশাল জনসমুদ্রের একপ্রান্ত থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে পাবো না। তাঁকে দেখার জীবনের এই সুযোগ। এ সুযোগ হারালে আর কোনদিন পাব না। তাই অন্যান্যের কথা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করতে লাগলাম। যেভাবেই হোক ভিআইপি কিংবা সাংবাদিক গ্যালারীতে বসার জন্যে আমাকে পাস সংগ্রহ করতে হবে।

আমার মনে কিছুটা ভরসা ছিল কলকাতার সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে প্রেস গ্যালারীতে বসার সুযোগ পাবো যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কলকাতায় আসার পর ইউএনআই'র যে সাংবাদিক বন্ধুটি একদিন আমাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, তাঁর কথা এ মুহূর্তে বারবার মনে হতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে এখন পাওয়া যাবে কোথায়? প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রেস দফতরের কর্মকর্তারা সব এখন কলকাতায়। ইউএনআই'র ওই বন্ধু যিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রেস দফতরের কর্মকর্তাদের বিশ্বস্ত ও আস্থাবান লোক বলে নিজেকে আমার কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই সাংবাদিক বন্ধুটিকে আমি হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলাম। আমার অফিস থেকে ইউএনআই অফিসে টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, ওই বন্ধু এখন কলকাতায় নেই। তিনি কলকাতার বাইরে বোম্বে অথবা দিল্লীতে। পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়িত্ব তাঁর উপর। তাই তিনি এখন কলকাতায় নেই এবং খুব শীঘ্র কলকাতায় ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম, আর বুঝি সুযোগ হবে না ইন্দিরা গান্ধীকে কাছে থেকে একবার দেখার।

আমাদের জেনারেল ওসমানীর এডিসি ক্যাপ্টেন নূরকে বললাম আমার ইচ্ছের কথা। তিনি আমাকে আরো এক লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলে দিয়ে বললেন, কি বলছেন নজরুল সাহেব! আপনি মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী সাহেবের পিআরও। স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর একজন কাছের মানুষ, তদুপরি একজন সাংবাদিক। আপনি যদি কলকাতার বাজারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় ভিআইপি গ্যালারীর পাস যোগাড় করতে না পারেন তাহলে মনে করতে হবে আপনি একজন ইনএফিসিয়েন্ট পিআরও। আমরা তো আরো আপনার আশায় রয়েছি যে আপনি আমাদের জন্যে কিছু ভিআইপি গ্যালারীর পাস যোগাড় করে দেবেন। এখন শুনছি আপনি আপনার নিজের পাসই এনশিওর করতে

পারেন নাই। আপনি কেমন পিআরও হলেন, প্রতিদিন ইস্টার্ন কমাণ্ডের পিআরও কর্নেল রিখীর কাছে যান। তাঁর ড্রয়ার টান দিলেই তো বহু পাস পাওয়া যাবে। ইন্দিরা গান্ধীর জনসভার পাস পান নাই একথা আর বলবেন না কারো কাছে। তাতে আমাদের প্রেসটিজ থাকবে না। যান যেখান থেকে পারেন অন্তত আপনার পাস সংগ্রহ করুন। কারণ, দেখবেন জনসভার পর জেনারেল সাহেবই আপনার কাছে জানতে চাইবেন কলকাতায় শ্রীমতি গান্ধীর জনসভা সম্পর্কে। তখন মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। প্লিজ ট্রাই টু এস্টাবিলিশ ইউর ক্রেডিবিলিটি এজ পিআরও অব বাংলাদেশ ফোর্সেস।

॥ চল্লিশ ॥

বিয়ের লগ্নে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি যেমন মেহেদি পরা ষোড়শী কন্যার হৃদয়ে এক আনন্দ শিহরণের জোয়ার বইয়ে দেয় এবং পরক্ষণেই আবার এক অজানা সংশয় হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ও চোখকে অশ্রুসজল করে তোলে, তেমনি যুদ্ধের পূর্বলগ্নে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের এক রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভূতির মাঝেও কি যেন এক অজানা সংশয়-আশংকা, দুঃখ-বেদনা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত এবং চোখকে করেছিল মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশের মতো সজল।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম-ত্রিপুরা সীমান্তে অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত বিশাল ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশের চারপাশ ঘিরে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলোতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর চৌকস বিমানসেনারা বোমা বোঝাই বোমারু বিমান নিয়ে চোখের পলকে বাজপাখির মতো শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্যে উপরের নির্দেশের প্রতীক্ষায়। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ছোটখাট সংঘর্ষের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠার খবর ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে বের হচ্ছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের উত্তাপের তাপ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং কলকাতায় অবস্থানরত এপার বাংলার বাঙালিদের গায়ে অনুভূত হয়েছিল।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ নানা অজানা ভাবনা-চিন্তায় ভারাক্রান্ত। চোখ তাঁদের অশ্রুসজল। বাক প্রায় রুদ্ধ। আট নম্বর থিয়েটার রোডের দফতরে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দু'চোখ অশ্রুসজল। তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমা হামলায় বাংলাদেশের ঘরবাড়ি, জনপদ, ঝাড়-জঙ্গল হয়তো মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পথে-ঘাটে-প্রান্তরে হয়তো বোমা হামলায় নিহত লাখ লাখ নারী-পরুষ ও নিষ্পাপ শিশুর লাশ পড়ে থাকবে। রাস্ত াঘাটে হয়তো স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালির রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে। বাড়িঘর, কলকারখানাগুলো হয়তো বোমা হামলার আগুনে জ্বলতে থাকবে। ভয়ার্ত-কাপুরুষ পাকিস্তানী সৈন্যরা মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত হামলা থেকে প্রাণে বাঁচার লক্ষ্যে হয়ত বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাঙালি জনগণের মধ্যে অবস্থান নেবে এবং মিশে যাবে। শত্রুপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তখন হয়তো মিত্রবাহিনীর বোমা হামলা কিংবা কামানের জ্বলন্ত গোলা নিরাপরাধ বাঙালিদের ধ্বংস করবে।

নয়টি মাস ধরে রক্তপিপাসু পাকিস্তানী হায়েনা বাহিনীর হিংস্র থাবা থেকে জীবন রক্ষার জন্যে অসহায় বাঙালি নারীপুরুষ ও শিশু প্রিয়জনসহ অসহায় হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। একটি দিনও শান্তিতে থাকতে পারেনি। নিশ্চিত-নিরাপদে একবেলা পেট ভরে খেতে পারেনি হায়েনা বাহিনী ও তাদের এদেশীয় ভাড়াটে দোসরদের ভয়ে। এখন এই অসহায় ও নিরপরাধ মানুষগুলো হয়তো মিত্রবাহিনীর বিমান হামলা ও কামানের গোলার শিকার হবে। হয়তো ইতিহাসের ভয়াবহতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকি নগরী ধ্বংস হওয়ার মতো ঢাকা মহানগরী, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, আদমজী, ঘোড়াশাল, খুলনা প্রভৃতি শিল্পএলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। বাংলার পথে-প্রান্তরে এখানে-সেখানে হয়তো চোখ, হাত-পা হারা আহত পঙ্গুদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার আকাশ ভারাক্রান্ত।

নবেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে কলকাতার ইস্টার্ন কমাণ্ডের গণসংযোগ দফতর এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরের সামরিক কর্মকর্তাদের মুখে ভারতে নতুন তৈরি স্ন্যাপ জাতীয় খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানের কথা উচ্চারিত হচ্ছিলো। বলা হতো বিমানটি দেখতে খুব ছোট, হাল্কা-পাতলা ধরনের, দ্রুত উড়তে এবং চোখের নিমিষে-শত্রুর অবস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করে দ্রুত পালিয়ে যেতে সক্ষম। বিমানটি এতো ত্বরিত গতিতে ডাইভ দিতে এবং আকাশের বুকে উল্টে-পাল্টে ঘুরপাক খেতে পারে যে, নিচ থেকে শত্রুর বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলাও এই বিমানকে স্পর্শ করতে পারে না। ভারতের নব আবিষ্কৃত এই বিমানটি এবার বাংলাদেশের আকাশে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর পরীক্ষা করা হবে। ভারতীয় সমরবিশারদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রবীণ সাংবাদিকরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিলো নব আবিষ্কৃত এই বোমারু বিমানের কার্যকারতা ও সাফল্য দেখার জন্যে। সে সময় ভারতের এই স্ন্যাপ বিমান ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে খুব আলোচিত বিষয়। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের নব আবিষ্কৃত স্ন্যাপ বিমানের ব্যাপক আক্রমণক্ষমতা ও কার্যকরিতা সম্পর্কে রীতিমতো সবার মধ্যে পরম আস্থার ভাব সৃষ্টি করে ফেলেছিলো। এই বিমানের কিছু ছবি এ সময় ভারতের পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এখানে-সেখানে আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজবে সকলের মুখে একই কথা, এই স্ন্যাপ বিমানের নাগাল পাবে না পাকিস্তানের ক্রয় করা পুরনো মডেলের স্যাবর জেট বিমান। পাকিস্তানীদের এন্টি-এয়ারক্রাফট গর্জে ওঠার আগেই ভারতের চৌকস স্ন্যাপ বিমান ডিগবাজি খেতে খেতে চোখের পলকে আকাশের বুকে কোথায় লুকিয়ে তার কোনো হদিসই করতে পারবে না পাকিস্তানীদের মান্ধাতার আমলের বোমারু বিমান। আর বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের বোমারু বিমানই কয়টা? হয়তো দু'চারটা। আট-দশটা বিমান তো ভারতীয় বিমান বাহিনী দু'দিনেই অচল করে দিতে পারে। ওদের পাখাগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে অচল করে দিতে কতক্ষণ, ইত্যাদি কথাবার্তা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হিসাব নিকাশ কলকাতা মহানগরীর এখানে সেখানে আড্ডাখানায়। মোটকথা ওয়ারফিভার শুরু হয়ে গেছে কলকাতা মহানগরীতে। নভেল, নাটক, থিয়েটার, খেলাধুলা, সিনেমা সব কিছুকে ছাপিয়ে তখন ওয়ারকালচার সর্বত্র।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম বাংলার শরণার্থী বাঙালিরা নিশ্চিত যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী হারবে। বাংলাদেশ কয়েকদিনের মধ্যেই হানাদার বাহিনীমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন একটা নয়, ভাবনাও এটা না। ভাবনা বিধ্বস্ত বাংলাদেশে এত লাশ ও রক্তের বন্যা মাড়িয়ে তারা কেমন করে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যাবে, তা নিয়ে। হয়তো কেউ গিয়ে দেখতে পাবে বাড়িঘরের কোনো চিহ্ন নেই। কিংবা আপনজনরা সেখানে লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে। কিংবা চোখ-মুখ, হাত-পা হারিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, কাতরাচ্ছে। কাজেই কলকাতায় এপার বাংলার বাঙালিদের মনেও প্রকৃতপক্ষে সুখশান্তি ছিল না। অবশ্যম্ভাবী বিজয়মুহূর্তে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল এক ভয়ানক বিভীষিকা। আমাদের চোখে মুক্ত বাংলার এক বীভৎস ছবি ভেসে উঠছিলো। আবেগ-উচ্ছ্বাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে গেছে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসছেন কলকাতা মহানগরীতে। কলকাতা মহানগরীতে ইন্দিরাবরণের মহোৎসব চলছে।

তেসরা ডিসেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে ইন্দিরা গান্ধীর জনসভার ভিআইপি গ্যালারীর পাস সংগ্রহ করা আমার তখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেদিন ছিল একাত্তরের পহেলা ডিসেম্বর। হাতে আর সময় নেই। ভিআইপি কার্ড সংগ্রহ করার জন্যে আমি পাগল হয়ে পড়েছিলাম। একটি পাস কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সে ব্যাপারে মিত্রবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের পরামর্শ চেয়েছিলাম। তাঁরা বললেন, প্রধানমন্ত্রীর জনসভার ভিআইপি পাসের ব্যাপার তাঁদের রেঞ্জের বাইরে। তাঁরা নিজেরাই ভিআইপি পাস পাওয়ার এনটাইটেল্ড নন। তবে আমাকে একেবারে নিরাশ না করে কর্নেল রিখীর শরণাপন্ন হওয়ার জন্যে পরামর্শ দিলেন। আমিও মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলাম যে শেষ ভরসাস্থল কর্নেল রিখী। উপায় একটা হবেই।

দোসরা ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমাণ্ডের গণসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে হাজির হলাম। তাঁর কাছে সবিনয়ে আমার ইচ্ছে নিবেদন করলাম। গৈরিক বর্ণের বর্ষীয়ান সৈনিক কর্নেল রিখীর সুন্দর ফর্সা মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা পূরণ সম্পর্কে সরাসরি কোনো সায় না দিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, অপেক্ষা করো। প্রাইমমিনিস্টারের ক্যালকাটা প্রোগ্রাম চেঞ্জ হতে পারে। ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। যে কোনো মুহূর্তে লড়াই বেধে যেতে পারে। কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান বিস্তর সৈন্য মোতায়েন ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তান হিট করে বসলে পিএম দিল্লী ছাড়বেন না। প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর বাতিল হয়ে যেতে পারে। তবে প্রোগ্রাম সম্পর্কে নতুন করে কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কিছু বলা যাবে না। প্রোগ্রাম বাতিলের সম্ভাবনা এইট্টি পার্সেন্ট ধরতে পারো।

কর্নেল রিখীর শুকনো মুখের কথা শুনে বলতে গেলে হতাশায় শরীর আমার শীতল হয়ে পড়েছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা জনসভার ভিআইপি পাস না পেলেও বোধহয় আমি এতটা হতাশ হতাম না, যতটা হতাশ হয়েছিলাম তাঁর কলকাতা প্রোগ্রাম চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনার কথা শুনে।

এ পরিস্থিতিতে ভিআইপি কার্ডের কথা ভুলে গিয়ে মনে মনে জপছিলাম, বাবা ভিআইপি কার্ডের দরকার নেই। ইন্দিরা তুমি কলকাতায় এসো। তোমাকে দেখতে চাই না। শুধু তুমি একবার এসে বলে যাও বাঙালিদেরকে দেশে ফেরত পাঠাবার জন্যে তোমার সরকার কি বা করছে? আমাদেরকে নিরাপদে দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

আমার ভাবান্তর ও হতাশা কর্নেল রিখীর দৃষ্টি এড়ায়নি। সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, চিন্তা করো না। প্রাইমমিনিস্টারের প্রোগ্রাম ঠিক থাকলে তোমার পাসের কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। প্রাইমমিনিস্টারের প্রোগ্রাম জানার জন্যে তুমি কিন্তু কোনো টেলিফোন করবে না। এমন কোনো ভুল করে যেন না বসো। প্রোগাম সম্পর্কে রাতেই তোমাদের প্রাইমমিনিস্টারের দফতরে কনফার্ম করতে পারবে। ওখানেই সব জানতে পারবে। কান খাড়া রেখো।

অফিসে ফিরে গেলে জেনারেল সাহেবের এডিসি ক্যাপ্টেন নূর জিজ্ঞেস করলেন, কি পিআরও সাহেব ভিআইপি কার্ডের ব্যবস্থা হলো? আমি কিন্তু অলরেডী ঘোষণা করে দিয়েছি যে পিআরও সাহেব, একটা পাবেনই। দেখুন আমার মুখ থাকে যেন।

কর্নেল রিখীর আশ্বাসের উপর ভরসা করে ছোট একটা কাশি দিয়ে গালটা পরিষ্কার করে বললাম, আগে তো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় আসুন। তারই তো কলকাতায় আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাস তো কোনো সমস্যা নয়। যাঁর আসার কথা, যাঁর জনসভার ভিআইপি গ্যালারীর জন্যে পাসের ব্যবস্থা, তিনিই যদি না আসেন তো খালি খালি পাস দিয়ে কি হবে?

ক্যাপ্টেন সাহেব লাফ দিয়ে উঠলেন, বলেন কি? মিসেস গান্ধী কলকাতায় আসবেন না? হতেই পারে না। আপনাকে ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে।

আমি মিসেস গান্ধীর না আসার সম্ভাবনার খবর জানিয়ে ক্রেডিট নিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন নূরের কথা শুনে বরং নিজেই বোকা বনে গেলাম। তবে অপেক্ষায় রইলাম রাতের জন্যে। কারণ, রাতেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দফতরে সঠিক খবর জানতে পারবো।

আমাদের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা বললেন, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় আসবেনই। না এলে যুদ্ধের গাইডলাইন পাওয়া যাবে না। আমাদের সরকারের সঙ্গে শেষ কথা বলে তবে ইস্টার্ন সেক্টরে স্ট্রাটেজি ঠিক হবে। এটা তো পলিটিক্যাল ডিসিশনের ব্যাপার। এটা ম্যাসেজ এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব হবে না।

॥ একচল্লিশ ॥

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ৩ ডিসেম্বর কলকাতা সফরের কর্মসূচী সম্পর্কে মুক্তিবাহিনীর সেনা-অফিসারদের ধারণাই সঠিক হয়েছিলো। ২ ডিসেম্বর রাতেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে কনফরমেশন পেয়েছিলাম যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর সকালে কলকাতায় পৌঁছুবেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত শরণার্থী শিবিরগুলোতে খবর পাঠানো হয়েছিলো যেন তারা মিছিল করে কলকাতার গড়ের মাঠে ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় যোগদান করে।

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক সহকারী রহমত আলী পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবিরগুলো সফর করে শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় মিছিল করে যাওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলায় তৎপরতা চালিয়েছেন। নূরুল ইসলাম সাহেব বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত বিচিত্র বর্ণের পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করেছিলেন। বর্ণাঢ্য এসব পোস্টার, ব্যানার ছিল খুবই আকর্ষণীয় এবং বিভিন্ন ভাষায় তৈরি ব্যানার পোস্টারের বাণী সব ভাষাভাষী ব্যক্তিদের বিবেককে জাগ্রত করে তোলার সহায়ক হয়েছিলো। ফাঁসিকাষ্ঠে ফাঁসির ঝুলন্ত রশি আঁকা একটি পোস্টার সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। ইংরেজী ভাষায় লেখা এই পোস্টারের বাণী যে কোনো লোকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলো। ইংরেজীতে লেখা বাণীটি সঠিকভাবে আমার এখন মনে নেই। তবে বাংলায় এর বাণীটি ছিল এ রকম শেখ মুজিবের বিচার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় বিশ্ববিবেকের জন্যে এক চ্যালেঞ্জ। এ বিচার শুধু শেখ মুজিবের নয়, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় বিশ্ববিবেকেরও।

এছাড়া দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসভাবে নারী ও শিশুহত্যার, মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়ার এবং হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর ফেলে সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতের পথে পাড়ি জমানোর হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ছবি সংবলিত হাজার হাজার পোস্টার ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের গড়ের মাঠে সভাস্থলে যাওয়ার পথের দুপাশে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। হৃদয়বিদারক এসব ছবির পাশাপাশি পোস্টারের স্লোগান ছিল—বাংলাদেশে মানবতার এ অপমানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জেগে ওঠো, বিশ্ববিবেক গর্জে ওঠো, সাড়া দাও, ইত্যাদি স্লোগান। ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত বাংলাদেশে গণহত্যার হৃদয়বিদারক দৃশ্য সংবলিত পোস্টার কলকাতা নগরীর পথচারীদের হৃদয়কে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নূরুল ইসলাম সাহেবের তৈরি এসব পোস্টার দেখে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শরণার্থী শিবিরসহ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পেও এসব পোস্টার প্রেরণ করা হয়েছিলো। এসময় শরণার্থীদের সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে আমিনুল হক বাদশাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অবশেষে ৩ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলেন। দমদম বিমান বন্দর থেকে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হাউসে উঠে গেলেন। এদিকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাঙালি শরণার্থী শিবির ও বিশাল কলকাতা মহানগরী ভেঙে পড়েছিলো যেন বিশাল গড়ের মাঠে। সেদিন কলকাতা মহানগরীর সব রাজপথ অলিগলি বেয়ে জনস্রোত যেন এক মোহনায় মিলিত হয়ে গড়ের মাঠের বিশাল উত্তাল জনসমুদ্রে গিয়ে একাকার হয়েছিলো। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মতোই গড়ের মাঠের জনসমুদ্র গর্জে উঠেছিলো বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে। শুনেছিলাম মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ নাকি কলকাতায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। বেশি সময় দিতে পারেননি শ্রীমতি গান্ধী আমাদের নেতৃবৃন্দকে। আগে তাঁর প্রোগ্রাম ছিল তিনদিন কলকাতা অবস্থান করার। শরণার্থী শিবির পরিদর্শনসহ

বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিস্তারিতভাবে সব কিছু আলোচনা করার। প্রোগ্রাম তাঁর পরিবর্তন হওয়ায় বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে বেশি সময় দেয়ার এবং তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের সুযোগ হয়নি।

৩ ডিসেম্বরই বিকালে ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লী চলে যেতে হবে এমনই ঝটিকা সফরে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। শুনেছি, আমাদের নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে শুধু তাঁর কাছে আবেদন রেখেছিলেন যুদ্ধে যেন বাংলাদেশের জনপদ, ঘরবাড়ি, কলকারখানা ধ্বংস করা না হয়। যেন লোকক্ষয় না হয়। যেন পাকিস্তানী হায়েনাদের ফেলে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ এবং স্বজন-প্রিয়জন হারানোর বেদনা আহাজারীর মধ্যেও স্বাধীনতার সুপ্রভাতে বিধ্বস্ত বাংলার মুক্ত মানুষের মুখে মুক্তির আস্বাদের একটি মুক্ত হাসি যেন একবার দেখতে পাই। নিরাপত্তাবোধের যেন একটি স্বস্তির নিশ্বাস শুনতে পাই। শুনেছি শ্রীমতি গান্ধী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের যেন আর কোনো ক্ষতি না হয় সে ভাবনা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর। বাংলাদেশে বসবাসরত সর্বস্বহারা ভয়ার্ত মানুষগুলোর জন্যে তিনি আরেকটি নরক বানাবেন না।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস নিয়ে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দফতরে ফিরে এলেন। আট নম্বর থিয়েটার রোডে অপেক্ষমাণ লোকজন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে ঘিরে ধরলেন কিছু বলার জন্যে। তাজউদ্দীন আহমদের মুখে চাপা হাসির ক্ষীণ রেখা। তবে একেও ছাপিয়ে ওঠা একটি উদ্বেগের ছায়া কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। কিছু বলার জন্যে সকলের চাপের মুখে তিনি বললেন, গড়ের মাঠে যান সবাই। ওখানে সব শুনতে পাবেন। আমি আজ কিছু বলবো না। যা বলার কাল বলবো।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, কামরুজ্জামান প্রমুখ কেউ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আর সদর দফতর ফিরে আসেননি। সবাই যাঁর যাঁর বাসায় চলে গিয়েছিলেন। সদর দফতরে ফিরে এসে তাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে একা কৌতূহলী লোকগুলোর ধকল সামলাতে হয়েছিলো। কিন্তু স্বল্পভাষী এই লোকটি কেমন চতুরতার সঙ্গে সবাইকে গড়ের মাঠে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে নিজে গিয়ে তাঁর অফিস-কাম-বেডরুমে ঢুকে পড়লেন। অথচ কেউ হতাশ হয়নি। বিরক্ত হয়নি। ক্ষুব্ধও হয়নি। নেতার নির্দেশ শিরোধার্য করে ছুটলেন গড়ের মাঠের দিকে।

দুপুরের আগেই কর্নেল রিখীর সৌজন্যে আমি ভিআইপি গ্যালারীর একখানা কার্ড পেয়ে গিয়েছিলাম ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের মাধ্যমে।

সুন্দর ফর্সা মুখে ঘনকালো গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবী সেনা অফিসার ব্রিগেডিয়ার মজুমদার কালো মোচের নিচে একটি হাসির রেখা টেনে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, নজরুল সাহেব, তোমার জন্যে খুব খুশির একটি খবর আছে।

কাছে গেলে কার্ডটি হাতে দিয়ে বললেন, দেখো কোনো গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। আগে আগে চলে যেও। তা না হলে ঢুকতে পারবে না।

সেদিন দুপুরে আমার আর খাওয়া হয়নি। সদর দফতরে কারো সেদিন খাওয়া-দাওয়ার খুব একটা তাড়া ছিল না। সবারই দৃষ্টি ছিল গড়ের মাঠের দিকে। কার্ড হাতে

পাওয়ার পর আমি আর দেরি করিনি। কাউকে বলিওনি পাসের কথা। এদিন আমার কোনো ডিউটিও ছিল না সদর দফতরে।

পাস নিয়ে ছুটলাম গড়ের মাঠে। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে মঞ্চের চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা এনক্লোজারের গেটে গিয়ে পাস দেখাতেই ঘেরের ভেতর ঢুকতে দিলো প্রহরী। ইন্দিরা গান্ধীর সভামঞ্চ থেকে বেশ দূর ছিল বাঁশের তৈরি এই নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তখন সভায় আসেননি। বাঁশের নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসা ছিলেন। আমাদের কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাহেবকে দেখেছিলাম ভিআইপি গ্যালারীতে সোফায় বসা ছিলেন। আমি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার পেয়েছিলাম। বেস্টনীর মধ্যে প্রবেশপথের কাছেই ছিল আমার সীট। আমার অদূরে সোফায় বসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের, সম্ভবত মেদিনীপুর থেকে নির্বাচিত ভারতীয় পার্লামেন্টের ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ। তিনি মাঝেমধ্যে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন একগুচ্ছ ফুলের তোড়া নিয়ে। এ হিসেবে তাঁকে চিনতাম।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

একাত্তরের তেসরা ডিসেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠের বিশাল জনসমুদ্র ভারতরত্ন নেহরুনন্দিনী ইন্দিরাকে বরণ করার জন্যে উষ্ণ আবেগ নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। ইন্দিরাবরণের জন্যে মঞ্চের উপর অপেক্ষা করছিলো লালপাড়ের বাসন্তী রঙের শাড়ি পরা ছন্দময় দেহের ৮/১০ জন দীর্ঘাঙ্গী ও বাছাই করা সুন্দরী বঙ্গললনা। হাতে হাতে তাদের ইন্দিরাবরণের ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত বরণডালা। মাথায় কালো চুলের দীর্ঘ বেণীতে দুলছে বেলী ফুলের গন্ধময় মালা। দু চোখের ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূর উপর গোধূলিলগ্নের দিগন্তরেখার মতো কালো রঙের আল্‌পনা আঁকা। কপালে পূর্ণিমা চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছে কুমকুমের টিপ। চিকন বাঁকা ঠোঁটে তাদের খয়েরী রঙের ঘন লিপষ্টিক, চঞ্চল হাতে লাল রেশমী চুড়ির মিষ্টি মধুর রিনিঝিনি শব্দ। বাঁশ দিয়ে তৈরি বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুলা কিংবা গোলাকৃতির ডালা না কাঁসার তৈরি ডালা ছিল তা এখন সঠিক মনে নেই। তবে ডালার মধ্যে ছোট ছোট পুষ্পস্তবকের পাশাপাশি ছিল মাটির মুচির মধ্যে তেলের সলতায় জ্বালানো ছোট ছোট দীপশিখা। ছিল ধান-দুর্বা।

বেলা তিনটার দিকে সদলবলে সভাস্থলে এসে হাজির হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা। সঙ্গে আরও ছিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব সুদর্শন পুরুষ ডিপি ধর।

গড়ের মাঠের বিশাল জনসমুদ্রে যেন ঝড় উঠেছে। ইন্দিরা কি জয়, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ—হিন্দী বাংলায় ইত্যাদি শ্লোগান। আর এপার বাংলার বাঙালিদের শ্লোগান ছিল তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদি শ্লোগানে গর্জে উঠেছিলো সেদিন গড়ের মাঠ। মঞ্চে অপেক্ষমাণ বঙ্গললনাদের উলুধ্বনি। এরপর দেখা গেলো বরণডালা হাতে নিয়ে বঙ্গললনারা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বাম হাতের

কনিষ্ঠতম তর্জনী দিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর কপালে টিপ এঁকে দিলেন একে একে। হাতে তুলে দিলেন পুষ্পস্তবক। মঞ্চে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হলো ধান-দুর্বা। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী মেয়েদের চিবুক ধরে আদর করলেন। এরপর সে হাত নিজ ঠোঁটে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করলেন।

মেয়েরা ইন্দিরা গান্ধীর পায়ের উপর মাথা নুইয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁর হাতে রাখি বেঁধে দিলেন। ভারতরত্ন ইন্দিরাবরণের এটা এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আজও আমার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে ইন্দিরাবরণের এই রোমাঞ্চময় ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। মনে হয় যেন এটা আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যেন এক ঐতিহাসিক স্মৃতি।

ইন্দিরাবরণের পর এবার শ্রীমতি গান্ধীর জনগণকে বন্দনার পালা। চোখের কালো চশমা খুলে তিনি তিনদিক খোলা মঞ্চের তিন প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ করে জনগণের অভিবাদনের জবাব দিলেন।

এ সময় বিশাল জনসমুদ্রের কানফাটানো হাততালি এবং স্লোগানে মুখরিত হয় গড়ের মাঠ। ইন্দিরা গান্ধী কি জয়, ইন্দিরা মায়ী কি জয় ইত্যাদি স্লোগান। বিশাল ভারতের জনগণমন অধিনায়ক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে নেহরুকন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে সে দেশের জনগণ বসিয়েছেন। তাঁর অঙ্গুলি হেলনিতে বিশাল ভারত চলছে, পরিচালিত হচ্ছে। আর আমাদের তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসার জন্যে জনগণ লাগে না। জনগণের বেতনভোগী সেনাবাহিনীর কিছু অংশের রাতের আঁধারে প্রেসিডেন্ট ভবন ঘেরাও করে প্রেসিডেন্টকে অস্ত্রের মুখে পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং রেডিও-টেলিভিশনে একটি ঘোষণা লাগে। এখানে জনগণের আস্থা-অনাস্থার কোনো প্রয়োজন হয় না। কলকাতার গড়ের মাঠে একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর শ্রীমতি গান্ধীর জনসভায় বসে এসব কথা আমার মনে বারবার উঁকি দিয়ে উঠেছিলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো লক্ষ্য করছিলাম।

জনতার প্রতি কুর্নিশ করতে এসে মঞ্চের একপাশে নিচে ভিআইপি গ্যালারীতে বসা পার্লামেন্টে তাঁর সরকারের কট্টর সমালোচক ফরোয়ার্ড ব্লক এমপি অধ্যাপক সমর গুহের প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর দৃষ্টি পড়লো। পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন পেছনে মঞ্চের এককোণে বসা তাঁর রাজনৈতিক সচিবের প্রতি। কি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলতে পারবো না। দেখলাম শ্রীমতী গান্ধীর চোখ তাঁর রাজনৈতিক সচিবের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী (পিএস) কিংবা এপিএস পদমর্যাদার একজন লোক মঞ্চ থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নিচে নেমে এলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক এমপি অধ্যাপক সমর গুহের কাছে গিয়ে তাঁকে সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে মঞ্চের উপরে গিয়ে বসার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছের কথা জানালেন। অধ্যাপক সমর গুহকে একরকম ধরেই নিয়ে যাওয়া হলো ইন্দিরা মঞ্চের উপর। তাঁকে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পাশে সোফায় বসতে দেয়া হলো। গড়ের মাঠের বিশাল জনতা আবার হাততালি ও ইন্দিরা মায়ী কি জয় ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে তাঁদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানালেন—মহান গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সহনশীলতার প্রতি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি। শ্রদ্ধা ও আবেগে আমারও মাথা হেঁট হয়ে এসেছিলো ভারতীয়

প্রধানমন্ত্রীর এই গণতান্ত্রিক আচরণ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত দেখে। কারণ পাকিস্তানে কোনোদিন এ রকম দেখিনি কিংবা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম না। পাকিস্তানে আমি দেখেশুনে অভ্যস্ত ছিলাম যে, বিরোধীদলের নেতারা অমুক দেশের দালাল, দেশের শত্রু। তারা দেশপ্রেমিক নন। ইসলাম ও গণতন্ত্র ধ্বংসকারী ইত্যাদি। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শির কুচলে দিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে মওলানা ভাসানী দেশের শত্রু। তাঁকে গুলি করে হত্যা করা উচিত। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ট্রেইটর। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো, আর বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার চক্রান্তের জন্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর বিচারপ্রহসন শুরু হয়েছিলো। এসব করতে করতেই আজ পাকিস্তান ভেঙে দু'টুকরো হতে চলেছে। আজ মুসলমানে-মুসলমানে লড়াই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। মুসলমান মুসলমানের হাত রঞ্জিত করছে ইসলাম রক্ষার নামে। মুসলিম মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করছে মুসলিম সৈন্য ধর্মরক্ষার নামে। আবার কোনো তথাকথিত ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতা এটাকে ইসলামী ও ধর্মীয় কাজ বা জায়েজ বলে ফতোয়া দিচ্ছে।

এমন সব তথাকথিত পাকিস্তানী গণতন্ত্র ও ইসলামী নীতিমালার কারণেই আমরা আজ নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের জানী দুশমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতায় আশ্রিত। এখানে এসে দেখছি অনৈসলামিক গণতন্ত্র। দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারি নেতৃবৃন্দের কোলাকুলি, দহরম-মহরম। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে ইসলামী গণতন্ত্র দেখে এবং ভোগ করে অভ্যস্ত মন-মানসিকতা কলকাতার গড়ের মাঠের চোখের সামনের ঘটনাবলীকেও যেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলো না।

কট্টর ইন্দিরা-সমালোচক আপোসহীন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অধ্যাপক সমর গুহকে জেলে নেয়ার পরিবর্তে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিচের দর্শকগ্যালারী থেকে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসতে দেয়ার এই চাক্ষুষ দৃশ্য নিজ চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না। পাকিস্তানী গণতন্ত্রের ঠুলি চোখকে এমন করে অন্ধ করে এবং ঘরের দরজায় এমনভাবে যেন ইসলামী গণতন্ত্রের খিল আটকিয়ে দিয়েছিলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উপর একাগ্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম। অবাঙালি মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরনে ছিল শাড়ি। শাড়ির রংটি আমার মনে নেই। মাথায় স্বাভাবিক ঘোমটা ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। তাই প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার মাথার চুল দেখার সুযোগ আমার হয়নি। গায়ের কোর্তার হাতা ছিল হাতের কবজি পর্যন্ত প্রসারিত। তাই প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার গায়ের রং দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দেখেছিলাম হাত ও হাতের ফর্সা আঙ্গুল আর ফর্সা গৈরিক মুখমণ্ডল। ভেবেছিলাম কত পার্থক্য পাকিস্তানে ইসলামী গণতন্ত্র ও আচার-আচরণ চর্চা বা কালচার। আর ভারতে বিধর্মীদের অনৈসলামিক গণতন্ত্র ও আচার-আচরণ কালচারের কত তফাত। পাকিস্তানী ইসলামী কালচারে গড়ে ওঠা দেহমনে ভারতের এই অনৈসলামিক গণতন্ত্র ও কালচারের বাতাস গায়ে লাগলেও সত্যিই দেহমন অপবিত্র হয়ে যাবে। সত্যিই তো দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানী

স্টাইলের ইসলামদ্রোহী হয়ে যাবো আমরা। পাকিস্তানী ইসলামী সামরিক নেতারা ঠিকই বলছেন। এজন্যেই তো পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এত আওতা পর্দার ব্যবস্থা। তা না হলে যে পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে ইসলামী সামরিক নেতার পরিবর্তে জনগণমন অধিনায়ক পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে যাবে। এতে পাকিস্তানী ইসলামী গণতন্ত্র ও জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য যে থাকবে না।

মনের ভেতরে ভীষণ তোলপাড় চলছিলো।

শ্রীমতী গান্ধীর সব বক্তৃতা কানের পর্দার উপর উড়ে গিয়েছিলো। সহজ হিন্দী ও ভাংগা ভাংগা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন তিনি। সব কথা স্মৃতির পাতায় রেকর্ড করে রাখতে পারিনি। তবে আজও মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, তোমরা যারা এদেশে এসেছো, তারা আমার সন্তানের মতো, ভাইবোনের মতো। তোমাদেরকে আমি নিরাপদ স্বাধীন দেশেই পাঠাবো। কোনো বধ্যভূমিতে পাঠাবো না। আমাদের একটা মানবতাবোধ ও দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমরা এই দায়িত্ব পালন থেকে পিছে হটে যেতে পারি না। আমরা অন্যায়ের কাছে, মনুষ্যত্বহীনতার কাছে মাথা নত করতে পারি না। অসত্য অন্যায়ের কাছে মাথা নত করলে তা হবে মানবতার অবমাননা। তুম লোক নিশ্চিত থাকো তোমাদেরকে আমরা তোমাদের মুক্ত স্বাধীন দেশে পাঠাবো, নিরাপদ দেশে পাঠাবো—যাতে তোমরা নিরাপদে থাকতে পাবো। যাতে তোমরা মালসামান নিয়ে বাস করতে পারো এমন ব্যবস্থা আমরা করবো। তোমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতার বাক্য শেষ করতে পারেননি। দু'বাংলার লাখো কণ্ঠ একক কণ্ঠে গর্জে ওঠে ইন্দিরাজী কি জয়, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জিওরহো, জয়বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো, ভারত-বাংলা ভাই ভাই হিন্দু-মুসলিম ভেদ নাই ইত্যাদি স্লোগান ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠকে তলিয়ে দিয়েছিলো বার বার। শেষে তিনি বললেন, আমি এখনই দিল্লী চলে যাবো। ক্যালকাটা আসার পর খবর পেয়েছি পাকিস্তান আমাদের পশ্চিম ফ্রন্টে আঘাত হেনেছে। আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর বসে থাকতে পারি না। পাকিস্তানের হিংসাত্মক কাজকর্ম আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। ইচ্ছে ছিল তোমাদের সাথে এখানে অনেক কথাবার্তা হবে। তোমাদের অনেক দুঃখের কথা শুনবো। কেমন করে তোমাদেরকে তোমাদের নিজ দেশে নিরাপদে ফেরত পাঠানো যায় সে সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। কিন্তু আমরা অ্যাটাক হয়ে যাওয়ায় আমি আর ক্যালকাটায় থাকতে পারছি না। আমি এখন দিল্লী চলে যাবো। আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমরা নিরাপদে দেশে ফিরে যাও, ভালো থাকো, দেশে গিয়ে প্রিয়জনদের পাশে থাকবে, তাদেরকে সান্ত্বনা দেবে, দেশকে গড়ে তুলবে। আমরা দেখবো তোমরা একটি সুখী জাতি, একটি সুখী ও শান্তির দেশ। তোমাদেরকে আর কেউ হামলা করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে আজই জবাব দেবো। আমরা তোমাদের পাশে থাকবো। তোমাদের সঙ্গে তোমাদের দেশে গিয়ে আমি দেখা করবো। তোমাদের নেতা মুজিবকে আমরা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো। তোমাদের সঙ্গে ফের মিলেঙ্গে মেরে ভাই আওর বহিন।

এরপর নিজেই বললেন, আমার সঙ্গে তোমরা আওয়াজ দাও ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। স্বৈরাচারী যুদ্ধবাজ ধ্বংস হোক, যুদ্ধ না শান্তি, শান্তি শান্তি, জয়বাংলা।

গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে উঠে সবাই নেচে শ্লোগান দিচ্ছিলো, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গর্জে উঠেছিল গড়ের মাঠ। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শেষবারের মতো গড়ের মাঠের বিশাল জনতাকে কুর্নিশ করে নমস্তে জানিয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতায় তোমাদের দেশে গিয়ে শীঘ্রই আমি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করবো, কথা বলব—একথা শুনে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম। সত্যি আমরা শীঘ্রই স্বাধীন হবো, স্বাধীন দেশে ফিরে যেতে পারবো।

শুনেছি কলকাতা দমদম বিমান বন্দরে শ্রীমতী গান্ধীকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান প্রস্তুত হয়ে আছে। ইন্দিরা গান্ধী গড়ের মাঠের বিশাল জনসভা থেকে বের হয়ে একটি হেলিকপ্টারে করে সোজা দমদম গিয়ে পৌঁছাবেন।

আমার মনের অবস্থা আজ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মনের মধ্যে আনন্দের এক উত্তাল ঝড় বইছিলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হচ্ছে, শীঘ্রই আমরা স্বাধীন দেশে ফিরে যাবো। আমাদের দেশ আমাদের হবে। সেখানে আমরাই থাকবো—পাকিস্তানীরা আর থাকবে না। আমাদের নিজস্ব সরকার হবে, নিজস্ব পতাকা উড়বে আকাশে—এই অনুভূতি আমার অন্তর্লোকে তোলপাড় করছিলো। কখন গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী এবং থিয়েটার রোডের সবাইকে একথা জানাবো যে, আমরা স্বাধীন হচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন শীঘ্রই আমরা আমাদের দেশে নিরাপদে ফিরে যেতে সক্ষম হবো।

এই আনন্দে আমি এত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম, এত অধীর হয়ে পড়েছিলাম যে, মুখ দিয়ে তখন আর কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। মনে হয়েছিলো পা যেন গড়ের মাঠে আটকে পড়েছিলো। পা তুলতে পারছিলাম না সামনে এগোবার জন্যে। থিয়েটার রোডের দিকে যাত্রা যেন আমার শেষ হচ্ছিলো না। মনে বারবার অনুরণিত হচ্ছিলো কখন গিয়ে থিয়েটার রোডে পৌঁছাব। সবার আগে আমাকে পৌঁছতে হবে থিয়েটার রোডে। স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছাতে হবে। আরো জোরে পা চালালাম থিয়েটার রোডের দিকে।

॥ তেতাল্লিশ ॥

একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর ভোর রাত থেকেই আনুষ্ঠনিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব ফ্রন্টে। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৩ ডিসেম্বর গড়ের মাঠের জনসভায় যুদ্ধের কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন।

যুদ্ধ যে ৩ ডিসেম্বর পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিলো, এ কথা মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ সব মন্ত্রীই জানতেন।

যুদ্ধ ভারতের পশ্চিম ফ্রন্টে শুরু হয়ে গেছে, ভারত এর জবাব দেবে গড়ের মাঠের জনসভায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার খবর আমার কাছ থেকে শোনার জন্যে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অপেক্ষা করে বসে ছিলেন না। তিনি সব কিছুই জানতেন। তবে ইন্দিরা গান্ধীর গড়ের মাঠের জনসভায় আনুষ্ঠনিক ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মনে হতো, তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়া সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

গড়ের মাঠের জনসভা থেকে হন্তদন্ত হয়ে আট নম্বর থিয়েটার রোডে ছুটে গিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধ ঘোষণার কথা বললাম তখন তাঁকে খুবই স্বাভাবিক মনে হল। তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া কিংবা ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোথায় যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধ কতদিন চলবে, এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কোনো কথাই শুনতে পেলাম না। তবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দফতরে আমাদের উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে, বিশেষ করে তৎকালীন এয়ার কমোডোর বাশার এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে খুব ব্যস্ত দেখতে পেলাম। ইলেকট্রনিক বিভাগের তৎকালীন মেজর বাহার একটু মিষ্টি হেসে শুধু বললেন, পিআরও সাহেব, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আমাদের দফতরে ওয়ার বুলেটিন তৈরি করার কোনো তাগিদ নেই। জেনারেল ওসমানী তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করছেন। যুদ্ধ লাগার আনন্দের আতিশয্য এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে কারো কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা না পেয়ে আমি বলতে গেলে এক নীরব উত্তেজনায় অযথা ছটফট করছিলাম।

৩ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক কোনো খবর পেলাম না। এখানে লোকজনদের মধ্যে শুধু ফিসফিস শব্দ, আর বলা হচ্ছে ঢাকায় বিমান হামলা করেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী। আমার সহকারী রংপুরের নুরুর রহমান (এপিআরও) সাহেব সন্ধ্যায় এসে বললেন, নজরুল ভাই, শুনেছি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাজ কি? আমাদের তো দেখছি এখন আর কোনো কাজ নেই। যুদ্ধের এ মুহূর্তে আমাদের কোনো কাজ না থাকায় আমার কাছেও মোটেই ভালো লাগছিলো না। নিজেকে কেন জানি ভাসমান ও অপ্রয়োজনীয় লোক বলে মনে হচ্ছিল। ভীষণ লজ্জাবোধ করতাম মনে মনে।

জেনারেল ওসমানীর এডিসি ক্যাপ্টেন নূরের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমার কথা হয়েছিলো। তাঁকে বলেছিলাম, এখন তো আর কোনো ওয়ার বুলেটিন হচ্ছে না, সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার সংক্রান্ত কোনো কাজও হচ্ছে না। এখন কি করবো? কাজ ছাড়া তো ভালো লাগছে না।

ক্যাপ্টেন নূর বললেন, এখন তো পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করছে এখন মিত্রবাহিনী। যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতীয় বাহিনী। আমরা এখন কেবল সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করছি। তাদের কামান, বন্দুক, ট্যাংক, বোমারু বিমান রয়েছে। সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছে। এই তো কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে যাবে। দু'তিনদিনের মধ্যে বাংলাদেশের একটার পর একটা অধিকৃত এলাকা মুক্ত হয়ে যাবে। পাকিস্তানী বাহিনী

ভারতীয় বাহিনীর মোকাবিলায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে তেমন বড় ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নেই। ঢাকায় মাত্র কয়েকটি বিমান রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের মজুত ভাণ্ডার নেই। রসদ নেই। সর্বোপরি পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবলও নেই। তারা এখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এবং হতাশাগ্রস্ত। তারা নির্ঘাত মারা পড়বে বাংলাদেশে। তবে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানকে হটাতে ভারতকে বেশ বেগ পেতে হবে। এখন আর কি কাজ করবেন। যুদ্ধের সব খবর এখন সরাসরি আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হবে। বসে বসে আকাশবাণী শুনুন।

ক্যাপ্টেন নূরের কথায় উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কিন্তু এই সরাসরি যুদ্ধে কোনো ভূমিকা পালনের অবকাশ না থাকায় মনে মনে খুবই ব্যথিত হয়েছিলাম। মনে হলো যেন নয় মাসের সব সাধনা ও শ্রম বুঝি এখন আর কোনো কাজে লাগছে না।

ক্যাপ্টেন নূর বললেন, যুদ্ধে কি হচ্ছে, কোথায় কি ঘটছে, এ মুহূর্তে আমাদের চীফও সে সম্পর্কে কিছু অবহিত নন। আমাদের চীফ এ মুহূর্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন না। তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব জানতে পারবেন সরাসরি। আপনি বরং ইস্টার্ন কমান্ডের পিআরও রিখীর কাছে চলে যান। সেখানে বসে বসে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের সব খবর জানতে পারবেন। যুদ্ধের সব খবর এখন একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ জেনারেল মানেকশর কমান্ড থেকে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হবে। আপনি কর্নেল রিখীর কাছে চলে যান। চীফ আপনাকে খোঁজ করলে বলবো যে ইস্টার্ন কমান্ডে গেছেন।

আমি মোটামুটি আশ্বস্ত হলাম বটে। কিন্তু নিজে যে সরাসরি যুদ্ধের কোনো কাজ করতে পারছি না এ যাতনাকে কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না। ৩ ডিসেম্বরই বোধহয় সিকিম-ভুটান বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে। সেদিন আকাশবাণীর সন্ধ্যার খবরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানগুলোর একযোগে দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমান ঘাঁটি ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনার ওপর এবং চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী নৌবাহিনীর জাহাজের উপর বিমান হামলার খবর প্রচারিত হলো। সারা কলকাতা শহর জুড়ে লোকজন এখানে-সেখানে জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর খবর শুনছে।

পরদিন অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর সকালেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর দফতরে চলে গেলাম। কর্নেল রিখী আমাকে দেখে বড় রকমের হাসি দিয়ে দরাজকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, আইয়্যে নজরুল ছাহাব আইয়্যে। তুমকো লিয়ে হাম বহুত ইনতেজার করতাহু।

তাঁকে বড়গলায় গুডমর্নিং জানিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। কর্নেল রিখী ভীষণ ব্যস্ত। এ সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা (অপারেশন) বিভাগের সাদা পোশাকধারী একজন কর্মকর্তা কর্নেল রিখীর অফিসের চার দেয়াল জুড়ে সাঁটা বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে পাকিস্তানী সামরিক স্থাপনার লক্ষ্যবস্তুগুলো চিহ্নিত করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

আমি কর্নেল রিখীকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্তভাবে বললাম যে, যুদ্ধের এই ঐতিহাসিক পর্যায়ে আমি কোনো কাজে লাগতে পারছি না। এটা আমার জন্যে খুবই গ্লানিকর এবং দুঃখজনকও। আমার দুঃখ কোনোদিন মুছবে না।

কর্নেল রিখী আমার অনুযোগ শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, তোমার কাজ নেই মানে? তুমি এ সব কি বলছো নজরুল? তোমার তো এখন কাজ বেড়ে গেছে। তুমি তোমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তোমাদের দেশের জনগণের কাছে হরদম বাণী প্রচার করো, যেন তারা নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেয়, মাল-সামানা যেন নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করে। যেন তারা মিত্রবাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

ভারতীয় বাহিনী তোমাদেরকে রক্ষার জন্যে, তোমাদের দেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে দেয়ার জন্যে তোমাদের দেশে গেছে। ভারতীয় বাহিনীকে তোমাদের দেশের লোকদের ভয় করার কোনো কারণ নেই। ভারতীয় বাহিনী তোমাদের বন্ধু হয়ে ভাই হয়ে, তোমাদের লোকজনদেরকে পাকিস্তানীদের হামলা থেকে রক্ষা করবে—তোমরা শুধু এই বাণী প্রচার করো। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা কোথায় আছে, কোথায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে সে সম্পর্কে মিত্রবাহিনীকে তথ্য ও খবর দিতে বলো তোমার দেশের জনগণকে। তোমাদের জনগণ পাকিস্তানী সৈনিক কিংবা তাদের সহযোগীগণকে কোনো আশ্রয় কিংবা পানি ও খাবার যেন না দেয়—এই কোসেস করো তোমাদের লোকজনদের কাছে। তাদেরকে জানিয়ে দাও যে পাকিস্তানী ভীতসন্ত্রস্ত সৈন্যরা মিত্রবাহিনীর আক্রমণের মুখে শেষ রক্ষার জন্যে লোকালয়ে গিয়ে তোমাদের লোকজনদেরকে জিম্মি করতে চাইবে। তারা যেন এ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকে।

তোমরা তোমাদের ভাষায় পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে আবেদন জানাও যেন তারা মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। তাহলে তারা বাঁচতে পারবে। মিত্রবাহিনী আত্মসমর্পণকারী কোনো পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করবে না। বরং তাদেরকে খাবার দেয়া হবে। তাদেরকে জেনেভা কনভেনশনের ঘোষণা অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে তাদেরকে তাদের দেশে প্রিয়জনদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া পাড়া-মহল্লায় ডিফেন্স পার্টি গঠন করে যেন রাতে পাহারার ব্যবস্থা করে। ডাকাত কিংবা এন্টি-সোস্যাল এলিমেন্টস ও পলায়মান পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগীরা রাতে ডাকাতি কিংবা লুটপাট করে মিত্রবাহিনীর উপর দোষ চাপিয়ে মিত্রবাহিনী সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তোমাদের লোকদেরকে এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলে দাও।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

যুদ্ধের খবরাখবর সম্পর্কে জানা গেলো, ভারতীয় বিমানগুলো ঢাকা বিমানবন্দরে বোমা ফেলেছে। তাদের লক্ষ্য পাকিস্তানী যুদ্ধ বিমান ধ্বংস এবং ঢাকা বিমানবন্দর অচল করে দেয়া। যাতে পাকিস্তানী বিমান উঠা-নামা করতে না পারে।

রিখী জানালেন যে, ঢাকায় পাকিস্তানী বিমান বাহিনীকে সম্পূর্ণ অচল করে দিতে দু'তিন দিন সময় লাগবে। এতে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর উপর থেকে বিমান হামলার আর কোনো আশংকা থাকবে না। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা

নির্ভয়ে স্থলযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। তিন-চার দিনের মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী কাবু হয়ে পড়বে এবং তোমাদের দেশের কিছু কিছু অংশ শত্রুমুক্ত হবে।

ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী যুদ্ধের প্রথম তিন দিনেই ঢাকায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অধিকৃত বাংলাদেশের আকাশে এখন মিত্রবাহিনীর অবাধ ও একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আকাশ-যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সাফল্যে মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে আনন্দের জোয়ার বইছে। কলকাতায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ দফতরেও আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে।

ঢাকাসহ দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর প্রায় বিনা বাধায় সফল হামলা চালিয়ে মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো অত্যন্ত নিরাপদে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। মিত্রবাহিনীর বৈমানিকরা রিপোর্ট করেছেন, তাঁরা বাংলাদেশে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অভিনন্দন পেয়েছেন। মিত্রবাহিনীর বিমান আকাশে দেখে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ আনন্দ-উল্লাসে লাফিয়ে উঠেছে। মাঠে-ময়দানে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাত নাড়িয়ে, হাতের গামছা উড়িয়ে মিত্রবাহিনীর বোমারু বিমানের প্রতি স্বাগত জানিয়েছে। ঢাকায় বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর কিছু কিছু লোক শহর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে, কেউবা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ঢাকা নগরীর রাস্তায় হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে আর প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়নি। হয়তো তারা প্রাণের ভয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো ঢাকায় হামলা চালাবার সময় নগরীর অধিবাসীরা বাড়ির ছাদের উপর উঠে বিমান হামলার দৃশ্য দেখেছে। বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তারা মিত্রবাহিনীর বিমান হামলাকে অভিনন্দিত করেছে। মিত্রবাহিনীর বৈমানিকরা এসব দৃশ্যের ছবি তুলে নিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরকে দিয়েছে। বৈমানিকরা বিমান থেকে লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের প্রতিক্রিয়া। তারা মিত্রবাহিনীর বিমানগুলোকে ত্রাণকারী মনে করেছে। কেউ কেউ স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরে মুক্তির বারতা ঘোষণা করেছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর ধারণা ছিল বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে তারা শক্ত বাধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর কোনো বিমান হারাতে হয়নি, এমন কি কোনো বিমান জখমও হয়নি। যেন তারা বাংলার মুক্ত আকাশে মুক্তবিহঙ্গের মতো উড়ে খেলে, গেয়ে, নেচে নিজ আলয়ে খুশিতে ফিরে গেছে। তারা রিপোর্ট করেছে, আসলে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের কোনো শক্ত এয়ারবেইজ ছিল না। নামকাওয়াস্তে একটি বিমানবাহিনী রাখা হয়েছিলো ঢাকায়। পাকিস্তান সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে।

ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ দফতরে শুনেছি, আকাশ-যুদ্ধের তিনদিনেই মিত্রবাহিনী পাকিস্তানী বিমান বাহিনীকে একবারে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। এদের নড়াচড়া

করার কোনো উপায় ছিল না। ভারতের নতুন তৈরি বিমানগুলো বিরাট সাফল্য দেখিয়েছে আকাশ-যুদ্ধে। জায়গা মতো লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলেই ডিগবাজি খেতে খেতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন আকাশী রংয়ের বিমানগুলো শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে চোখের নিমেষে নীল আকাশের বুকে মিলিয়ে গেছে।

শুনেছি এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলটদের অটোমেটিক সামরিক ক্যামেরায় তোলা ছবিতেও দেখেছি, ঢাকার তৎকালীন তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের রানওয়ের দু'পাশে এক হাজার পাউন্ডের বোমা ফেলে পুকুর করে মাটির পাহাড় বানিয়ে রেখেছে রানওয়ের উপর। এ রানওয়ের উপর দিয়ে এখন বিমান উঠা-নামা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিমান উঠা-নামার জন্যে এখন আর তেজগাঁও-কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের রানওয়ে ব্যবহার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিমান থেকে তোলা ছবিগুলো আমাদের দেখিয়ে কর্নেল রিখী বললেন, দেখো নজরুল তোমাদের বিমানবন্দরের রানওয়ের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি বোমায়। বোমা রানওয়ের উপর ফেলা হয়নি। ফেলা হয়েছে রানওয়ের দু'পাশে। এতে দু'পাশে পুকুর তৈরি হয়ে পুকুরের মাটি এসে পাহাড় তৈরি হয়েছে রানওয়ের উপর। পাকিস্তানীরা এখন আর এই রানওয়ে ব্যবহার করতে পারবে না।

রিখী আরও জানালেন যে, ভারতীয় বিমানবাহিনী রানওয়ের এই মাটি সরিয়ে দিয়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে ব্যবহার করবে। বিমানবন্দর পাহারায় নিয়োজিত পাকিস্তানী সেনা অফিসাররা প্রাণের ভয়ে বিমানবন্দর ফেলে রেখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পালিয়েছে। তেজগাঁও এয়ারপোর্টে পাকিস্তানীদের এন্টি-এয়ারক্রাফট গান ভারতীয় বিমানবাহিনী দখল করে নিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে তেজগাঁও এয়ারপোর্টে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুইপাররা মাটি সরিয়ে ফেলে রানওয়েকে সচল করে তুলছে।

ভারতীয় সেনা ও বিমানবাহিনীর সামরিক সরঞ্জাম ও রসদবাহী বড় পরিসরের বিশালদেহী বিমানগুলো গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দরে উঠা-নামা করছে। এমন কি, সামরিক জীপও বিমানে করে এনে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নামানো হচ্ছে। তবে যাত্রীবাহী বিমান চালু করা হয়নি। এছাড়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিমান থেকে বিকট গর্জনের বোমা ফেলে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি করা হয়। বোমার প্রচণ্ড আওয়াজে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী সৈন্যরা আতংকিত হয়ে পড়ে। তবে কোনো সেনাছাউনীর উপর কোনো বোমা ফেলা হয়নি।

রিখী বললেন, আমরা তোমাদের ক্যান্টনমেন্টের কোনো ক্ষতি করিনি। পাকিস্তানী সৈন্যদের ভয় দেখানো এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে যা যা করা দরকার শুধু তাই করছি। এমনকি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় বিমানের বোমায় কোনো পাকিস্তানী সৈন্যও মারা পড়েনি। শুধু ভয় দেখিয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

কর্নেল রিখীর দফতরে নিয়োজিত সাদা পোশাকধারী একজন প্রবীণ সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেন, ভারতের সামরিক কৌশল শত্রুপক্ষকে একেবারে হত্যা করা নয়

কিংবা কোনো বেসামরিক সম্পদ ধ্বংস করা নয়। প্রাণনাশ না করে নানা কৌশলে ভয়ভীতি দেখিয়ে শত্রুকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। শত্রুকে আত্মসমর্পণ করানো সামরিক শাস্ত্র অনুযায়ী সবচেয়ে বড় ক্রেডিট। হত্যা কিংবা ধ্বংস করা ক্রেডিট নয়। কারণ শত্রুকে হত্যা করলে তাদের জীবিত বংশধররা কিংবা নিহতদের উত্তরাধিকারী ও প্রজন্মদের মধ্যে হত্যাকারী বা বিজয়ী দেশের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা থেকে যাবে এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে সুযোগ খুঁজবে। আর পরাজিত শত্রুকে আত্মসমর্পণ করাতে পারলে তাদের মনোবল চিরদিনের মতো ভেঙ্গে যাবে। শত্রুর দর্প-গর্ব চিরতরে চূর্ণ করে দেয়া হলো। সে আর কোনোদিন সহজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। আমরা চাই, আর যেন কোনোদিন পাকিস্তান যুদ্ধের নাম মুখে না আনে। যুদ্ধের কথা তাদেরকে আমরা চিরদিনের জন্যে ভুলিয়ে দিতে চাই। তুমি কি বলো নজরুল?

আমি সায় দিয়ে বললাম, সিওর।

সাদা পোশাকধারী ভারতীয় সামরিক শাস্ত্রবিদ খুশি হলেন আমার জবাব শুনে। বললেন, দেখো তো ৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়েছে। তারপর থেকে পাকিস্তান নানা ছুতায় ভারতের সঙ্গে একটা না একটা বিরোধ লাগিয়ে রেখে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তাদের দেশে তারা সামরিক শাসন জারী করে মানুষকে নির্যাতন চালাচ্ছে আর অবাধে সামরিক লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। ওদের মাথায় শান্তি বলতে কোনো কিছু নেই। আছে শুধু যুদ্ধের নেশা। এবার সেই নেশাটাই ওদের ঘুঁচিয়ে দেবো। মানুষের কল্যাণের উন্নয়নের কোনো চিন্তা নেই। তুমি জানো কিনা জানি না, ওদের একজন ক্যাপ্টেনও মার্শাল ল জারী করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তুমি দুঃখ নিও না মনে এবং বিশ্বাস করো যে, সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে লুটপাট করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সে দেশের যুবকরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। এবার শিখিয়ে দেব ওদেরকে সামরিক বাহিনী আর যুদ্ধ কাকে বলে। বেঁচে থাকলে আর কোনোদিন যুদ্ধের কথা মুখে আনবে না।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

কর্নেল রিখী এতক্ষণে ফাইল থেকে মাথা তুলে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই যে, মিস্টার নজরুল, তোমাদের পাকিস্তানের ফাউন্ডার ফাদার কে জানি?

কর্নেল রিখী কি বলতে চাচ্ছিলেন তা বুঝতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। স্পষ্ট করে বললেন, মানে তোমাদের ন্যাশনের ফাদারের নাম কি?

বললাম, পাকিস্তানের ফাদার অব দি ন্যাশনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

কর্নেল রিখী বড় গলায় বললেন, ও হ্যাঁ মিস্টার মোহাম্মেড আলী জিন্নাহ। তাঁর জন্মদিন কবে?

বললাম, বই-পুস্তকে পড়েছি এবং পাকিস্তানে থাকতে আমরা জিন্নাহর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর পালন করেছি।

কর্নেল রিখী বললেন, খুব ভালো, ২৫ ডিসেম্বর। তোমাদের ইতিহাসের, আই মিন পাকিস্তান হিস্ট্রির এমন মেমোরিয়াল এন্ড গোল্ডেন ডে এবার তো এমনি যেতে দেয়া ঠিক হবে না এবং এমনি যেতে দেয়া যায় না।

আমি বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

রিখী বললেন, বুঝতে পারলে না? আমি বলতে চাচ্ছি এবার তো পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান ফাদার অব দি নেশনের বার্থ এনিভারসারি অবজার্ভ করতে পারবে না। তা হলে ২৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ইতিহাসের সোনালী দিনটি এমনি যাবে না?

কর্নেল রিখী পূর্ব পাকিস্তান শব্দ উচ্চারণ করায় আমি ব্যথিত হলাম। সাহস করে প্রতিবাদ করলাম, আপনি আবার পূর্ব পাকিস্তান বললেন আমাদের বাংলাদেশকে।

কর্নেল রিখী জোরে হেসে দিয়ে বললেন, আই এম সরি মিস্টার নজরুল। আই উইথড্র। নাউ ইট ইজ পয়েট ঠেকুরস বাংলাডেস, পয়েট নজরুলস বাংলাডেশ এন্ড বঙ্গবনডু মুজিবস বাংলাডেস।

তিনি বললেন, কলকাতায় তোমার প্রফেশনাল কলিক অর্থাৎ তোমাদের দেশের সাংবাদিক আছে। তাদেরকে জানিয়ে দাও যে এবার ২৫ ডিসেম্বর অবজার্ভ করবো। আমরা ঢাকায় রমনা পার্কে ২৫ ডিসেম্বর টি পার্টি দেবো ঢাকার জার্নালিস্টদের জন্যে। কলকাতায় ঢাকার যেসব সাংবাদিক আছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে তুমি এডভান্স ইনভাইটেশন দিয়ে দাও। ঢাকার রমনা পার্কে আমরা এবার ঢাকার সাংবাদিকদের টিপার্টি দেবো।

আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, ২৫ ডিসেম্বরের আগেই তাহলে ঢাকা মুক্ত হবে। ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ঢাকায় যেতে পারবো। ঢাকায় গিয়ে দেখবো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস মহাসমুদ্রের জোয়ারের মতো যেন আমার হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে তুলছিলো। কর্নেল রিখীর সামনে এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস কিভাবে প্রকাশ করবো, বড় রকমের একটি চীৎকার দিয়ে উঠবো কিনা তা স্থির করতে পারছিলাম না। আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলাম। সে সময় কেবল আমার দেহটি ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ দফতরে ছিল। মন উড়ে গিয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। উথলে ওঠা আবেগে কণ্ঠ আমার অবরুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। ওখানে বসেই রিখীর কথাকে কখনও কখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনের কোণে প্রশ্ন উঠেছে, কর্নেল রিখী ঠিক বলেছেন তো? সত্যি বলেছেন তো? ২৫ ডিসেম্বর সত্যিই ঢাকায় যেতে পারবো? ইত্যাদি প্রশ্ন। পরক্ষণেই মনে হলো, হয়ত সত্যিই হবে। কারণ রিখীর ওখানে বসেই খবর পেলাম রংপুর, দিনাজপুর এবং দেশের প্রায় সীমান্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের ঘাঁটি তুলে নিয়ে ঢাকার দিকে কিংবা নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। যাওয়ার পথে তারা মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ছে। যেখানে প্রতিরোধের মুখে পড়ছে, যেখানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে সেখানেই খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে।

কর্নেল রিখীর মূল্যায়নে পশ্চাদপসরনকারী ভীত-সন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈনিকদের এটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। এটা তাদের ডিফেনসিভ যুদ্ধ। এগ্রেসিভ যুদ্ধ নয়। আর এ যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা এখন আর একা নয়। অবশ্যম্ভাবী বিজয়মুখী এ যুদ্ধে এখন সর্বস্তরের জনসাধারণ রাস্তায় নেমেছে মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। খন্তা, বাঁশের লাঠি, কিরীচ, টেটা অর্থাৎ যার কাছে যে হাতিয়ার আছে সে হাতিয়ার

নিয়েই বিজয়উল্লাসী হাজার হাজার মানুষ এখন প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেও এখন বড় বড় অস্ত্র। থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এসএমজি, এলএমজি ইত্যাদি ধরনের অস্ত্র, আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সগর্জন এয়ার আমব্রেলা।

চারদিকে খবর জঙ্গী মিত্রবাহিনী ট্যাংক কামান নিয়ে এগিয়ে আসছে। কোনো কোনো এলাকায় পাকিস্তানী ফাইটার সৈনিকরা অগ্রসরমান মিত্রবাহিনীর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ভয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অজানা অচেনা পথে পালিয়ে যাচ্ছে। হাতের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে এরা পালাচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। এদের অনেকের কাছে শুধু চায়নিজ রাইফেল ছিল, গুলি ছিল না। বাংলার দুরন্ত তরুণ-যুবক মুক্তিযোদ্ধারা এটা বুঝতে ভুল করেনি। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের যেখানেই পেয়েছে সেখানেই বাংলার তরুণ যুবক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমনকি বাংলার ঘরের মহিলারা পর্যন্ত কুড়াল কিংবা ধান ভাঙ্গার চেহাইট নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। সারা বাংলায় এখন জনযুদ্ধ, জনপ্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল রিখীর সামনে বসে এমন সব খবর শুনছিলাম।

॥ ছিচল্লিশ ॥

এ যুদ্ধ চলার মাঝখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানী জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিয়ে দেশবাসীকে জানান যে, সার্বিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, জলে-স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলার মাটিতে থাকা পর্যন্ত এবং প্রতি ইঞ্চি মাটি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। নেতৃবৃন্দের এই উদ্দীপনাময়ী ভাষণে সারা বাংলায় জনযুদ্ধের ঢেউ ওঠে। জোয়ার ওঠে।

ঢাকার চারপাশের এলাকায় জয়দেবপুর, মানিকগঞ্জ, পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, কালীগঞ্জ, পূবাইল, পদ্মা, ধলেশ্বরীর চরে ভারতীয় প্যারাট্রুপার (ছত্রীসেনা) নামতে শুরু করে। দলে দলে আকাশ থেকে ছত্রীসেনা নামতে দেখে গ্রামবাসীরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে। মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে কোলাকুলি করে।

এদিকে আকাশবাণী থেকে কতক্ষণ পর পর যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল মানেকশর ঘোষণা প্রচার হতে থাকে। ঘোষণায় জেনারেল মানেকশ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে মিত্রবাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মিত্রবাহিনীর হাতে মারাত্মক ভারী অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা এ যুদ্ধে আর কিছুতেই পারবে না। মিত্রবাহিনীর মোকাবিলা করার সব চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হবে। অযথা রক্তক্ষয় না করে প্রাণে বাঁচার জন্যে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করো। নতুবা তোমরা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তার চেয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী সৈনিকদেরকে সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। তাদেরকে নিরাপদে নিজ দেশে আত্মীয়, প্রিয়জনদের কাছে ফিরে যেতে দেয়া হবে।

জেনারেল মানেকশর এ ঘোষণা বাংলা, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী, সিন্ধি, পশতু ইত্যাদি ভাষায় আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতে থাকে। এছাড়া জেনারেল মানেকশর এই ঘোষণা ছাপিয়ে লাখ লাখ লিফলেট বিমান থেকে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক একটি এলাকা মুক্ত হওয়ার ঘোষণায় বাংলার মাটি পর্যন্ত বিজয়উল্লাসে ফেটে পড়ে। শত্রু হননের মহোৎসব শুরু হয় সারা বাংলায়।

অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের লাল সংকেত পৌঁছে গিয়েছিলো ইসলামাবাদ-পিন্ডির সামরিক জান্তার দুর্গে। অসুরের প্রেতাত্মা ইয়াহিয়া খান উন্মাদ হয়ে পড়েন। দৃশ্যমান পরাজয়ের মুখে আন্তর্জাতিক মিত্রদের মাধ্যমে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ থামাবার জোর তৎপরতা চালায় পাকিস্তান।

পাকিস্তানের তৎকালীন মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় ঠেকানোর মতলবে নিরাপত্তা পরিষদে জরুরী ভিত্তিতে যুদ্ধ থামাবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। ভারত-বাংলাদেশের পরম মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সে সময় বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধের মার্কিনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো মিত্রবাহিনীর হামলায়।

কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসারদের মুখে শুনেছি অগ্রসরমাণ ভারতীয় নৌবাহিনীর কোনো রণতরী যাতে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে না পারে সেজন্য পাকিস্তানী নৌসেনারা চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি সমুদ্র ও নৌবন্দর এলাকায় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর পথরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানের মুখে পাকিস্তান নৌবাহিনীর সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতা বালির বাঁধের মতো ধুয়েমুছে গেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিরোধে সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। জলে, স্থলে ও আকাশে মিত্রবাহিনীর যৌথ সর্বাত্মক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে মনোবল ভাঙ্গা ও হাতশাগ্রস্ত পাকিস্তানী বাহিনী তাদের প্রতিরোধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মিত্রবাহিনীর রণকৌশল ও নীলনক্শা অনুযায়ী কাজ হতে থাকে। মিত্রবাহিনী যা চেয়েছিলো তাই হতে লাগলো যুদ্ধে। মিত্রবাহিনী চেয়েছিলো অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়োজিত পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের অগ্রবর্তী প্রতিরোধ অবস্থান গুটিয়ে দেশের ভেতরে সেনানিবাসে গিয়ে জড়ো হোক। এরপর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানীদের সেনানিবাস বা ঘাঁটি চারদিক থেকে অবরোধ করে রেখে খেদা অভিযানে হাতিকে বশীভূত করার মতো হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী টের পেয়েছিলো যে, যুদ্ধে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তাদের কৌশল ছিল অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে মিত্রবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে দু'তিন দিন পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত রেখে তাদের পেছনের ক্যান্টেন সেটের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজসরঞ্জামসহ লোকজনকে নিরাপদে ঢাকা অভিমুখে সরিয়ে নেয়া।

এছাড়া পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ ও তাদের আন্তর্জাতিক দোসররা চেয়েছিলো বাংলাদেশে যুদ্ধ থামিয়ে দিতে। বাংলাদেশে যুদ্ধরত পাকিস্তানী উচ্চপদস্থ সেনা

অফিসাররা জানতেন যুদ্ধ থামিয়ে দেবার তৎপরতা চলছে। বাংলাদেশের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশে যুদ্ধ আপাতত থামিয়ে দিয়ের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা প্রস্তাব এনেছিলো। কিন্তু সে সময়কার বাংলাদেশ–ভারতের অকৃত্রিম মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে এই সর্বনাশা মার্কিনী প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। চীন-মার্কিনের কুমতলব ছিল যুদ্ধ মাঝপথে থামিয়ে দিলে বাংলাদেশে স্থিতাবস্থা থাকবে এবং এতে তাদের মিত্র পাকিস্তানের দখল বাংলাদেশে বহাল থাকবে। পরে যা হবার তা দেখা যাবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সময়োচিত ভেটো প্রয়োগের ফলে তাদের সেই কুমতলব সফল হতে পারেনি। পরাজয়মুখী যুদ্ধে নিয়োজিত পাকিস্তানী সেনা অফিসাররা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপে যুদ্ধ স্থগিত রাখার নির্দেশের প্রতীক্ষায় ছিলো। তারা চেয়েছিলো যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্যে জাতিসংঘের নির্দেশ আসার সময় পর্যন্ত যে কোনোভাবে ভারতীয় বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর সুচতুর সমর বিশারদগণ পাকিস্তানীদের এই কুমতলব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন। তাই যুদ্ধ আরো জোরদার করেছিলো। পাকিস্তানী সেনাদেরকে কোন্ পথে হটিয়ে দেয়া হবে, তাদের পিছু হটার জন্যে কোন্ পথ খোলা রাখতে হবে এবং বাংলাদেশে কোন্ জায়গায় তাদেরকে জমায়েত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে এরকম একটি নীলনক্শা ও কৌশলগত পরিকল্পনা মিত্রবাহিনীর সমরবিশারদগণ আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁরা সামরিক কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশকে কয়েকটি সামরিক জোনে ভাগ করে ওই জোনের পরাজিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ধাওয়া করে সুবিধামত জায়গায় অবস্থান নিতে দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো মিত্র বাহিনীর নির্ধারিত স্থানে চারদিক অবরোধ করে রেখে তাদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ করে দেয়া হবে। পানি কিংবা কোনো প্রকার খাদ্যসামগ্রী আসতে দেয়া হবে না। এভাবে তিনচার দিন অবরোধ করে রাখলে এমনিতেই বাছাধনরা কাবু হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। শুধু মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ ভয় দেখানোর জন্যে অবরোধ এলাকায় চারপাশে ফাঁকা ভারী বোমাবর্ষণ করে প্রচণ্ড আওয়াজ দিয়ে দুর্বলচিত্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা হবে। আর অবরুদ্ধ এলাকার উপর দিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমানগুলো টহল দেবে এবং অবরোধ এলাকার চারপাশে ফাঁকা জায়গায় বিমান থেকে বোমা ফেলা হবে। তাদেরক বুঝিয়ে দেয়া হবে যে অস্ত্র সমর্পণ করো নইলে একজনকেও জীবিত রাখা হবে না।

ধর্মভীরু পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে জানাতে হবে যে, এই অবরুদ্ধ স্থানেই তাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ মেরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে। গোর-কাফন করা হবে না। কারণ মেরে লাশ ফেলে রাখলে শিয়াল কুকুর, শকুন, তাদের পচা গলিত লাশ টেনে হেঁচড়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে এবং পরিবেশ দুষিত করবে। তাই তাদের লাশগুলো পুড়ে ছাই করে ফেলা হবে। এতে জমির সার হিসেবে কাজে লাগবে। এসব কথা অবরোধ এলাকায় মাইক দিয়ে প্রচার করা হবে উর্দু ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী ভাষায়।

ইস্টার্ন কমান্ডের গণসংযোগ দফতরে মিত্রবাহিনীর এসব পরিকল্পনার কথা নিয়ে আগাম হাসি-তামাশা চলছিলো। আমার মতো একজন অর্বাচীনের কাছেই মনে

হয়েছিলো যুদ্ধটা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কাছে কত সহজ। মনে হয়েছে যেন সবকিছু তাদের মুঠোর মধ্যে। যেন তারা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। যেন তারা যুদ্ধের যাদুকর।

আমি তাদের এই হাসি-ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে ভাবছিলাম যুদ্ধটাকে তারা যেন কোনো গুরুত্ব দেবে না। মনে হয়েছে তারা যুদ্ধটাকে হালকাভাবে দেখেছে। আমি এতে মনে মনে বিরক্ত বোধ করতাম। কারণ তাদের এই হালকা মেজাজ দেখে আমার মনে হয়েছিলো যেন আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা সিরিয়াস নয়। আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করছে। আমার এই নির্লিপ্ততা এবং মলিন মুখ দেখে কর্নেল রিখী বলেছেন, কি নজরুল ছাহাব, তুমলোক এতনা বেআওয়াজ ক্যাঁও? বেমজাদার ক্যাঁও?

কি জবাব দেবো তা বুঝতে পারিনি। সঠিক জবাব দিতে না পারলে বরং চুপ করে থাকাই ভালো। আমি তাই করলাম। এবং এক ফাঁকে বলে ফেললাম, যুদ্ধের খবর কি কর্নেল সাহেব?

বেসামরিক পোশাক পরিহিত একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা বললেন, এটাই যুদ্ধ। তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের পেছনে বাংলাদেশের গণমানুষের কোনো সমর্থন নেই। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা গত আট-ন মাসে এদেরকে নাস্তানাবুদ ও কাহিল করে ফেলেছে। বড় রকমের হামলা করার মতো গোলাবারুদ বা অস্ত্রশস্ত্রও তাদের নেই। আমরা এত সময় না নিয়ে ইচ্ছে করলে বোমা হামলা এবং ট্যাংক-কামান চালিয়ে এদেরকে তিন চারদিনের মধ্যেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এতে তোমাদের ক্ষতি হবে। তোমাদের দেশ পাড়াগাঁ, লোকালয় ঘনবসতিপূর্ণ। ভারী গোলাবর্ষণ করলে এরা ঘনবসতি লোকালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ সময় তাদের উপর আকাশ থেকে হামলা চালালে তোমাদের লোকালয়ের ক্ষতি হবে। গাছপালা নষ্ট হবে। অনেক বেসামরিক লোক হতাহত হবে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই সময় বেশি নিয়ে হলেও শান্তিপূর্ণভাবে তাদেরকে সারেন্ডার করাতে হবে।

আমাদের হামলায় বেসামরিক জনপদ ও লোকক্ষয় হলে তোমাদের দেশের মানুষ এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে যাবে। হোসটাইল হয়ে যাবে। এছাড়া, পাকিস্তানীরা এই ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলে সারা বিশ্বে একটা হৈচৈ সৃষ্টি করবে। কি দরকার এত তোলপাড় ও হৈচৈ সৃষ্টি করার। চুপে চুপে কাজ সেরে ফেলবো। দুনিয়ার কেউ টের পাবে না। কাজ হাসিল করে ফেলবো, কোনো লোকক্ষয় হবে না। আর পাকিস্তানী অনাহারী সৈন্যরা একবার লোকালয়ে ঢুকলে তোমাদের লোকজনদের উপর অত্যাচার চালাবে। লুটপাট করবে, নারী নির্যাতন করবে। তাই আমরা চাচ্ছি ভগবানের আশীর্বাদে কোনোমতে যুদ্ধের খোলা ময়দান থেকেই ওদেরকে হটিয়ে ফেলতে। এখন সব ভগবানের ইচ্ছে। প্রার্থনা করো যেন কামিয়াব হতে পারি। আমরা ভয় করছি, না জানি পশ্চাদপসরমাণ পাকিস্তানী সৈন্যরা তোমাদের আদমজী মিলে এবং খুলনার শিল্পাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাহলে এসব এলাকায় বিমান কিংবা ট্যাংক ও কামান থেকে গোলাবর্ষণ করলে সব চুরমার হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের এত বীরত্ব প্রদর্শনের দরকার নেই।

॥ সাতচল্লিশ ॥

এরই মধ্যে ৫ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দান করে। ৬ ডিসেম্বর বোধহয় অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নও স্বীকৃতি দেয়। সারা কলকাতা নগরী যেন বাংলাদেশ হয়ে মহানন্দ-মহোৎসবে টালমাটাল। মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরের আঙ্গিনায় এপার বাংলার লোকদের মিষ্টি ও ফুল নিয়ে ছোড়াছুড়ি চলে। এ এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। কলকাতা নিউমার্কেটের ফুলের দোকানগুলো খালি হয়ে গেছে। মনে হয়েছে, বাস্তিলের কারাদুর্গ ভেদ করে যেন শৃংখলিত মানুষের মুক্তির আস্বাদন লাভ। আট নম্বর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে আসছেন কলকাতা মহানগরীর বাঙালির স্বাধীনতার শুভাকাঙ্ক্ষী শিল্পী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক। চারদিকে আনন্দ উল্লাস উচ্ছ্বাসের ঢেউ। যেন মরি মরি ভাব। আমার মনে হলো, এখন আর বাড়ি না গিয়ে এই বিদেশে মরে গেলেও আর কোনো দুঃখ লাগবে না।

এমন আনন্দময় মুহূর্তে মিত্রবাহিনী বসে থাকেনি। তারা একটি মহানন্দের খবর উপহার দিলেন আনন্দ-বিহ্বল মুজিবনগর সরকারকে। সেই মহা খবরটি হলো : ঢাকার গভর্নর ভবনে (বর্তমান বঙ্গভবন) মিত্রবাহিনী সফল বিমান হামলা চালিয়ে গভর্নর ভবনের একাংশ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এতে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পা-চাটা গভর্নর ডাক্তার মালেকসহ তার বশংবদ মন্ত্রীরা গভর্নর ভবন ছেড়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান হোটেল শেরাটন) আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির নিরপেক্ষ ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকার রাস্তায় নেই।

এ খবর ঘোষণার পর মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে যেন আনন্দের বোমা ফেটে প্রচণ্ড আওয়াজে আট নম্বর থিয়েটার রোডকে প্রকম্পিত করে তুলেছে।

ভারতীয় রণকৌশল এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনার পূর্বনির্ধারিত ছক মোতাবেক ঢাকায় কাওরানবাজারের কাছে (বর্তমানে সোনারগাঁও হোটেলের সামনে) ভারতীয় বোমারু বিমান থেকে ১২ শ' পাউন্ড ওজনের বোমা ফেলে কাওরান বাজারের রাস্তার উপর এক বিরাট পুকুর সৃষ্টি করে। এতে তৎকালীন গভর্নর ভবন (বর্তমান বঙ্গভবন) তথা মূল ঢাকা নগরীর সঙ্গে সড়ক পথে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যাতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে ঢাকা শহরে আর ঢুকতে না পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৭১ সালে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট ও ঢাকা শহরের মধ্যে সড়ক পথে যোগাযোগের জন্যে এই কাওরান বাজার রাস্তা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না। শুধু ছিল রেলপথ। ভারতীয় বিমান থেকে বোমা হামলার ভয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সেসময় ক্যান্টনমেন্ট থেকে রেলগাড়িতে ঢাকা শহরে যাতায়াত করতো।

কাওরান বাজার রাস্তার উপর বোমা ফেলে বিরাট পুকুর সৃষ্টির বিমান থেকে তোলা ছবি দেখে ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে বসে সেদিন আমরা উল্লাস করছিলাম। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম, বাছাধনরা এখন তোমরা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটকা পড়ে গেছো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে আর তোমাদের ঢাকা শহরে যাওয়ার

পথ নেই। তোমাদের শিখণ্ডী সিভিলিয়ান গভর্নর ডাক্তার মালেক ও পা-চাটা মন্ত্রীরাও ঢাকা শহর থেকে বের হয়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্যে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে যেতে পারবে না। সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এবার চারদিক থেকে ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ করে রেখে, যাবতীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে না খাইয়ে দুর্বল, নিস্তেজ করে তোমাদেরকে আটক করা হবে। আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হবে। বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তৎকালীন পাকিস্তানী জিওসির বাসভবনের পূর্বপাশে আরও একটি ভারী ওজনের বোমা ফেলে গভীর পুকুর বানিয়ে ক্যান্টনমেন্টস্থ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা হয়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার আগেই মিত্রবাহিনীর সমরবিশেষজ্ঞরা যা ধারণা করেছিলেন তা-ই ঘটতে লাগলো। যুদ্ধে বিপর্যস্ত-পর্যুদস্ত পশ্চাপদগামী, বিচলিত ও দিশেহারা পাকিস্তানী সেনারা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। ভারতীয় মিত্রবাহিনী যাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র পারাপার করতে এবং সহজে ঢাকার দিকে আসতে না পারে সেজন্যে তারা পাকশীতে পদ্মা নদীর উপর দীর্ঘতম রেল সেতুর মাঝের অংশ শক্তিশালী মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ভৈরববাজার রেল সেতু বোমা মেরে বিধ্বস্ত করে দেয়। সড়কপথে ঢাকা-নরসিংদীর মধ্যে পাঁচরুখী নামক স্থানে সড়কসেতু ধ্বংস করে দেয়। নদীতে ফেরী দিয়ে যাতে মিত্র বাহিনীর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পারাপার না করা যায় সেজন্য ঢাকার ডেমরা, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফেরীঘাটে ফেরীগুলো নদীতে ডুবিয়ে দেয়। বিমান থেকে তোলা এসব ভাঙ্গা বিধ্বস্ত ব্রীজের ছবি ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে দেখে আমার মনও বিধ্বস্ত ব্রীজগুলোর মতোই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা কিংবা কোনো অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে মনে মনে ভীত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হতে লাগল যুদ্ধে বুঝি জয়ী হতে পারবো না।

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের তৎকালীন সংবাদ সমীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রযোজক উপেন তরফদার প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে বহু আগেই আমাকে বলেছিলেন। আগেই তিনি বলে রেখেছিলেন যে, সাক্ষাৎকারটি তিনি নেবেন বাংলাদেশ-ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার পর। অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানের কথা দিল্লী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার পরই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎকার তিনি গ্রহণ করবেন। আকাশবাণীর উপেন তরফদার সংবাদ সমীক্ষায় প্রচারের জন্যে আপনার সাক্ষাৎকার নিতে আগ্রহী, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবকে একথা জানিয়েছিলাম রহমত আলী ও নূরুল ইসলাম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে। তাজউদ্দীন সাহেব হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। তাঁর মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি না পেয়ে উপেনবাবুকে কনফার্ম করবো কিভাবে! ভাবছিলাম, উপেনবাবু আসার পর যদি প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎকার না দেন তাহলে তো আমার দুই কূলই যাবে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ভাববেন ছেলেটি একটি রামছাগল। অন্যদিকে উপেনবাবু তথা

আকাশবাণীর কাছে আমার আর কোনো ইজ্জত থাকবে না। কলকাতার সংবাদপত্রের জগতেও এটা জানাজানি হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর কোনো প্রতিক্রিয়া না জেনেই তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। কারণ, তিনি আমাদের তাঁর রুমে বসতে বলেননি। তাতে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি চান না আমরা তাঁর ঘরে বেশিক্ষণ থাকি।

তাঁর রুম থেকে বের হওয়ার পর রহমত আলী সাহেবকে বললাম, প্রধানমন্ত্রী তো আকাশবাণীর প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না। এখন আমি কি করবো?

রহমত আলী সাহেব বললেন, এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ধরে নিতে পারেন মৌনতা সম্মতিরই লক্ষণ।

নূরুল ইসলাম বললেন, নজরুল তুমি তাজউদ্দীন সাহেবকে এখনো চিনতে পারলে না? তিনি কখনো আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী নন। তুমি নিশ্চিন্তে আকাশবাণীর উপেন তরফদাকে আসার জন্যে বলে দিতে পাবো। পরে আমরা দেখববখন।

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে উপেন তরফদারকে বললাম আট থিয়েটার রোডে আমার দফতরে আসার জন্যে। রহমত আলী ও নূরুল ইসলাম ভাইকে বলে রাখলাম যে অবশ্যই তাঁরা যেন তখন উপস্থিত থাকেন আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে।

আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ সমীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রযোজক উপেন তরফদার আমার কথামতো হাজির হলেন কাঁধে টেপ রেকর্ডার ঝুলিয়ে। আমার রুমে চা দিয়ে বসিয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রীর রুমে ঢুকলাম ঝড়ের বেগে।

॥ আটচল্লিশ ॥

রহমত আলী সাহেব ও নূরুল ইসলাম যথারীতি আগে থেকেই এসে প্রধানমন্ত্রীর সাহচর্য লাভ করে বসেছিলেন তাঁর ঘরে। আমি গিয়ে বিনীতভাবে বললাম, আকাশবাণীর উপেন তরফদার এসেছেন আপনার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব কোনো কথা বলার আগেই নূরুল ইসলাম ভাই বললেন, উনাকে ওখানে বসিয়ে রেখে এলে কেন। নিয়ে আসলেই তো পারতে। যাও চট করে নিয়ে এসো গিয়ে।

নূরুল ইসলাম ভাইয়ের কথা শেষ হতেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুখ খুললেন। বললেন, আমার কি বলার আছে? আমার তো আর কিছু বলার নেই। যা বলার বলবে বাংলার জনগণ, বাংলার মানুষ। আজ বিশ্ববাসীকে তারা প্রাণখুলে তাদের আকুতি জানাক। ত্যাগ স্বীকার করেছে বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্যে। কত রক্ত দিয়েছে তারা। কত জীবন দিয়েছে তারা। কত নির্যাতিত হয়েছে।

বলতে বলতে তাঁর চোখের কোণ থেকে অশ্রু ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। রুমাল দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ মুখ চেপে ধরলেন। এ সময় কাঁদলে ভালো দেখাবে না।

আমি চলে গেলাম উপেন বাবুকে নিয়ে আসার জন্যে।

উপেন তরফদারকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকলাম। সঙ্গে আমাদের প্রতিরক্ষা দফতরের ফটোগ্রাফার সুজিত। গিয়ে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কান্না থেমেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে চোখের অশ্রু থামেনি।

উপেন তরফদারের বসার ব্যবস্থা করা হলো প্রধানমন্ত্রীর টেবিলের সামনে। উপেনবাবু প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লম্বা নমস্কার নিবেদন করে সামনে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী নীরব। চোখ জুড়ে শুধু অশ্রুর ঢেউ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উপেন তরফদার প্রধানমন্ত্রী, আপনার দেশ বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আপনারা স্বাধীন হয়েছেন, আপনি এ মুহূর্তে একটি সার্বভৌমৈ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী—এ মুহূর্তে আপনার অনুভূতি কি?

উপেন তরফদার তাঁর টেপ রেকর্ডারের মাথউপিস প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

তাজউদ্দীন সাহেব অবোধ শিশুর মতো কাঁদছিলেন। খানিক সময় নিয়ে কিছু শান্ত হয়ে বললেন, আমার জীবদ্দশায় আজ বাঙালি জাতির লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। জাতির এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলার একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। আজ এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। কিন্তু নবাগত শিশুর প্রথম কান্না শুনে যিনি আজ সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি আজ পাকিস্তানে জল্লাদ বাহিনীর হাতে বন্দী।

তাজউদ্দীন সাহেব এই আনন্দঘন মুহূর্তে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। কথা বলতে পারছেন না আর। উপেন তরফদারের পরবর্তী প্রশ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আজ এই দিনে আপনার দেশবাসীর উদ্দেশে কোনো বাণী আছে কি?

তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, স্বজন হারানোর এক সাগর বেদনা নিয়ে আজও যাঁরা বাংলার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের কাছে আজ বুক খুলে মুখ ভরে বলতে চাই, আজ আমরা স্বাধীন। কারও গোলাম নই। আজ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি। আমরা এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঘরবাড়ি হারিয়েছি, প্রিয়জনদের হারিয়েছি। সব হারিয়ে আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। যাদেরকে হারিয়েছি স্বাধীন দেশের পতাকার মধ্যে তাঁদের খুঁজে পাব। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মধ্যে তাঁরা বেঁচে থাকবেন। আর ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, কোনো পরাধীন দেশে তাদের জন্ম হবে না। তারা আর গোলাম হয়ে জন্মগ্রহণ করবে না। স্বাধীন দেশের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এটাই আমাদের পরম পাওয়া, পরম সান্ত্বনা। আমাদের এই চরম দুর্দিনে যাঁরা সাহায্য-সহায়তা নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অনেকেই হয়তো অনেক কিছু বলতে চাইবে, বলবে। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ একদিন বুঝতে পারবে তাদের জন্যে আমরা কি করে গেলাম। সেদিন হয়তো আমরা আর বেঁচে থাকবো না।

তাঁর চোখ থেকে টসটস করে অশ্রু ঝরছে। এরপর উপেন বাবু আর কোনো প্রশ্ন রাখেননি। প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে যেন পিনপতন নিস্তব্ধতা। আমরা সবাই উপেন বাবুর সঙ্গে উঠে চলে গেলাম।

যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে আমাদের সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের প্রচারকৌশলও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এ সময় যুগপৎ আকাশবাণী-দিল্লী-কলকাতা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মিত্রবাহিনীর সেনাপ্রধান জেনারেল

মানেকশর পাকিস্তানী সেনা-বাহিনীকে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আহ্বান সম্পর্কিত ঘোষণা কতক্ষণ পরপর প্রচারিত হতে থাকে।

যুদ্ধের এ পর্যায়ে বাংলাদেশে অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে মিত্রশক্তির অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া পাকিস্তানী সৈনিকরা ভয় এবং ক্ষুধার জ্বালায় কোনো কোনো এলাকায় মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো খণ্ডিতভাবে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এই আত্মসমর্পণের খবরও খুব ফলাওভাবে আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। আরও জোরেসোরে প্রচারণা চালাই যে, ভয়ে দিশেহারা ক্লান্তশ্রান্ত ক্ষুধার্ত আরও পাকিস্তানী সৈন্যের বিভিন্ন গ্রুপ মিত্রবাহিনীর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তারা আর যুদ্ধ করতে চায় না। তারা এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে মিত্রবাহিনীর কাছে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত পাকিস্তানী সৈন্যদের এখন বড় দাবি হচ্ছে আত্মসমর্পণের পর তাদেরকে পেট পুরে খেতে দিতে হবে এবং প্রাণে রক্ষা করা হবে। মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পর তাদেরকে মিত্রবাহিনীর হেফাজতে রাখা হবে, তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না—এই নিশ্চয়তা চায় আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা। কারণ তারা মনে করে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের নিয়মনীতি জানে না এবং মানে না। বরং মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের প্রতি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী আচরণরীতি জানে এবং মানে। তাই তারা ভারতীয় সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আগ্রহী।

এরই মধ্যে যেসব পাকিস্তানী সৈন্য মিত্রবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্রসহ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে তাদেরকে পূর্ণ নিরাপদে এবং আরাম-আয়েসে রাখা হয়েছে। তাদেরকে ভালো ভালো খাবার দেয়া হচ্ছে। এসব ঘোষণা বিভিন্ন ভাষায় বেতারের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর তরুণ যোদ্ধারা পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্যদের চারপাশে অবরোধ ব্যূহ রচনা করে তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে।

আমাদের এ ধরনের আগ্রাসী প্রচারণায় অনেক কাজ হয়েছিলো। পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল আরও বেশি ভেঙ্গে পড়েছিলো। এছাড়া পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের হেডকোয়ার্টার অর্থাৎ ঢাকার সঙ্গে তখন সম্পূর্ণ যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো।

ঢাকায় মিত্রবাহিনীর বিরাট বিরাট বোমারু বিমানের ঘনঘন আনাগোনা ও বিকট আওয়াজ, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় বোমাবর্ষণে করে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিলো। সেনাসদরের সঙ্গে ঢাকায় অবরুদ্ধ জেনারেল নিয়াজী যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। জেনারেল নিয়াজীকে জানানো হয়েছিলো যে, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বাহিনীর লোকজন মিত্রবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের পক্ষে সুসজ্জিত বিশাল মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে। খাবার নেই। সরবরাহ নেই। অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেই। তাদের পক্ষে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করার কোনো প্রকার চেষ্টা করা হবে বেগবান স্রোতের মুখে বালির বাঁধ রচনা করার মতো বৃথা চেষ্টার শামিল। এমন কি যেসব পাকিস্তানী সেনা অফিসার এরই মধ্যে তাঁদের বাহিনী নিয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো, যুদ্ধ বন্ধ এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার

জন্যে জেনারেল নিয়াজীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায় করেছিলেন মিত্রবাহিনীর সুচতুর অফিসাররা। সামরিক টেপে ধারণকৃত এসব আহ্বান-অনুরোধ সামরিক রেডিওর মাধ্যমে জেনারেল নিয়াজীকে শোনানোর ব্যবস্থা করেছিলো মিত্রবাহিনী। এরই পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওপর বোমা ও গোলাবর্ষণের আওয়াজ এবং অসহায় পাকিস্তানী সৈন্যদের চীৎকার-আর্তনাদের আওয়াজ সামরিক টেপে ধারণ করে সামরিক চ্যানেলে ঢাকায় জেনারেল নিয়াজী এবং পিন্ডির উন্মাদ পাকিস্তানী সেনানায়কদের শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। একই সঙ্গে আত্মসমর্পণের জন্যে জেনারেল মানেকশর ভারী কণ্ঠের আহ্বান এবং আত্মসমর্পণের পর বন্দী পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে জেনেভা কনভেনশনের ঘোষণা অনুযায়ী নিয়মিত খাবার-দাবার ও নিরাপত্তা দেয়ার আশ্বাসের প্রচারণা জেনারেল নিয়াজীর নার্ভের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলো। কলকাতায় ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ কন্ট্রোল রুমে বসে জানতে পেরেছিলাম যে, জেনারেল নিয়াজী তাঁর নিজের ও বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ প্রায় এক লাখ সৈন্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁর মন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আত্মসমর্পণের ব্যাপারে পিন্ডির পরামর্শ নেয়ার জন্যে তিনি পিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ঢাকা থেকে পিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। জেনারেল নিয়াজী সে সময় বলতে গেলে ভারতীয় বাহিনীর কামানের গোলার মুখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অসহায়ত্বের বেদনায় কেবল ছটফট করছিলেন। সারা বাংলাদেশে এ সময় চলছিলো স্বজন ও সর্বস্ব হারানোর সকল ব্যথা-বেদনা ছাপিয়ে ওঠা মানুষের আনন্দ-উল্লাসের উচ্ছল তরঙ্গ।

যুদ্ধ চলছে, গোলাবর্ষণ হচ্ছে। মাথায় ওপর বোমারু বিমান উড়ছে আকাশে। বিমান হামলা হচ্ছে। অথচ লোকজনের মধ্যে ভয় ভীতি-উদ্বেগ-আশংকার কোনো লেশমাত্র নেই। বরং রয়েছে প্রাণখোলা আনন্দ-উল্লাস। এটাই বোধ হয় মুক্তির প্রকৃত স্বাদ।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

আমি যুদ্ধ দেখতে পারিনি। তাই স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করতে পারিনি সত্যিকার অর্থে। মুক্তিযুদ্ধের জন্যে কাজ করেছিল রাতদিন। মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে বসে মুক্তিযুদ্ধের খবর লিখেছি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ দেখতে পাইনি নিজের চোখে। যুদ্ধের কথা লোকমুখে শুনেছি, ইতিহাসে পড়েছি। নাটক-যাত্রার আসরে যুদ্ধ দেখেছি আমি। কিন্তু যুদ্ধ দেখিনি নিজ চোখে, নিজ হাতে অস্ত্র চালাইনি অথচ আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা—এ কেমন কথা? এটা ভাবতে লজ্জা লাগতো ভীষণ। দেশে ফিরে গিয়ে কেমন করে বলবো যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা? মানুষ মনে করবে নকল মুক্তিযোদ্ধা—এসব কথা ভেবে লজ্জাবোধ করতাম। আমাদের জেনারেল ওসমানীও তো কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি সরাসরি। তবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছেন। সঙ্গে আমিও গিয়েছি।

একদিন জেনারেল ওসমানী সাহেবের এডিসি ক্যাপ্টেন নূরকে জানালাম যুদ্ধ দেখার সাধের কথা। ক্যাপ্টেন নূর বললেন, ফিল্ডে মুক্তিযুদ্ধ দেখবেন কেমন করে?

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তো আর সামনাসামনি যুদ্ধ করেন না। তাঁরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করেন। অর্থাৎ তাঁরা অস্ত্র নিয়ে কোনো গোপন স্থানে ওঁৎ পেতে থাকেন। যখন কোনো পাকিস্তানী সৈন্য ঐ পথ-দিয়ে যায় অমনি ওদের ওপর অস্ত্র চালান কিংবা হাতবোমা ছুঁড়ে মারেন। কখনও পাকিস্তানী সেনাদের চলাচলের পথে মাইন পুঁতে রাখা হয়। ওদের গাড়ি চলার সময় আকস্মিক মাইন বিস্ফোরণ হয়ে গাড়িসুদ্ধ সবাই উড়ে যায়। এসব দৃশ্য দেখতে হলে আপনাকে তো মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। আর ওদের থাকার তো কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ওপর যখন যেখান থেকে আক্রমণ করা সহজ ও সুবিধাজনক তখন সেখানেই গেরিলাদেরকে যেতে হয়। কাজেই কোনোভাবে গেরিলা যুদ্ধ আপনি একদিনে দেখতে পারবেন না। হয়তো দেখা যাবে একদিন দুদিন, তিনদিন, এমন কি আরও বেশ কয়েকদিন কোনো যুদ্ধই নেই। তখন গেরিলারা শিকারের আশায় দুদিন অপেক্ষা করবেন কিংবা সুবিধা বুঝে স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যাবেন। তখন আপনার দশা কি হবে?

এছাড়া গেরিলা যুদ্ধ দেখার সময় এখন আর নেই। এখন সামনাসামনি কামান, আর্টিলারী, বিমান যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধ দেখতে চাইলে আপনি ইস্টার্ন কমান্ডের কর্নেল রিখীকে বলবেন। কর্নেল রিখী তাঁদের কোনো সেনা কনভয়ের সঙ্গে আপনাকে তুলে দিলে নিরাপদ দূরত্বে থেকে যুদ্ধ দেখতে পাবেন।

ঠিকই একদিন কর্নেল রিখীকে বললাম, আমি যুদ্ধ দেখতে চাই। আমাকে যুদ্ধ দেখানোর একটু ব্যবস্থা করে দেন।

কর্নেল সাহেব জানালেন যে, শীঘ্রই এ সুযোগ আসছে তোমার জন্যে। যশোর সেক্টরে যুদ্ধ চলছে। বেনাপোল বর্ডারে পকিস্তান শক্ত ডিফেন্স খাড়া করেছে। আমাদের ফোর্স বেনাপোল ক্রস করতে পারছে না। এখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হবে। এটা দেখতে পাবে। তবে তুমি একা নয়। কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ও কলকাতার কিছু সাংবাদিক নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাকে সঙ্গে পাঠানো হবে তাদেরকে গাইড করার জন্যে।

আমি পড়লাম আরেক ঝামেলায়। আমি তাদের গাইড করবো কেমন করে? গাইডিংয়ের আর্ট আমার দখলে নেই। এছাড়া ইংরেজী ভাষায় বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আমি অনর্গল কথা বলতে পারি না। এতো দেখছি আরেক ফ্যাসাদ! যুদ্ধ দেখতে চাই বলে নিজেই এ ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লাম। কর্নেল রিখী অবশ্য আমার ভাষাগত সীমাবদ্ধতা জানতেন। আমার অবস্থা বুঝে বললেন, তোমার কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না। তুমি শুধু বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর পিআরও হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবে। আমাদের সেনাবাহিনীর খুব স্মার্ট অফিসার দেবো তোমার সঙ্গে। তোমার পক্ষ থেকেই সে সব কিছু করবে।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কর্নেল রিখীকে বললাম, পাকিস্তানী সৈন্যরা আপনাদের এত কাছে এসে পড়েছে? তাহলে তো ওরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়বে।

কর্নেল সাহেব বললেন, আরে না। এত সহজ নয়। যশোরে আমাদের এয়ার অ্যাটাক চলছে। পাকিস্তানীরা যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে খুলনার দিকে হটে যাচ্ছে। রোড কিংবা রেলে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই খুলনা থেকে নদীপথে জাহাজে ঢাকায় চলে যাবে। মাল-সামানা নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সুবিধার জন্যে তোমাদের

বেনাপোল বর্ডারে ওরা সামরিক ডিফেন্স লাইন খাড়া করেছে। আমাদের ফোর্স এপারে আমাদের পেট্রাপোল বর্ডারে অবস্থান নিয়ে আছে। ওদেরকে আমরা দু-তিন দিন যাবত বেনাপোল বর্ডারে এনগেজ করে রেখেছি। ওদেরকে আমরা এমনিতে যেতে দেবো না। যশোর চ্যানেলগুলো ক্লিয়ার করা হচ্ছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট ক্লিয়ার হলেই ওরা বেনাপোল থেকে ডিফেন্স তুলে নিয়ে যশোর হয়ে খুলনার দিকে রওনা হবে।

আমার কাছে মনে হলো যেন কর্নেল রিখীর কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পুরো প্রোগ্রাম রয়েছে। কর্নেল রিখী কেমন করে জানেন পাকিস্তানী সৈন্যরা কখন কোন পথ দিয়ে কোথায় যাবে? যেন শুত্রুপক্ষের সব কিছু তাঁর নখদর্পণে। যেন পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রোগ্রাম কর্নেল রিখীর হাতেই তৈরি। তা না হলে তিনি কেমন করে জানবেন কলকাতায় বসে পাকিস্তানী সৈন্যরা কখন কোথায় যাবে? আমার কাছে সব বিস্ময়কর মনে হয়।

কর্নেল রিখী বললেন, *আনন্দবাজার* থেকে তোমার মুখরঞ্জনদা তোমার সঙ্গে যাবেন। তোমার খুব মজা হবে। তোমরা যশোর পর্যন্ত যাবে। সাংবাদিকদেরকে যুদ্ধ দেখাবার জন্যেই পাকিস্তানীদেরকে বেনাপোল বর্ডারে এনগেজ করে রাখা হয়েছে। তোমরা গেলেই দেখতে পাবে যুদ্ধ কাকে বলে।

আমি ভয়ানক খুশি হলাম। যশোরের চুয়াডাংগা আরো আগেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওখানে মিত্রবাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা চুয়াডাংগার প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। দিনটা বোধ হয় ডিসেম্বরের সাত-আট তারিখ হবে। সঠিক তারিখ এখন মনে নেই। কর্নেল রিখী একদিন আগেই আমাকে নোটিশ দিলেন প্রস্তুত হয়ে নেয়ার জন্যে।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একটি লরিতে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ও কলকাতার দৈনিক পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিককে তুলে দিয়ে কর্নেল রিখী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের সঙ্গে। বললেন, বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর পিআরও মিস্টার নজরুল ইসলাম তোমাদের সঙ্গে যাবেন। পথে কোনো অসুবিধা হলে আমাদের অফিসাররা হেল্‌প করবে। আশা করি পথে কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু বেনাপোলে সামান্য দেরি হতে পারে। বেনাপোল থেকে ওরা উইথড্র করতে চাচ্ছে। আমরা আটকিয়ে রেখেছি তোমাদেরকে যুদ্ধ দেখাবার জন্যে। তোমরা গেলে ওদেরকে উইথড্র করতে দেয়া হবে। আমাদের বিমান বাহিনীর বিমানগুলো ওদের মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। বেনাপোল থেকে যশোর পর্যন্ত ট্রাংক রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উপর বিমান প্রহরা রয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যেতে পারবে না। ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আছে। শক্তিশালী মাইন আছে। ওদের মতলব বেনাপোল থেকে যশোর যাওয়ার পথে ঝিকরগাছায় কপোতাক্ষ নদীর উপর রোড ও রেল ব্রীজ উড়িয়ে দেবে যাতে আমরা গাড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্র পার করতে না পারি। ওদের এই মতলব আমরা আগে থেকেই ধরে ফেলেছি। গত রাতেই ওরা চেষ্টা করেছিলো ব্রীজ দুটি মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে। আমরা তাদেরকে এ সুযোগ দেইনি গতরাতে। আজ তাদেরকে সুযোগ দেব। তোমরা গিয়ে দেখতে পাবে ব্রীজ ভাঙ্গার দৃশ্য। তবে তাদেরকে যশোর পার হতে দেয়া হবে না। যশোর শহর পর্যন্ত তাদের শেষ সীমানা।

॥ পঞ্চাশ ॥

কলকাতা থেকে বেনাপোলগামী বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামবাহী একটি কনভয়ের পেছনে সাংবাদিক বহনকারী একটি সামরিক লরি ঢুকিয়ে দিয়ে কর্নেল উইশ ইউ সাকসেস এন্ড হ্যাপি জার্নি বলে বিদায় নিলেন।

সাংবাদিকবাহী লরির পেছনে ছিল কনভয়ের শেষ সামরিক লরি। এতে ছিল সাদা পতাকা। আমাদের গাড়ির আগের বড় বড় সামরিক ট্রাকগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সামরিক সরঞ্জাম ছিল। আমাদের চোখ ছিল সামরিক লরির বাইরের দিকে। বেনাপোল বর্ডার পার হলাম অনায়াসে। বেনাপোল বর্ডার চেকপোস্ট থেকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাস্তার দু'পাশে সামরিক লরি উল্টে পড়ে রয়েছে। আমাদের সামনের গাড়িতে ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গাইড। তার হাতে ছিল ক্ষুদ্র সামরিক মাইক্রোফোন। তিনি জানালেন যে, পাকিস্তানী দস্যুরা পেছনে হটে যাওয়ার সময় দিগদ্বিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে রাস্তার পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে নিচের খাদে ছিটকে পড়েছে। গাড়ির সৈনিক আরোহীদের কেউ কেউ মরে গেছে। পাশেই এদের রক্তাক্ত লাশ পড়ে রয়েছে। গুরুতর আহত কেউ কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেউ তাদের পাশে যাচ্ছে না। যাবেই বা কে? রাস্তায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গাড়ি ও লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওদের হত্যা করার জন্যে মিত্রবাহিনীর কোনো গুলি খরচ করতে হয়নি।

পশ্চিমবাংলা সীমান্তের দিক থেকে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর বিশাল বহর, ট্যাংক ও কামানবাহী গাড়ি থেকে বিরামহীন গোলাবর্ষণের মুখে বেনাপোলে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষাব্যূহের অবস্থান ছেড়ে পেছনে পালাতে গিয়ে রাস্তার পাশের বড় বড় গাছে ধাক্কা খেয়ে জখম হয়ে পড়ে রয়েছে। বেনাপোল থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে দেখতে পেলাম বহু পাকিস্তানী সৈন্যের লাশ পড়ে রয়েছে। অঝোর ধারায় তখনো এদের দেহ থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। অনেক সামরিক গাড়ি দেখতে পেলাম রাস্তার দুপাশে পড়ে রয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকরা গাড়ি থেকে নেমে এসব ছিটকে পড়া পাকিস্তানী সামরিক গাড়ি আর লাশের ছবি তুলেছেন।

আমাদের সামনের গাড়ির সামরিক গাইড জানালেন এদের কেউ ভারতীয় বাহিনীর গোলাতে মারা যায়নি। মারা গেছে পালাবার সময় রাস্তার পাশের গাছের সঙ্গে গাড়ি একসিডেন্ট করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী গত দু'তিন দিন থেকে এদেরকে পেছন দিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিলো। আজ ভোরে অবরোধ তুলে নিয়ে এদেরকে ঝিকরগাছার দিকে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সামনে থেকে সুসজ্জিত ভারতীয় বাহিনীকে ঝিকরগাছার দিকে যেতে দেখেই ওরা নিজ অবস্থান ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিলো।

আমরা ঝিকরগাছা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে থাকতেই আমাদের কনভয় হঠাৎ থেমে গেলে। আমাদের সামরিক লরিতে লালবাতি জ্বলে উঠলো। বিপদ-সংকেত দেয়া হলো। আমাদের সামনের গাড়িতে বসা গাইড জানালেন, সামনে কপোতাক্ষ নদী। নদীর ওপারে ঝিরকাগাছা বাজার। পাকিস্তানী সৈন্যরা কপোতাক্ষ নদীর ওপার থেকে ঝিকরগাছায় গোলাবর্ষণ করছে। সামনে যুদ্ধ চলছে।

আমাদের গাড়ি থেকে নামতে নিষেধ করা হলো। গাড়িতে বসেই আমরা ভারী গোলার গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। গাইড জানালেন, পাকিস্তানীরা কিছুক্ষণ আগে ঝিকরগাছা বাজারের কাছে কপোতাক্ষ নদীর উপর সড়ক সেতু ও রেল সেতু মাইন দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এপারে ভারতীয় বাহিনীর সৈন্য ও রসদ বোঝাই সামরিক গাড়ি আটকা পড়েছে। গাড়িগুলো রাস্তার উপর লম্বা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলাম ভারতীয় বাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারিং কোরের লোকেরা একটি সামরিক ট্রাক থেকে বড় বড় রাবারের ডিঙ্গা নামিয়ে পাম্প করে ফুলিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। সাত-আটটি রাবারের ডিঙ্গা কলাগাছের ভেলার মতো সাজিয়ে স্টীলের ফ্রেম দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর স্টীলের কয়েকটি শীট ফেলে ভাসমান পুল বানিয়ে ফেলা হলো আধ ঘণ্টার মধ্যে। সামরিক বাহিনীর বুলডজারগুলো নদীর পাড় কেটে রাবারের ভাসমান পুল রাস্তা নামিয়ে দিলো।

মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজ শেষ হলে ভারতীয় সামরিক ট্রাক, লরি ও ট্যাংকবহরগুলো দ্রুত রাবারের ডিঙ্গির তৈরি পুলের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে ঝিকরগাছা বাজারে গিয়ে উঠেছে। এ সময় আকাশে ভারতীয় বিমান বাহিনী উড়ে উড়ে পাহারা দিচ্ছিলো। আমাদের কনভয়ে ছিল ভ্রাম্যমাণ ফিল্ড হাসপাতাল, পানির ট্যাংক. গোলা-বারুদের গুদাম, ওষুধের স্টোর, খাদ্যদ্রব্য, টেলিফোন তারের বড় বড় রিল, ভ্রাম্যমাণ টেলিফোন ও ওয়ারলেস সেট মেরামত কারখানা, সামরিক যানের স্পেয়ার টায়ার-টিউব, তাঁবু, ফোল্ডিং ফিল্ডখাট ইত্যাদি সাজ সরঞ্জামের ভ্রাম্যমাণ স্টোর। আধঘণ্টার মধ্যেই সামনে অগ্রসর হওয়ার সিগন্যাল পাওয়া গেলো। সামরিক সরঞ্জামবাহী গাড়িগুলো পার হওয়ার পরই আমাদের গাড়িকে নদী পার হওয়ার জন্যে ক্লিয়ারেন্স দেয়া হলো। তাড়াতাড়ি করে আমরা নদী পার হয়ে ঝিকরগাছা বাজারে গিয়ে উঠলাম। ওখানে গিয়ে বাজারে দোকানপাট খোলা পাওয়া গেলো। লোকজনে বাজার ভরতি। দিব্যি কেনাকাটা চলছে। কোনো উৎকণ্ঠা নেই লোকজনের মধ্যে। অথচ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে এখানে।

মাছ-বাজারে গিয়ে তাজা তাজা রুইমাছ দেখে কলকাতার সাংবাদিকরা বেজায় খুশি। তাঁরা বাজারে মাছ-শাক সবজির হাট দেখলেন। লোকজন বলেছে, কাছেই ঝিকরগাছার রেল স্টেশন। ওখানে বিহারীদের আস্তানা ছিল। ওরা নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সৈনিকদের দোসর হয়ে বাঙালি হত্যাযজ্ঞের উৎসব করেছে। এখন বেটারা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে পালাতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পড়েছে। ক্রুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা এদের ধরে গলা কেটে রেল লাইনের উপর ফেলে রেখেছে।

ঝিকরগাছা রেল স্টেশনে গিয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলাম। কারো কারো তখনো মৃত্যু হয়নি। গরু-ছাগল জবাই দেয়ার পর যেভাবে রক্ত ঝরে, সেভাবেই ওদের কাটা দেহ থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। কেউ কেউ কাঁৎরাচ্ছে, ছটফট করছে, হাত-পা নাড়ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেও কারো হৃদয়ে এদের ব্যাপারে এতটুকু

দয়ার উদ্রেক হতে দেখিনি বরং স্থানীয় যুবকরা এতদিন যারা বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছিলো—তারা এখন নির্ভয়ে এসে এসব খুনী বিহারীদের লাশ শনাক্ত করছে। এদের নাম ধরে গালাগালি করে বলছে, এরা কে কজন বাঙালিকে খুন করেছিল। কে কোন বাড়ির যুবতী মেয়েদেরকে তাদের অসহায় বাপ-মায়ের সামনে থেকে টেনে-হেঁচড়ে এনে পাশবিক নির্যাতন করেছে এবং কখনো কখনো তাদের প্রভু পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে উপহার দিয়েছে। আমাদের সামনেই বাঙালি যুবকরা এসব কথা বলাবলি করছিলো এবং এই পশুদের হত্যায় উল্লাস করছিলো।

স্থানীয় বাঙালিদের মুখে ঝিকরগাছার এই উর্দুভাষী পাষণ্ড লোকদের নৃশংস বাঙালি হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক কাহিনী শুনে আজ এদের গণজবাইয়ে আমাদের হৃদয়েও কোনো দয়ার উদ্বেগ হয়নি। মনে মনে বলেছি, হায়রে, মানুষ কত নিষ্ঠুর। মানুষ মানুষকে প্রকাশ্যে উৎসব করে বলি দিচ্ছে। গলা কেটে রেললাইনের উপর ফেলে রাখছে অথচ কেউ কিছু বলছে না। প্রতিবাদ করছে না। তাজা রক্তের স্রোত বয়ে চলছে ঝিকরগাছা রেল স্টেশন সংলগ্ন বিহারী বস্তিতে অথচ কেউ কোনো দুঃখ করছে না। সময়ে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মানুষ যে কত নিষ্ঠুর ও নির্মম হতে পারে, এটা তারই একটি বাস্তব নজীর।

একজন ভারতীয় সাংবাদিক বলছিলেন, ওদের হত্যা করেছে কেন, ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিলেই তো ভালো হত। উল্লেখ্য, তখনো ঝিকরগাছায় বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তখন কেবল ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানীদেরকে তাড়িয়ে ঝিকরগাছার দখল নিয়েছে। উক্ত ভারতীয় সাংবাদিকের এই সহানুভূতি দেখে স্থানীয় এক যুবক ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, স্যার, এদের হত্যা দেখে আপনি চমকে উঠছেন! গত নয় মাসে ওরা কত মায়ের বুক খালি করেছে, হত্যা করেছে বাঙালিদেরকে তা তো দেখেননি। সেই করুণ দৃশ্য দেখলে আপনি নিজেই হার্টফেল করতেন।

কলকাতার সাংবাদিক বন্ধুটি আর কোনো কথা বলেননি। কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্যও ধরে এনে বিহারীদের সঙ্গে গলা কেটে রেললাইনের উপর ফেলে রাখা হয়েছিলো। এদের পরনে সামরিক ইউনির্ফম ছিল। কয়েকজন রাজাকার ছিল লাশের সারিতে। ওদের পাষণ্ডতায় আমাদের হৃদয়ও সেদিন পাথর হয়ে গিয়েছিলো, আমরাও পাষণ্ড হয়ে পড়ে ছিলাম। কোনো আক্ষেপ হলো না এতগুলো মৃত্যু দেখে। নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ-যুবকের লাশের সারি ঝিকরগাছা রেল স্টেশনে একটুও আক্ষেপ জাগায়নি—এতটুকুও স্পর্শ করেনি হৃদয়কে। মানুষ হয়েও সেদিন এত পাষণ্ড হয়েছিলাম কেমন করে এবং কেন, এর কোনো জবাব নেই। এ জবাব মুখে দেয়া যাবে না। লিখে দেয়া যাবে না। ২৫ মার্চের পর থেকে পাকিস্তানী সৈনিক ও তাদের দোসর রাজাকার আল-বদর, আল-শামস এবং বাংলাদেশে আশ্রিত উর্দুভাষীরা যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো, সে হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক দৃশ্যই হয়তো ঝিকরগাছার এই অবাঙালি হত্যাযজ্ঞের সঠিক জবাব। তাই দুঃখ হয়নি।

॥ একান্ন ॥

আমরা যখন ঝিকরগাছা রেল স্টেশন ও তার আশপাশে ঘুরে ঘুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের ফেলে যাওয়া বাংকার ও যুদ্ধের আলামত দেখছিলাম, তখন আমাদের কলকাতার ও বিদেশী সাংবাদিক বন্ধুরা ঝিকরগাছা বাজারে একটি চায়ের স্টলে বসে চা খাচ্ছিলেন। আমরা ওদের কাছে যেতেই একজন বলে উঠলেন, তোমরা আমাদেরকে ফেলে কোথায় গিয়ে একলা কি খেয়ে এলে?

বিনয়ের সঙ্গে বললাম, কিছুই খাইনি। লোকজন ধরে নিয়ে গিয়েছিলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ড দেখাতে।

তাঁরা বললেন, কনভয়ের অনেক গাড়ি যশোরের দিকে এডভাঞ্চ করেছে। আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে যাইনি।

আমরা একটি তাজা বড় রুই মাছ ঝিকরগাছা বাজারের এক রেস্টুরেন্টে দিয়ে গেলাম ফ্রাই করে রাখার জন্যে। কলকাতার সাংবাদিক বন্ধুদের বড় আফসোস বাংলাদেশের তাজা রুই ফ্রাই খাওয়ার অর্ডার দিয়ে আমরা কনভয়ের পিছু ছুটলাম যশোরের দিকে। সামরিক গাইড আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের গাইড মাঝে মাঝে তাঁর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সামনের কনভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিয়েছিলেন রাস্তা ক্লিয়ার আছে কিনা। কনভয়ের সঙ্গে না থাকায় ঝিকরগাছা থেকে যশোরে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে রাস্তায় টহলরত ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। তবে সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাইড থাকায় সামনে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়েছিলো।

ঝিকরগাছা থেকে যশোরে যাওয়ার পথের দুপাশের মাঠে, আখ খেতের পাশে এবং জঙ্গলের পাশে দেখতে পেয়েছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ঘাঁটি। হাজার হাজার সৈন্য যার যার কাজ করছে।

যশোরের ঝিকরগাছা থেকে শের শাহের তৈরি গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে যত আমরা যশোর শহরের দিকে এগুচ্ছিলাম, আমাদের চোখে পড়ছিলো রাস্তায় দু'পাশে নিহত পাকিস্তানী সৈন্যদের অসংখ্য লাশ। দেহের ক্ষত দিয়ে তখনো তাজা রক্ত ঝরছিলো। মুমূর্ষু অসংখ্য পাকিস্তানী সৈনিকের বুকে তখনো মৃদু কম্পন দেখা গিয়েছিলো।

মিত্রবাহিনীর গাইড গাড়িতে বসা সাংবাদিকদেরকে জানান যে, এদের অধিকাংশই পেছনে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছে গাড়ি ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে আহত হয়ে মারা গেছে। যশোরমুখী মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে ভয়ে যশোর শহরের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলো এরা।

রাস্তার দু'পাশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ছিটকে পড়া সামরিক জীপ এবং সামরিক লরিও উল্টে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যারা গাড়ি ছাড়া রাস্তা ধরে দৌড়ে পালাচ্ছিলো তাদের উপর মিত্রবাহিনী বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করেছিলো। এদের তাজা রক্ত ও শরীর দেখে মনে হয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে এদের উপর হামলা চলেছে।

আরো হৃদয়বিদারক ও ভয়াবহ দৃশ্য চোখে পড়েছে যশোর শহর থেকে খানিক দূরে যশোর-খুলনা সড়কের দু'পাশে এবং আশপাশের এলাকায়।

পাকিস্তানী সৈন্যদের যশোর ছেড়ে যাওয়ায় আনন্দ-কোলহলময় শহরে পৌঁছে লোকজনের মুখে আমরা শুনতে পারলাম যে, যশোর শহরের অদূরে যশোর-খুলনা সড়কে এখনো যুদ্ধ চলছে। মিত্রবাহিনী খুলনার দিকে পলায়মান পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে খুলনার দিকে। যশোর শহর থেকে বের হওয়ার পরই শহরের উপকণ্ঠে পলায়মান পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর ট্যাংক এবং বিমান থেকে গোলাবর্ষণ হয়েছে।

যশোর শহরের কোতোয়ালী থানার সামনে একটি রেস্তোরাঁয় আমরা চা খেয়ে নিচ্ছিলাম। রেস্তোরাঁয় লোকজনের মধ্যে পরম স্বস্তি দেখলাম। লোকজন বলাবলি করছিল যশোর শহর মুক্ত হয়ে গেছে। শহরের দখল নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী শহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরের বিহারীবসতি এলাকা ভারতীয় বাহিনী ঘিরে রেখেছে। মুক্তিবাহিনী ও বাঙালি যুবকরা এসব বিহারীবসতি এলাকায় হামলা চালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। স্থানীয় বিহারীরা গত নয়টি মাস ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। বিহারীরা সারা যশোর শহরে নয় মাস ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক লোকজনও এদের পৈশাচিক গণহত্যা থেকে রেহাই পায়নি।

চা খেয়ে আমরা যশোর শহর থেকে পূর্ব দিকে যশোর-খুলনা রোড ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। শহরের পূর্ব দিকে নীলগঞ্জ নামক এলাকায় গিয়ে শুনলাম সামনে যুদ্ধ চলছে। মিত্রবাহিনী ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করেছে খুলনার দিকে পলায়মান পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর। মর্টার শেলও করা হচ্ছে। উপর থেকে চলছে বিমান হামলা।

সাংবাদিক জেনে শহরের উল্লাসমুখর লোকজন আমাদেরকে যশোর শহরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর ও বিহারীদের নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের স্থানগুলো দেখাবার জন্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমাদের মন ছিল রণাঙ্গনের দিকে। তাই লোকজনদের বললাম, ফেরার সময় ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলার স্থানগুলো দেখতে যাবো। এখন সামনে এগুতে হবে।

কৌতূহলী লোকজনকে হতাশ করে আমরা খুলনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। শহরের পূর্ব দিকে নীলগঞ্জ পার হতেই সামনে থেকে সিগন্যাল এলো আর সামনে না এগোবার জন্যে। সামনেই যুদ্ধ চলছে।

আমাদের গাড়ি বেশ খানিকক্ষণ থেমে রইলো। মুক্তিকামী মানুষের বিজয় মিছিলও এগিয়ে যাচ্ছিলো মিত্রবাহিনীর পিছুপিছু। মিছিলকারীদের কেউ কেউ আমাদের গাড়ির কাছে এসে বললো, গাড়িতে বসে থেকে কিছুই দেখতে পাবেন না। গাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে সামনে এগিয়ে চলুন—কত লাশ, ট্যাংক ও মর্টারের গোলার আঘাতে আহত পাকিস্তানী সৈন্যরা মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ফটোগ্রাফার গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ছুটলো সামনের দিকে। আমরাও তাদের পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর এগুতেই দেখলাম রাস্তা দু'পাশে পাকিস্তানী সৈন্যদের অসংখ্য লাশ পড়ে রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন জানালো, পাকিস্তানী সৈন্যরা যশোরের দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীর ট্যাংক বহর দেখে রাস্তার পাশে কলার বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু মিত্রবাহিনীর বিমানের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। বিমান থেকে এদের উপর হামলা চালালো হয়েছে। কলার বাগানের আশেপাশে অসংখ্য লাশ।

কোনো কোনো সৈনিকের মাথার খুলি উড়ে গেছে। মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ঝলসে গেছে। কোনো কোনোটির গায়ের কাপড় থেকে ধোঁয়া উড়ছে। কাপড়ে আগুন জ্বলছে, আশেপাশে রাইফেল, মেশিনগান, মর্টারের শেল পড়ে রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসব অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে নিচ্ছে। এদের কোমর থেকে বেয়নেট, রিভলবার দেহ থেকে খুলে নিচ্ছে।

আরো কিছু দূরে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাস্তার পাশে পাকিস্তানী সৈন্যদের পরিত্যক্ত তাঁবু আগুনে পুড়ছে। লোকজন জানালো, এখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘাঁটি বানিয়েছিলো। খুলনা দিয়ে আসা রসদ-সরঞ্জামের মজুদ গড়ে তুলেছিলো এখানে। এখন সবকিছু ফেলে খুলনার দিকে পালিয়ে গেছে। এই ঘাঁটি এলাকার এক জায়গায় এক মর্মন্তুদ দৃশ্য চোখে পড়লো। পরিত্যক্ত একটি তাঁবুর সামনে ভাত ও গোশত ভরতি থালা-বাসন পড়ে রয়েছে। বোধহয় এ তাঁবুতে অফিসার ছিলেন পরিবারসহ। তারা ভাত খেতে বসেছিলেন খানিক আগে।

আমরা পরিত্যক্ত তাঁবুর কাছে থালায় গোশ্‌ত মাখানো ভাত দেখতে পেলাম। হয়তো কয়েক তংকা খেয়েছিলো। এরপর হতভাগার ভাগ্যে আর সময় জোটেনি ভাত খাওয়ার। অবশিষ্ট খাবার, গোশতের টুকরো থালায় ফেলেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

পাশে আরও কয়েকটি থালায় গোশত মাখানো ভাত ছিল। একটি ছোট থালাতেও কিছু ভাত ছিল গোশত মাখানো। মনে হয়েছে ছোট কোনো ছেলেমেয়ে খেতে বসেছিলো। কিন্তু ভাগ্যে জোটেনি খাবার। ফেলে রেখেই পালাতে হয়েছে। পাশে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা, পুতুল ইত্যাদি চোখে পড়েছে। তাঁবুর ভেতরে চামড়ার একটি খোলা সুটকেসে মেয়েদের ওড়না ও অন্যান্য কিছু পুরানো কাপড়, বাচ্চাদের কাপড় ছিল। তাঁবু এলাকার আশপাশে বহু লাশ পড়েছিলো। ছোপ ছোপ রক্ত দেখা গেছে মাটিতে।

কৌতূহলী লোকজন অদূরের আখ ক্ষেত এবং কলাবাগানে গিয়ে কি যেন খোঁজাখুজি করছে। আখ ক্ষেত ও কলাবাগানে গিয়ে ওরা আরো লাশ পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে উঠেছে। মারাত্মক আহত হয়ে যেসব সৈন্য আখ ক্ষেত ও কলাবাগানে আশ্রয় নিয়েছিলো সবার অলক্ষ্যে কলাবাগান ও আখক্ষেতেই যেসব হতভাগার মৃত্যু হয়েছিলো।

বিদেশী সাংবাদিকরা এসব পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় গাঁটরি-পেটরার ছবি তুলেছেন। ছবি তুলেছেন আখ ক্ষেত ও কলাবাগানে পড়ে থাকা পাকিস্তানী সৈন্যদের তাজা লাশের। যুদ্ধের বিভীষিকা ও তাণ্ডবলীলা জীবনে এই প্রথম নিজ চোখে দেখলাম। এসব হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে মানুষ হয়ে মানুষের এই নির্মম হত্যাযজ্ঞে ব্যথিত হইনি, ব্যথিত হতে পারিনি! মানুষের এই হত্যাযজ্ঞ হৃদয়কে স্পর্শ করেনি, ব্যথিত করেনি, বরং ভাবিয়ে তুলেছে। নয় মাসের ওদের পৈশাচিক বাঙালি হত্যাযজ্ঞের বিভীষিকাময় স্মৃতি বরং ক্ষুধার্ত সিংহের মতো আরো হিংস্র করে তুলেছে। জিঘাংসু করে তুলেছে। প্রতিহিংসার আগুন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইচ্ছা হয়েছে, এমনি করে যদি অত্যাচারীদের আবাসভূমি পাকিস্তানটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারতাম, তাহলে হৃদয়ের প্রতিহিংসার আগুন নিবাতে পারতাম। আমরাও ওদের মতো

নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড হয়ে গিয়েছিলাম। লোকজন বলছিল, এখানে পাকিস্তানীদের অনেক সৈন্য-সামন্ত ছিল। বহুসংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মনে আরও আগুন জ্বলে উঠেছে। ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে মিত্রবাহিনীর প্রতি। কেন এদেরকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হলো? ভারতীয় বাহিনী কি এদেরকে এখানে সমূলে ধ্বংস করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে?

আমাদের গাইড কোথা থেকে ঘুরে এসে জানালেন, আর সামনে যাওয়া যাবে না। যশোর-খুলনা রোডের মাঝপথে পাকিস্তানী সৈন্যরা শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। খুলনা শহরকে ভারতীয় বাহিনীর অভিযান থেকে রক্ষা করার জন্যে পাকিস্তানীরা শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জীবনপণ লড়াই করে। যশোর-খুলনা সড়কের মাঝপথে অগ্রসরমান বিজয়-অভিসারী ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধে আটকিয়ে রেখে খুলনা শহর থেকে পাকিস্তানীরা নিরাপদে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিচ্ছে। আর মিত্রবাহিনীও চাচ্ছে পাকিস্তানী বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে খুলনায় জমায়েত করে অবরোধ করে রাখতে। মিত্রবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করতে চাচ্ছে না। তাই তারা প্রথমে পাকিস্তানী অবস্থানের উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে তাদের ক্ষয়ক্ষতি করে, তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এক জায়গায় কনসেনট্রেটেড হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। উদ্দেশ্য এক জায়গায় এনে অবরোধ করে রেখে আত্মসমর্পণ করানো।

আমাদের গাইড ফিরে এসে জানালেন, যুদ্ধ আপাতত থেমে গেছে। যশোর-খুলনা রোডে দু'পক্ষ নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে আছে। গাইড তাড়া করলেন গাড়িতে গিয়ে ওঠার জন্যে। এখন কলকাতায় রওনা হতে হবে।

আমার একান্ত ইচ্ছে ছিল খুলনার দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার। এ বাসনা মনের কোণেই রয়ে গেল। শেষবারের মতো রণাঙ্গনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলাম। দূরে—খুলনা যাওয়ার রাস্তার দু'পাশের খোলা প্রান্তরে তখনো কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠছে দেখতে পেলাম। যশোরের দিক থেকে এসে মিত্রবাহিনীর এক বিরাট দল পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া ঘাঁটিতে এসে অবস্থান নিচ্ছে। গাড়ি থেকে তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম নামিয়ে প্রান্তরে তাঁবু খাটাচ্ছে অদূরের আখ ক্ষেত ও কলাবাগান ঘেঁষে। টিউবয়েল সারাচ্ছে। টেলিফোন লাইন তৈরির তারের রীল খুলছে। তাঁবু খাঁটিয়ে রান্নার সামগ্রী মজুদ করছে। ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। বাসন-কোশন, ডেক-ডেকচি, হাঁড়ি-পাতিল, জেনারেটর নামানো হচ্ছে সামরিক লরি থেকে। এক সেনা ছাউনি উৎখাত করে আরেক সেনা ছাউনির পত্তনের আয়োজন চলছে। কৌতূহলী লোকজন এসে দাঁড়িয়ে নতুন সেনা ছাউনি পত্তনের তামাশা দেখছে। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে, বুক মিলাচ্ছে, বন্ধুত্ব গড়ে তুলছে। মানুষের মনে এখন আর কোনো ভয় নেই। যশোর মুক্ত হয়ে গেছে। এখন কেবল চারদিকে বিজয়-উল্লাসের ঢেউ মুক্ত এলাকা জুড়ে। আমাদের কনভয় ছোট হয়ে গেছে। কলকাতার যে সব সামরিক লোকজন এসেছিলো তাদের অনেকেই যশোর থেকে গেছেন। শুধু আমাদের গাইডের গাড়িসহ সাংবাদিকদের গাড়িগুলো নিয়ে একটি ছোট কনভয় এখন বাংলাদেশের সদ্যমুক্ত এলাকা দিয়ে বিজয়ের গর্ব নিয়ে যশোর হয়ে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলছে। পথে পথে বিজয়ী মানুষের মিছিল আর জয়বাংলা শ্লোগানে মুখরিত চারপাশ।

॥ বাহান্ন ॥

যশোর-খুলনা সড়কের মাঝপথের রণাঙ্গন থেকে যশোর শহরের মুক্ত স্বাধীন মানুষের বিজয় মিছিলের উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত এক অভূতপূর্ব তরঙ্গমালা দেখেছিলাম মুক্ত বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত শহর যশোরের পথে পথে। এ যেন এক বাঁধভাঙ্গা জোয়ার! শহরের অলিগলি, আনাচ-কানাচ এমনকি শহরের লাগোয়া গ্রামগুলো থেকেও মিছিলের অবিশ্রান্ত স্রোত বইছিলো। বাড়ির ছাদের উপর থেকে মিছিলের উপর ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিলো ফুল আর সুগন্ধভরা রঙ্গিন পানি—যেন রংয়ের হোলি উৎসব। যশোর শহরের পথঘাটে বিজয়দীপ্ত মানুষের অবিশ্রান্ত মিছিলের স্রোত উপচে পড়েছিল। উল্লাসমুখর এই অগণিত মানুষের চোখেমুখে এই সেদিন মাত্র মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানোর ব্যথা-বেদনার লেশমাত্র ছাপ নেই। এদের এই অভূতপূর্ব বিজয়-উল্লাস দেখে কে বলবে যে এদেরই কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে মা-বাবা কিংবা ভাই-বোন, এমনকি, নিজ ঘরবাড়ি পর্যন্ত হারিয়েছে। হয়তো মিছিল শেষে ফিরে গিয়ে ঠাঁই নেয়ার মতো ঘরবাড়িও নেই। পাকিস্তানী বাহিনী এদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। অথচ এদের চোখে এসবের কোনো ছাপ নেই। সব ব্যথা-বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছিলো বিজয়ের উল্লাস।

রণক্ষেত্রে চাক্ষুষ যুদ্ধ দেখার চেয়েও মানুষের এই আনন্দ-বিহ্বলতার দৃশ্য সত্যি এক বিরল দৃশ্য। নিজেকে সে সময় একজন খুবই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করেছিলাম। একই সঙ্গে পাশাপাশি যুদ্ধ আর বিজয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের এমন দুর্লভ দৃশ্য যিনি দেখতে পারেন, তাঁকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই বলতে হবে। যশোর শহরের বিজয়দীপ্ত একই মানুষের মুখে পরাধীনতার গ্লানি এবং বিজয়ের পর স্বাধীনতার আস্বাদন লাভের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি তা আমার স্মৃতিকে চির উজ্জ্বলতায় সমৃদ্ধ করেছে। এই স্মৃতি চিরসতেজ—চিরভাস্বর। এই স্মৃতি মানব-ইতিহাসে দাসত্বের শৃংখল ছিঁড়ে শৃংখলিত মানুষের মুক্তির আস্বাদন লাভের স্নিগ্ধনিখাদ পরিতৃপ্তির এক জীবনছবি।

যুদ্ধ অনেকেই দেখেছে—দাসত্বের শৃংখল কত কঠোর তাও দেখেছে, কিন্তু দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে, দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে মুক্তি পাওয়ার আনন্দমুখর মুহূর্তকে ক'জন দেখেছে? দেখার সৌভাগ্য হয়েছে ক'জনার?

কথাশিল্পী শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে ক্রীতদাসের মুখে হাসির কথা পড়েছি। কিন্তু হাসি চোখে দেখিনি। যশোর শহরের প্রাণোচ্ছল মানুষের মিছিলের আনন্দ-বিহ্বলতার ঝর্ণাধারা দেখে মনে হয়েছিলো, যেন সত্যি এতদিনে আমি ক্রীতদাসের হাসি দেখতে পেয়েছি, ক্রীতদাসের মুখের হাসির নেপথ্য হৃদয়লোককে অনুভব করতে পেরেছি। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে। আল্লাহ তাঁর এই নগণ্য বান্দাকে তাঁর মাতৃভূমির মুক্তির যুদ্ধ দেখিয়েছেন, যুদ্ধের পরমুহূর্তে বিজয়ের অনাবিল আনন্দ-উচ্ছলতাও দেখিয়েছেন। সত্যি, আমার ওপর এটা আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কি?

যশোর শহর ছেড়ে আমরা যখন কলকাতা যাওয়ার জন্যে ঝিকরগাছার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি, শহরের শেষপ্রান্তে চাসাড়া নামক স্থানে পৌঁছে কলকাতা থেকে আগত

মিত্রবাহিনীর হাস্যোৎফুল্ল এক রেসকিউ বাহিনীর সঙ্গে দেখা। তাদের সামরিক বহর দেখে আমাদের গাড়ি থেমে গেলো। আমাদের সামনের গাড়ির গাইড তাদেরকে সালাম দিয়ে জানালেন, সাংবাদিক—রণাঙ্গন থেকে ফিরছেন। ক্লিয়ারেন্স দিলে আমাদের গাড়ি সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

গাইড পথে আমাদেরকে জানালেন যে, সাদা পতাকাধারী এই বাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টে কোম্বিং অপারেশন চালাবে। কোম্বিং অপরাশেনের অর্থ সেসময় আমি জানতাম না। কোম্ব অর্থ চিরুনী বা কাঁকই। কিন্তু কোম্বিং অপারেশনের সঙ্গে এই চিরুনী বা কাঁকইর কি সম্পর্ক, তা কারও কাছে জানতে চাইনি, পাছে নিজের বিদ্যা ধরা পড়ে যায়, এই ভয় ও লজ্জায়। পরে অবশ্য কলকাতা গিয়ে আমাদের জেনারেল ওসমানী সাহেবের এডিসির কাছ থেকে কোম্বিং অপারেশনের সামরিক অর্থ বুঝে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ যেমনভাবে কৃষকরা ছোট অবস্থায় পাট ক্ষেতে আঁচড়া দিয়ে ঘাস ও আগাছার মূলোৎপাটন করে, মিত্রবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টে এমনিভাবে আঁচড়াবে (কোম্বিং করবে)। অর্থাৎ যশোর ক্যান্টনমেন্টের নাড়ীনক্ষত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কিনা। কিংবা ক্যান্টনমেন্টে কোথায় পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যরা কি রেখে গেছে—তা খুঁজে বের করবে। কোথাও মাইন পুঁতে রেখেছে কিনা। অস্ত্রভাণ্ডার সব। এরপর পরিষ্কার করে মিত্রবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টের পুরো দখল নেবে। তারা ওখানে ঘাঁটি গেড়ে বসবে।

গাড়িতে কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকার* তৎকালীন রিপোর্টার সুখরঞ্জনদা বোধহয় আমার পাশেই ছিলেন। আমাকে একটি ধাক্কা দিয়ে বললেন, এই নজরুল,আমরা যে ফের ঝিকরগাছায় এসে গেলাম। তুমি তো কিছু বলছো না। পাছে রুই মাছ ভাজাগুলো ফেলে যাই! তোমাদের গাইডকে বলে দাও ওই রেস্তরাঁর সামনে গিয়ে থামতে।

আমি গাইডকে জানলাম যে ঝিকরগাছায় সকালে যে রেস্তরাঁয় চা খেয়েছিলাম সেখানে গিয়ে গাড়ি থামাতে হবে। সারাদিন সাংবাদিক অতিথিদের ভাত খাওয়া হয়নি। ঝিকরগাছার ওই হোটেলে ভাত খেতে হবে। পেট ঠাণ্ডা করে এরপর রাজধানী মুজিবনগরে যাবো।

আমাদের গাইড বললেন, গাড়ি অবশ্যই থামানো হবে। কিন্তু ভাত খাওয়ার জন্যে সময় দেয়া যাবে না। কারণ সন্ধ্যার আগেই আমাদেরকে কলকাতা গিয়ে পৌঁছাতে হবে। রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় এই পথে সামরিক গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। নক্সালরা ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই বেলা থাকতে থাকতেই কলকাতায় পৌঁছাতে হবে। আপনারা বরং মাছ ভাজাগুলো প্যাকিং করে গাড়িতে নিয়ে নিন এবং ভাত ঠোঙ্গায় ভরে নিন। গাড়িতে বসে খাবেন।

ঠোঙ্গায় ভরে ভাত নিতে সবারই আপত্তি ছিল। আমাদের গাইড বললেন, ভাত রান্না করে রাখার জন্যে তোমরা অর্ডার দিয়েছিলে নাকি?

বললাম, হ্যাঁ।

ব্যস, কোনো চিন্তার কারণ নেই, ভাতের মূল্য হোটেলওয়ালাকে দিয়ে বলে দাও গরীব মানুষের মধ্যে ভাতগুলো বিলি করে দিতে।

সুখরঞ্জনদা এবং আমি নিরাশ হলাম, হায় স্বাধীন বাংলাদেশের চালের ভাত খেতে পারবো না। কত আরাধ্যই না ছিল মুক্ত বাংলার একমুঠো ভাত। সুখরঞ্জনদা বললেন, চিন্তা করো না। চলো, আমরা মুড়ি কিনে নিয়ে নিই। গাড়িতে বসে মুড়ি দিয়ে রুইমাছ ভাজা খাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ঠোঙ্গায় করে মুড়ি কিনে নিলাম। গাড়িতে বসে বসে আমরা সারাপথে মুক্ত ঝিকরগাছার রুইমাছের ভাজা দিয়ে মুড়ি খেলাম। গর্ব আর আনন্দে টগবগ করছিলাম আমরা। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী বলে তাদের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দেবো। বাহবা নেবো।

কলকাতায় পৌঁছে বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে সাংবাদিকদের পৌঁছিয়ে দিয়ে মুজিবনগর সরকারের দফতরে গিয়ে পৌছলাম। সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার বললেন, নজরুল সাব কেমন দেখলেন যশোর? যশোর কি মুক্ত করতে পারলেন?

বড় গলায় বললাম, যশোর কেন, এতক্ষণে হয়তো খুলনাও মুক্ত হয়ে গেছে।

মেজর বাহার মুখে উপক্ষোর হাসি হেসে বললেন, খুলনা শহর মুক্ত হয়ে গেছে, এটা কোনো নতুন খবর নয়। আমি আপনাকে এর চেয়ে বড় খবর দিচ্ছি। এতক্ষণে সারা বাংলাদেশই মুক্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু আখাউড়াতে এখনও ছোটখাট সংঘর্ষ চলছে। আখাউড়াতে পাকিস্তানীদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ত্রিপুরা ও আসাম আক্রমণের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছিলো আখাউড়াতে। এদিকে মিত্রবাহিনী ঢাকার কাছে ডেমরায় পৌঁছে গেছে! জয়দেবপুর, মানিকগঞ্জ, সাভার—সবদিক থেকে ঢাকা শহরকে অবরোধ করে রেখেছে মিত্রবাহিনী। দু'তিন দিনের মধ্যে আমাদের অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী যশোর যাবেন।

আমি আর কোনো ক্রেডিট নিতে পারলাম না। দু'দিন পরই সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের আট নয়তো দশ তারিখে মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সামরিক কর্ডন সহকারে সড়কপথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে এই প্রথম মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের যশোরে গেলেন। জেনারেল ওসমানী না গেলেও আমি গিয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে যশোর যাওয়ার পথে পেট্রাপোল পর্যন্ত রাস্তার পাশে ভারতীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল। পেট্রাপোল বর্ডারে গেলে ভারতীয় বাহিনী গার্ড অব অনার প্রদান করে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে। এরপর সীমান্ত গেট খুলে দেয়া হয়। গেট খুললেই আমাদের বেনাপোল বর্ডার। গেট পার হতে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বাহিনীর সম্মিলিত একটি সশস্ত্রদল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রবেশপথে উষ্ণ স্বাগতম জানায় এবং আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার প্রদান করে। হাজার হাজার মানুষ বেনাপোল বার্ডারে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে প্রাণঢালা সাদর অভ্যর্থনা জানায়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাব হোসেন, রওশন আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা আনন্দ আর আবেগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

পথে পথে হাজার হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গাড়িতে বসা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন গাড়ি থেকে নেমে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

যশোর টাউন হল ময়দানে সেদিন যেন গোটা বাংলাদেশ ভেঙ্গে পড়েছিলো। লোকে লোকারণ্য। সারা যশোর মানুষে মানুষে একাকার হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই প্রথম পদার্পণ করলেন। যশোর টাউন হলে আর লোক ধরে না। টাউন হল ভবনের ছাদে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রহরা ছিল। টাউন হল ময়দানের চারপাশের গাছের ডালগুলোও খালি ছিল না। গাছের ডালেও মানুষ ঝুলছিল মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দকে দেখার জন্যে। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বুকে বুক মেলাবার জন্যে মানুষের মধ্যে সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা। কিন্তু এত লোকের ভিড় ঠেলে নেতৃবৃন্দের হাত স্পর্শ করা কার সাধ্য?

॥ তিপান্ন ॥

একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের দশ-বারো তারিখের মধ্যে কার্যত বাংলাদেশ পাকিস্তানী রাহুমুক্ত হয়েছিলো। হানদার পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে ও তাদের সেনাছাউনীতে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। কার্যত এরা সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিলো। সেনাছাউনী, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তথাকথিত শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীর দাপট কিংবা অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাকি ছিল শুধু হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ট কণ্ঠও প্রায় স্তব্ধ এবং নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। পশ্চিম সীমান্তেও তারা পরাভূত হয়ে পড়েছিল। মাত্র দশ-বারো দিনের যুদ্ধেই যুদ্ধবাজ বিশাল পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী কাবু হয়ে পড়েছিলো। এদিকে নিঃশর্তভ আত্মসমর্পণের জন্যে মিত্রবাহিনীর অবিরাম আহ্বান আর সারা বাংলা জুড়ে মুক্ত মানুষের বিজয় মিছিলে গগনবিদারী স্লোগানের আওয়াজ অবরুদ্ধ ও পরাজিত খানসেনাদের মনোবল ভেঙে খান খান করে দিয়েছিল। ঢাকায় খানসেনা প্রধান জেনারেল নিয়াজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকা থেকে ইসলামাবাদের সঙ্গেও কোনো যোগযোগ করতে পারেন নি। বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আর যোগাযোগ করে খুব একটা লাভ হতো না। কারণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশের একটি অঙ্গ হারিয়ে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে বিপর্যস্ত হয়ে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা তাদের ক্ষমতার পরিধির হিসেব মিলাতে পারছিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে ততোক্ষণে ক্ষমতার প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় ঢাকায় দিশেহারা জেনারেল নিয়াজী আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে তৎকালীন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পিন্ডি-ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। ইসলামাবাদের উন্মাদ সামরিক জান্তাকে বাংলাদেশে তাঁদের বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে দেন জেনারেল নিয়াজী। তিনি আরও জানান, তাঁর কমান্ড শোনার মতো এখন আর কোনো সৈন্য

নেই। সবাই বলতে গেলে বন্দী এবং অবরুদ্ধ হয়ে গেছে ভারতীয় বাহিনীর হাতে। এখন আনুষ্ঠানিক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া বিশাল বাহিনীকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখার এই শেষ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না—এ পরামর্শ দিলেন ঢাকাস্থ খানসেনা প্রধান জেনারেল নিয়াজী।

মুজিবনগর সরকারের কলকাতাস্থ সদর দফতর এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরের জনসংযোগ দফতরে আনন্দ আর গুঞ্জরন, এইতো ঢাকায় পাকিস্তানীরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো বলে। পাকিস্তানের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের জবাবের অপেক্ষায় মুজিবনগর সরকার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড। কোনো কোনো সময় এমনিতেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, পাকিস্তান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয়েছে। তাদের সুমতি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন গুজব বের হচ্ছে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনায় বিভোর। মুজিবনগর সরকারে আগেই যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা চিন্তা করছেন কে কোন পদ নেবেন। যাঁরা অধিকৃত বাংলাদেশে এতদিন প্রাণের ভয়ে ও দায়ে চাকরিতে ছিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে পালিয়ে এসে মুজিবনগরে হাজির হয়েছেন। তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এখন ভিড় জমিয়েছেন মুজিবনগরে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এখন তাঁদের নিকট কিংবা দূরের চাকরিজীবী আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে বের করছেন এবং কাকে কোথায় নিয়োগ করা যায় এসব নিয়ে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের পাশে ঘুরঘুর করছেন এবং জোর তদবির করছেন। মুক্ত ঢাকায় অফিস আর পদ দখলের লড়াই এবং প্রতিযোগিতা কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোড থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

এ সময় মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে এবং আমাদের অর্থাৎ জেনারেল ওসমানী সাহেবের দফতরে সেনা অফিসারদের মধ্যে একটি কথা শুনেছিলাম। কথাটি এরকম মুজিবনগর সরকার খুলনা মুক্ত হওয়ার পর খুলনায় বেসামরিক প্রশাসন স্থাপনের জন্যে একজন ডিসি বা জেলা প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান। খুলনা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলনা-বরিশাল সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তাঁর সেক্টরের অফিস পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের হাসনাবাদ থেকে খুলনায় স্থানান্তর করেন। খুলনা সার্কিট হাউজে তিনি সেক্টরের সদর দফতর স্থাপন করেন। তাঁর অধীনস্থ বাহিনী সার্কিট হাউজের প্রহরায় নিয়োজিত। তিনিও সেখানে বেসামরিক প্রশাসন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ সময় মুজিবনগর থেকে সরকার নিযুক্ত ডিসি গিয়ে খুলনায় হাজির হন সরকারি সনদপত্রসহ। কিন্তু সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল নাকি মুজিবনগর সরকারের প্রেরিত বেসামরিক আমলার কাছে খুলনার বেসামরিক শাসনভার হস্তান্তর করতে রাজী হননি। এমনকি নবনিযুক্ত ডিসিকে খুলনা সার্কিট হাউজে অবস্থান গ্রহণ করতেও দেননি।

খুলনার নবনিযুক্ত ডিসি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন মুজিবনগরে। রিপোর্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে। প্রধানমন্ত্রী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এ খবর শুনে। তিনি ডেকে পাঠালেন জেনারেল সাহেবকে। সব শুনে জেনারেল ওসমানী

মেজর জলিলকে বলে পাঠান যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক সরকারের একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হবে। তোমরা সব ব্যারাকে চলে যাবে। সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সামরিক বাহিনী দিয়ে দেশ শাসনের চিন্তা আমাদের মাথা থেকে দূর করতে হবে। উই আর নট পাকিস্তান, রিমেম্বার ইট।

শুনেছি জেনারেল সাহেব মেজর জলিলকে এভাবে ধমকিয়ে সব বুঝিয়ে বলেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন খুলনায় ডিসি পাঠানোর জন্যে। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ওসমানীর কথা মতো আবার ডিসি পাঠালেন। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মেজর জলিল মুজিবনগর সরকারের নিযুক্ত ডিসির কাছে খুলনার বেসামরিক শাসনভার তুলে দিতে রাজী হননি। বরং মেজর জলিল মুক্ত খুলনায় তাঁর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তুলেছিলেন। মুজিবনগর সরকারের ডিসি তাঁর কাছে কোনো পাত্তা না পেয়ে ফিরে এসেছিলেন। মুজিবনগর সরকার ও জেনারেল ওসমানী রেগেমেগে আগুন। পারেন তো, মেজর জলিলকে এখনই গ্রেফতার করে শায়েস্তা করেন। এমনই অবস্থা।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার মেজর জলিলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো মুজিবনগরেই। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখ ভরা কালো দাড়ি-গোঁফ, ডান হাতের কবজীতে পাঞ্জাবী শিখদের মতো তামা কিংবা পিতলের একটি চূড় ছিল তাঁর। জেনারেল ওসমানী সাহেবই তাঁকে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে মেজর জলিল যখনই মুজিবনগর আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতেন। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিলো। তাঁর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে হাসনাবাদ ছিল বলে তিনি প্রায়ই জীপে করে হাজির হতেন কলকাতায়। উপরে বসদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আবার চলে যেতেন হাসনাবাদে। বসরাও খুব খুশি ছিলেন মেজর জলিলের উপর। হাসানাবাদের ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা এলাকা ছিল মুক্ত এলাকা। একদিন জেনারেল ওসমানীকে নিয়ে মেজর জলিল তাঁর সেক্টরের এসব মুক্ত এলাকা ঘুরিয়ে দেখিয়ে এনেছিলেন। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। আমার জন্যে তাঁর হাসনাবাদস্থ দফতরে ওপেন দাওয়াত ছিল। মেজর জলিল তাঁর অধীনস্থ বাহিনীর অপারেশনের বহু ছবি তুলে এনে আমাকে দিতেন কলকাতার পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। কলকাতায় থেকে যেহেতু মেজর জলিলের সেক্টরের খবরই বেশি এবং প্রতিদিনই পেতাম তাই প্রচারের দিক থেকে মেজর জলিল অগ্রগামী ছিলেন পত্রপত্রিকায়।

একবার মেজর জলিলের দুর্দান্ত বাহিনী অভিযান চালিয়ে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সুন্দরবন এলাকার ঘাঁটি দখল করে ফেলে। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া পুরো ওয়ারলেস সেট, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সব মেজর জলিলের বাহিনী দখল করে নেয়। এ সকল অভিযানের তাজা খবর দখলকৃত সামরিক সরঞ্জামের ছবিসহ এসে হাজির হলো কলকাতায়। তাঁর এই দুঃসাহসিক সফল অভিযানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ খুব খুশি হয়েছিলেন মেজর জলিলের উপর।

আমি মেজর জলিলের অভিযানের ছবিগুলো জেনারেল সাহেবকে দেখিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে কলকাতার পত্রপত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন এতে। মেজর জলিলের সেক্টরের অভিযান সংক্রান্ত এত বেশি খবর ও ছবি ছাপানোর জন্যে অন্যান্য সেক্টরের কয়েকজন কমান্ডার কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। সেদিনের মেজর জিয়াউর রহমান একজন সেক্টর কমান্ডার একবার কলকাতায় এসে আমাকে বলেছিলেন, আপনি তো শুধু মেজর জলিল সাহেবের সেক্টর নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। আমাদের দিকেও একটু খেয়াল-টেয়াল রাখবেন।

আমি বললাম, মেজর জলিলের প্রতি আমার নজর বেশি একথা ঠিক নয় স্যার। আপনাদের সেক্টরের খবর অনেক দেরিতে পাই এবং ছবি সচরাচর পাওয়া যায় না। এজন্যে আপনাদের সেক্টরের খবর বেশি ছাপা হয় না। আর মেজর জলিলের সেক্টরের দিনের খবর দিনই পাওয়া যায়। তাই প্রচার বেশি মনে হয়।

মেজর জলিল আমাকে তাঁর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করতেন। অবশ্য আমি কার কতটুকু হিতাকাঙ্ক্ষী কিংবা শুভাকাঙক্ষী তাতে তাঁদের কারও কোনো কিছু আসে যায় না।

শুনেছি অবাধ্যতার কারণে মেজর জলিলকে খুলনা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় গ্রেফতার করা হয়েছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁর কাছ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলো। মেজর জলিলকে বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। মেজর জলিলকে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি। মেজর জলিলের গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে আমি এরকমই শুনেছিলাম। পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে মেজর জলিলের গ্রেফতার সম্পর্কে অনেক রাজনৈতিক রং ছড়ানো হয়েছিলো। তবে মেজর জলিলকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে জেনেছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রশাসনের উপর বাংলাদেশ সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এমনকি, ভারতীয় সেনাবাহিনীরও কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের কারা প্রশাসনের উপর। বাংলাদেশে গ্রেফতারকৃত মেজর জলিলকে কার হেফাজতে রাখা হবে ভারতীয় সেনাবাহিনী তার কোনো গ্যারান্টি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পায়নি। তাই মেজর জলিলকে গ্রেফতারের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হেফাজতে নেয়া হয়েছিলো। জেনারেল ওসমানী অবাধ্যতার কারণে এবং সামরিক ডিসিপ্লিন ভঙ্গের কারণে তাঁর প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের উপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দও এ ধরনের কথিত আচরণের কারণে এই সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধার উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। এ কারণে পরবর্তীতে মেজর জলিলকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আর গ্রহণ করা হয়নি। তবে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মেজর জলিলের অপরিমেয় ত্যাগ ও অমূল্য অবদান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

॥ চুয়ান্ন ॥

একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখের পর থেকেই মুজিবনগরে তথা কলকাতা নগরীতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সারেন্ডারের অনিবার্যতার কথা আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিলো। যুদ্ধের খবর কি—এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আর কারো মুখে উচ্চারিত হয়নি। কলকাতার সর্বত্র একটিই মাত্র প্রশ্ন—পাকিস্তানী বাহিনী কবে কখন সারেন্ডার করছে?

প্রশ্নের জবাব তাৎক্ষণিকভাবে কেউ দিতে পারছে না। আমিও অনেক জায়গায় এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় বেয়াকুব বনে গিয়েছিলাম। পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনী কখন সারেন্ডার করছে এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারায় কেউ কেউ আমাকে বলতেন, তুমি কোনো খবরই জানো না। কিসের পিআরওগিরি করো?

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ অপেক্ষায় ছিলেন দিল্লী থেকে কি খবর আসে তা জানার জন্যে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘোষণাই বারো ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও লোকমুখে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর সারেন্ডারের খবর ঘোষিত হয়ে গিয়েছিলো। মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর সারেন্ডার-ফিভার অনুভূত হয়েছিলো।

জেনারেল ওসমানীর অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী সদর দফতরের কর্মকর্তারা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। বলতেন, কি পিআরও সাহেব প্রতিদিন ইস্টার্ন কমান্ডে যান অথচ পাকিস্তানীদের সারেন্ডারের কোনো খবর আনতে পারেন না।

তাঁদের কাছে আমি বেয়াকুব বনে গিয়েছিলাম।

এদিকে মুজিবনগরে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে? পাকিস্তানী সৈন্যরা কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? তাদেরকে কোথায় রাখা হবে? বাংলাদেশ সরকার তো মুজিবনগরেই বসে রয়েছে। মুক্তিবাহিনীর কর্মকর্তারাও মুজিবনগরে। তাহলে পাকিস্তানী বাহিনী কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা লোকের মুখে মুখে ফিরছে। মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে আগত বাঙালিরা খবর জানতে চাচ্ছে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিবর্গ কবে, কোনদিন ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন? এ প্রশ্নের জবাবও কেউ দিতে পারছে না। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে কলকাতায় অবস্থানরত বিশিষ্ট বাঙালিদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। স্বাধীনতা-সমর্থক বাঙালি ব্যবসায়ী, মাঝারি স্তরের রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের আনাগোনা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। লোকে গমগম করছে আট নম্বর থিয়েটার রোড। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা দেশে ফিরে নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্ধারণের জন্যে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি কি ভূমিকা রেখেছে, কার কার বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে ইত্যাদি নিয়ে দেন-দরবার শুরু হয়ে গেছে মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের কাছে। ঢাকায় গিয়ে দলের মধ্যে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ ও সুদৃঢ় করার এবং পাকিস্তানী ও তাদের সহযোগীদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ঢাকায়

সরকারি দফতরে সরকারি কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে অফুরন্ত প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এ সব দেন-দরবার, তদবির, পরস্পরবিরোধী প্রস্তাব-পরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মহা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জেনারেল ওসমানী মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে থাকতেন না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মর্যাদা, ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই প্রতিযোগিতার সকল ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে কোনো ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত কিংবা সায় না পেয়ে তদবিরবাজ লোকজন কখনো কখনো ভিড় করেছে গিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কিংবা অর্থমন্ত্রী মনসুর আলীর কাছে।

কেউ কেউ আট নম্বর থিয়েটার রোডে এসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছেন মন্ত্রিসভার নেতৃবৃন্দ যেদিন ঢাকায় যান সেদিন যেন তাঁকে বিমানে করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে দেন-দরবার করে বের হয়ে এসে কোনো কোনো নেতা বাইরে লোকজনের কাছে পরম তৃপ্তিভরে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাঁকে ধরে বসেছেন যেন ঢাকায় যাওয়ার দিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যান। এসব বলে বলে কেউ নিজের গুরুত্ব বাড়িয়েছে আর বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্যে। একই ধরনের আবদার নিয়ে দেন-দরবার হয়েছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কিংবা অর্থমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসায়।

ওখান থেকে বের হয়ে আট নম্বর থিয়েটার রোডে এসে কেউ কেউ অযাচিতভাবে নিজেই বলেছেন যে, অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁকে খবর দিয়ে বাসায় নিয়ে অনুরোধ করেছেন, যেন তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঢাকায় যান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি চাচ্ছিলেন আগেই ঢাকায় গিয়ে নেতৃবৃন্দের বীরোচিত সংবর্ধনার আয়োজন করতে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁকে পিঠে হাত দিয়ে বলেছেন, যেন তিনি আগেই ঢাকায় না যান। যেন তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে যান। তাই তাঁকে কলকাতায় থেকে যেতেই হচ্ছে।

কেউ কেউ এ সময় জেনারেল ওসমানীর কক্ষে ঢুকে জেনারেল সাহেবকে লম্বা সালাম ও বড় মাপের কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে বলেছেন, স্যার আপনি না হলে দেশ স্বাধীন হতো না। আপনার ঋণ স্যার জাতি কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবে না। এরপর নিজের ইচ্ছেটা তুলে ধরে বলেছেন যেন ঢাকায় যাওয়ার সময় তাঁকে সঙ্গে করে নেয়া হয়। কলকাতায় প্রবাসী আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের মাঝারি পর্যায়ের কোনো নেতা-কর্মী আমার মতো অতি সাধারণ লোকের কাছে এসেও অনুরোধ রেখেছেন জেনারেল ওসমানী সাহেবের সঙ্গে যাঁরা ঢাকা যাবেন তাঁদের তালিকায় যেন তাঁর নামটি আমি ঢুকিয়ে দিই।

ঢাকা ও বাংলাদেশের কোনো কোনো উঁচু স্তরের লোক যাদেরকে কোনোদিন মুজিবনগর তথা কলকাতায় দেখা যায়নি, বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের পতনের পর এ ধরনের বহু লোক মুজিবনগর তথা কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নয় মাস বাংলাদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে বেঁচে রয়েছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন সেই ইতিহাস তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার হিমালয়। সবার কথাই চোখমুখ বন্ধ করে কেবল শুনেছেন। তাঁর কক্ষ থেকে সবাই খুশিতে টগবগ হয়ে বের হয়েছেন।

ঢাকা ও বাংলাদেশের পরিচিত এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকায় কিংবা বিদেশে থেকেছেন, কোনোদিন কলকাতায় আসেননি, তাঁরা ঢাকায় পাকিস্তানীদের পতনের পরপর আর কালক্ষেপণ না করে কলকাতায় ছুটে এসে প্রথম সুযোগেই মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে পরম তৃপ্ত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে বের হলে আমরা কয়েকজন তাঁদেরকে ঘিরে ধরে জানতে চাইতাম কবে সরকার ঢাকায় যাবেন এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা? নিজের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তাঁরা ক্ষেত্রভেদে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিংবা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নাম উল্লেখ করে বলতেন, অমুক ভাইয়ের নির্দেশে নিজের জান কবুল করে নয় মাস বাংলাদেশে থাকতে হয়েছে। কিংবা এদের কেউ বলেছেন, গাজী ভাইয়ের নির্দেশে জীবনকে বাজি রেখে ঢাকায় লুকিয়ে থেকে বঙ্গবন্ধুর আটক পরিবারবর্গের প্রতি গোপনে নজর রাখতে হয়েছে। গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে থাকা-খাওয়া কিংবা অস্ত্রশস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। গোপনে খবরাখবর চালাচালি করতে হয়েছে। ঢাকায় পাকিস্তানীদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ভাই মেসেজ পাঠিয়েছেন, সত্বর কলকাতায় আসার জন্যে। বহু কষ্ট করে কলকাতায় এলাম। এখন ধরে বসেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেতে হবে ঢাকায়! সৈয়দ নজরুল ভাই, মোশতাক ভাই, সবাই ধরেছেন যেন তাঁদের সঙ্গে ঢাকায় যাই। এখন আর কি করি। নেতাদের নির্দেশ তো মানতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লবি এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আনাগোনায় সরগরম হয়ে উঠেছিলো। কলকাতায় অবস্থানরত বাঙালিরা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লবিতে ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখে এদের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিত। এতে মাঝে মাঝে যে আমাদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়নি তা নয়। মোটকথা, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লবিতে যাঁরা বলে বেড়াতেন যে, মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একই বিমানে স্বাধীন বাংলাদেশে যাওয়ার সম্মানিত সরকারি মেহমানের তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা হিসেবে করে দেখা গেছে, একটি বিমানে এত সব লোক ধরবে না। এসব স্বঘোষিত সরকারি মেহমানদেরকে কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পুণ্যভূমিতে নিয়ে যেতে হলে মুজিবনগর সরকারকে কমপক্ষে দু'চারটি বিমান চার্টার্ড করতে হবে। এবং এসব বিমান চার্টার্ড করার জন্যে কপর্দকশূন্য মুজিবনগর সরকারকে

ইন্দিরা সরকারের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইতে হবে। দিল্লীর কাছে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ঋণের অংক আরো স্ফীত হবে।

মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একই বিমানে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে শুভ পদার্পণের জন্যে সরকারিভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন—এসব কথা এখানে-সেখানে কারণে-অকারণে বলে কিছু সংখ্যক লোক নিজের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে চমক সৃষ্টি করতো। নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করতো। আমাদের মতো চুনোপুঁটিরা এতে প্রধানমন্ত্রী ও মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দের উপর খুব বিরক্তবোধ করতাম এ ধরনের লোকদের প্রশ্রয় দেয়ার জন্যে।

এদের কেউ কেউ তৎকালীন ছাত্রনেতাদের খুব তোয়াজ করতেন এবং তাঁদের জ্ঞানদান করতেন স্বাধীন দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে। এমনকি, পরিত্যক্ত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ বিতরণ করতেন এবং ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারকে প্রভাবিত করার জন্যে চেষ্টা করতেন যেন স্বাধীন বাংলাদেশে পরিত্যক্ত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার জন্যে তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সরকার কাজে লাগান। কলকাতায় প্রবাসী তদানীন্তন শ্রমিক লীগ নেতাদের সঙ্গেও এসব বিজ্ঞ ব্যক্তির যথেষ্ট দহরম মহরম দেখা গেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে নিজেদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও মহান সেবা উৎসর্গ করা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো মুজিবনগরে। আমার মতো আহম্মক দেশপ্রেমিকরা খুশি হতাম দেশের সেবায় এসব বিজ্ঞজনের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়োগের প্রস্তাবে। দেশ সমৃদ্ধ হবে। এসব অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সেবায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে সবল শক্তিশালী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। একথা ভাবতে পরম সুখ অনুভব করতাম। এসব মহান সেবকদের সাধুবাদ জানাতাম।

॥ পঞ্চান্ন ॥

অধিকৃত বাংলাদেশে যুদ্ধে পরাজিত পতিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ অনিবার্য শব্দে এসে ঠেকেছে—এটা ভারতীয় রণকৌশল বিশেষজ্ঞরা দিব্য দেখতে পেয়েছিলেন একাত্তরের ১০ ডিসেম্বরের পর থেকেই।

১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইস্টার্ন কমাণ্ডের জনসংযোগ দফতরের রণকৌশল বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনীর অসহনীয় অবস্থার কথা কল্পনা করে খুব মজা করছিলেন। হেসে হেসে বলেছিলেন, নজরুল! তোমাদের পদ্মা-মেঘনায় এসে পাকিস্তানের ঝিলাম আর সিন্ধু নদীর বড় বড় মাছগুলো বড়শিতে আটকা পড়ে গেছে। এটা আমরা দিব্য দেখতে পাচ্ছি। তোমরা নিশ্চিন্তে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে পারো। তবে তার আগে আমাদের জন্যে কিছু নগদ শিন্নি-মিঠাই খরচ করো। মুক্তি বা শেষ রক্ষার জন্যে তারা কত কসরত করছে তা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। তা বাছাধনরা যাবে কোথায়? বাঙাল মুল্লুকে এখন লড়েছো তো মরেছো।

খুব হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিলেন ঝানু রণবিশেষজ্ঞরা। নিজেরাই বলাবলি করছিলেন, বড়শিতে আটকা পড়েছে বাছাধনরা। এখন দেখি কতক্ষণ সুতা টেনে নড়চড় করতে পারো। ফসকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বড়শির সুতা টেনেটুনে একটু ক্লান্ত হয়ে নাও তারপর জেনারেল মানেকশ জাল দিয়ে তোমাদের ছেঁকে তুলবেন।

খুব মজা করছিলেন যুদ্ধে সাফল্যের গৌরবে গর্বিত মিত্রবাহিনীর রণবিশেষজ্ঞরা। মনে হয় যেন তাঁরাই ইস্টার্ন কমান্ডে বসে বসে সুতা টেনে বাংলাদেশের মাটিতে পুতুল নাচিয়ে বিজয়ের এই মহা সাফল্য এনেছেন। মনে হয়েছিলো ঢাকায় পাকিস্তানী পরাজিত বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী যেন বন্দী অবস্থায় ইস্টার্ন কমান্ডে ওই ভারতীয় রণবিশেষজ্ঞদের সামনেই বসা। নিয়াজীর উদ্দেশ্যে রসিয়ে রসিয়ে বললেন, আরে বেটা তামাশা করছো কেন? ওসব করে কোনো লাভ হবে না। চট করে ভালো ছেলের মতো বলে ফেল সারেন্ডার করলাম। ব্যস হয়ে গেল। এই ছোট্ট একটা কথা বলতে এত বাহানা করছো কেন? তোমাদের যা তাকত ছিল তা তো তোমরা নয় মাস করেছোই। এবার বাঙালিদের পালা। ওদের দেশ ছেড়ে দাও। ওদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি ছেড়ে দাও। তোমরা তোমাদের দেশে আপনা ঘর মে চলে যাও। তোমাদের মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন তোমাদের জন্যে কাঁদছে।

কর্নেল রিখী বললেন, জেনারেল সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্যে অপেক্ষা না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এখন হয়তো ওয়েলউইশারদের সঙ্গে একটু মত বিনিময় করে নিচ্ছেন। আগামী পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যেই খবর পাওয়া যাবে।

পরদিন অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর সকালেই খবর এসেছে দিল্লীতে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছে। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে জেনারেল নিয়াজী একথা দিল্লীকে জানিয়ে দিয়েছেন। কলকাতা আট নম্বর থিয়েটার রোডে মহা উল্লাস। মহা হৈচৈ-রৈরৈ ব্যাপার। হাসপাতালে সফল অপারেশনের মাধ্যেমে সুস্থ-সবল পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর মতো সুস্থিরতা বোধ মাত্র।

মুজিবনগরে আমাদের সমরনায়করা বললেন, এটা একজিকিউট হতে সময় লাগবে। ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার তৈরি হবে। বহু আন্তর্জাতিক ফরমালিটিজ আছে। জেনারেল মানেকশর স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার যাবেন ঢাকায়। রেডক্রস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নিউট্রাল এজেন্সীর মাধ্যমে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন, কথাবার্তা বলবেন। এরপর ঠিক হবে কবে সারেন্ডার করবে।

ইত্যাদি কথা শুনলাম আমাদের মুজিবনগরের সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের মুখে। তবে ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার শব্দ শুনে আমার মনে খটকা লেগে গেলো, সারেন্ডার করবার আবার ইনস্ট্রুমেন্ট কি? এটা আবার কেমন যন্ত্র বা অস্ত্র? এর আভিধানিক অর্থ নিয়ে আমি মহা বিভ্রান্তিতে পড়লাম। কিন্তু এর সামরিক অর্থ কি একথা জিজ্ঞেস করবো কার কাছে? ভীষণ লজ্জা বোধ করতে লাগলাম। মনে মনে স্থির করলাম, আমাকে এর অর্থ জানতেই হবে, কিন্তু কার কাছে জিজ্ঞেস করবো? অবশেষে আমাদের সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, বাহার ভাই! শুনতে পেলাম পাকিস্তানী বাহিনী সারেন্ডার করতে রাজি হয়েছে। এখন বিলম্ব হবে ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার তৈরি নিয়ে। ইনস্ট্রুমেন্টটা কি?

তিনি হেসে দিয়ে বললেন, ইনস্ট্রুমেন্ট বুঝলেন না? এটা একটি লিখিত দলিল, যে দলিল বলে ওরা সারেণ্ডার করবে। এতে আত্মসমর্পণের শর্তাদি এবং অঙ্গীকার লিখা থাকবে। এটাকে চুক্তিনামাও বলা যায়। সামরিক ভাষায় চুক্তি বা অঙ্গীকারনামাকে ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। এটা কোনো যন্ত্র নয়।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি আরও কিছু কথা বললেন। বললেন, এই ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করবে বিজয়ী কর্তৃপক্ষ—অর্থাৎ আমাদের মিত্রবাহিনীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ। তবে যুদ্ধে পরাজিতদের কোনো শর্ত এ ধরনের চুক্তিপত্রে থাকে না। কিংবা বিজয়ীপক্ষ গ্রহণ করে না। বিজয়ী পক্ষ নিজেই সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী পরাজিত আত্মসমর্পণকারী বাহিনীকে আত্মসমর্পণের পর আহার, নিরাপত্তা এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। তবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ভারতের কাছে খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের মাটিতে বিশাল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কারণে পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়ার সুযোগ পেলো ভারত।

জানতে চাইলাম কি রকম সুযোগ-সুবিধা? বাহার সাহেব বললেন, যেমন—কাশ্মীর বিরোধসহ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বহু সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। এ ছাড়া—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের নানা রকম স্বার্থ রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিভিন্ন সময় ভারতীয় স্বার্থের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। এসব বিষয়ে পাকিস্তান এখন ভারতের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হবে তার বন্দী ও সশস্ত্র বাহিনীকে ভারতের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী মোটামুটি একটি সুসংগঠিত, সুদক্ষ ও সাহসী সেনাবাহিনী বলে বিশ্বের সামরিক জগতে সুনাম ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলো। বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় বাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সুদক্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এতদিনের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। চিরশত্রু ভারতের কাছে পরাজয় এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের লজ্জা ও গ্লানি নিয়ে পাকিস্তানকে চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মনোবল চিরদিনের জন্যে সংশয়াপন্ন হয়ে থাকবে। পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত এবং আত্মসমর্পণ করেছে, এটা যুদ্ধের ইতিহাসেও একটি গ্লানিকর অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আমি বললাম, ইনস্ট্রুমেন্ট অব সারেন্ডার তৈরিতে আমাদের মুক্তিবাহিনীর কোনো ভূমিকা থাকবে না?

মেজর বাহার বললেন, আমাদের মুক্তিবাহিনীকে রিপ্রেজেন্ট করেন আমাদের সরকার। যা কিছু ভূমিকা রাখার আমাদের সরকারই রাখবেন।

পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে, এ খবরে মুজিবনগর তথা গোটা কলকাতা মহানগরীতে তোলপাড় হচ্ছিলো। জেনারেল মানেকশর ম্যাসেঞ্জার হয়ে কে ঢাকা যাচ্ছেন? এতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কোনো প্রতিনিধি থাকবেন কিনা, এধরনের হাজারো প্রশ্ন উঠেছিলো। মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকার সুবাদে এ ধরনের প্রশ্নবাণে আমাকেই বেশি জর্জরিত হতে হয়েছে। অথচ এ সব উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারণমূলক সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া থেকে আমার অবস্থান ছিল বহু

দূরে। এ সব ব্যাপারে মিত্রবাহিনী ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতো দিল্লীতে। কলকাতা তথা মুজিবনগরে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হলে অন্তত আশপাশ থেকে কিছু আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব ছিল। তাই আমিও একজন সাধারণ মানুষের মতোই এসব বিষয়ে বলতে গেলে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। এখন যা ঘোষণা বা প্রচার করা হয় তা সবই এক কেন্দ্র থেকে, অর্থাৎ দিল্লী থেকে। মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ এখন আরো চুপ হয়ে গেছেন। তাঁরা এখন দেশে ফেরার এবং দেশে গিয়ে কিভাবে প্রশাসন খাড়া করবেন এসব চিন্তায় বিভোর। বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় এ চিন্তা তাঁদের মাথায় তোলপাড় খাচ্ছিলো। তবে ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সূত্রে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী বঙ্গবন্ধুর পরিবারবর্গ সম্পর্কে মুজিবনগর সরকার খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁরা বেঁচে আছেন। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হিংস্র পাকিস্তানী বাহিনী বন্দীশিবিরে বঙ্গবন্ধুর পরিবারবর্গকে শেষ মুহূর্তে হত্যা করতে পারে। দক্ষ ভারতীয় বাহিনী এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল।

এদিকে জেনারেল মানেকশর প্রতিনিধি ঢাকায় গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিষয় পাকাপোক্ত করে দিল্লী ফিরে গেছেন। ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সকল সদস্য একযোগে আত্মসমর্পণ করবে। আত্মসমর্পণ হবে নিঃশর্ত। পাকিস্তানীর সেনাবাহিনীর সহযোগীরাও আত্মসমর্পণ করবে।

ভারতীয় বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ পরিবেশ তৈরি ও আয়োজন নিয়ে মহাব্যস্ত। ভারতীয় বাহিনী এখন সব রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অবস্থান করছে। কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র যাতে আত্মসমর্পণ বানচাল করতে না পারে, সে ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীসহ ভারতীয় কূটনীতিকরা নিশ্ছিদ্র সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন। ভারতীয় কূটনীতিকরা কূটনৈতিক নিরাপত্তা-জাল বিস্তার করে রেখেছেন।

॥ ছাপ্পান্ন ॥

ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে, এ খবর কলকাতা আট নম্বর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে এসে গিয়েছিলো। সে সময় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিরা কিলবিল করছে। সবার পরনে এখন ভালো ও সাফ জামা-কাপড়। বাঙালিরা গরীব নয়, নিঃস্ব নয়, যেন কলকাতার বাঙালিদের এটাই বোঝাবার জন্যে কাপড়-চোপড় ও বেশভূষায় এমন চাকচিক্য ও চমক সৃষ্টির প্রয়াস। মনে হয় ছোট ছেলেমেয়েদের মতো এতদিন এ পোশাকগুলো অতি সযতনে রেখে দেয়া হয়েছিলো সামনে আগত একটি উৎসব উপলক্ষে পরার জন্যে। আট নম্বর থিয়েটার রোডে বিচরণরত পরিবর্তিত চেহারার এপার বাংলার লোকজন এখন আর আস্তে কথা বলছে না। জোরে জোরে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছে। চাপা কণ্ঠ কিংবা কণ্ঠের অস্পষ্টতা, জড়তা আর নেই। মুখে ও চেহারায় হতাশা আর পলায়নী

ভাব আর নেই। বরং কলকাতায় আশ্রিত বাঙালি কলকাতার কোনো বাঙালি দেখলে আগেই বড় গলায় আদাব-সালাম কিংবা স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত বলতেন—দাদা, বহু কষ্ট দিয়েছি। দু' একদিনের মধ্যে দেশে, মানে ঢাকা চলে যাচ্ছি। কতভাবে কত জ্বালাতন করেছি। কিছু মনে রাখবেন না। আশীর্বাদ করবেন। সময় পেলে একবার আমাদের মাটিটা পাড়িয়ে আসবেন গিয়ে। দাদা ঢাকায় এলে বড় খুশি হবো।

ওপার বাংলার বাঙালিকে প্রত্যুত্তর করার কোনো অবকাশই না দিয়ে বরং তাকে থমকে দিয়ে এক নিশ্বাসে সব কথা বলে ফেলেছে এপার বাংলার তেজোদ্দীপ্ত ও গর্বিত লোকজন। ভাবটা এখন এমন, যেন কলকাতায় তারা অসহায় হয়ে যায়নি। কিংবা আশ্রয়ের জন্যে যায়নি। যেন বেড়াতে গিয়েছে, যেন সামনে কোনো উৎসব উপলক্ষে সামান্য কিছু কেনাকাটার জন্যে কলকাতায় গিয়েছে। আর ওপার বাংলার বাঙালিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। আরে বলে কি কলকাতায় আশ্রিত ঢাকার বাঙালিরা? ঢাকা, মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলো? তোমরা স্বাধীন হয়ে গেছো? বাহ, চমৎকার! তোমরা শান্তিতে থাকো, ভালো থাকো।

প্রভাতসূর্যের প্রথম আলোকচ্ছটার মতো মুখে এক ঝলক মিষ্টি হাসি দিয়ে পরক্ষণেই ওপার বাংলার বাঙালির সে হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। তোমরা স্বাধীন হয়ে গেছো, তোমরা স্বাধীন হয়ে গেছো; তোমরা আজ মুক্ত। তোমরা আর পরাধীন নও। ভাবতে কত সুখ, কত শান্তি—এ কথাগুলো অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করতে করতে এক সময় কলকাতার বাঙালির কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, অস্পষ্ট থেকে আরো অস্পষ্টতর এবং শেষে কণ্ঠ থেমে গেছে লক্ষ্য করেছি।

আট নম্বর থিয়েটার রোড, মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে মহা ধুমধাম। যেন পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ ওখানেই হবে! তারপরই প্রশ্ন—কখন, কোথায়, কার কাছে পাকিস্তানী হানাদাররা সারেন্ডার করবে? আমাদের এখান থেকে কে ঢাকা যাচ্ছেন সারেন্ডার করাতে—ইত্যাদি প্রশ্নে কন্টকিত আট নম্বর থিয়েটার রোড।

আমাদের অফিস ভবনের রোডের ব্যারাকের একটি রুমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার একজন সেনা-কর্মকর্তা আমাদের কয়েকজন সেনা-অফিসারের সঙ্গে গল্পচ্ছলে বলছেন, ঢাকা থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দিল্লীতে প্রপোজাল এসে গেছে। এতে কিছু শর্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ কন্সালের মাধ্যমে এসব প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

তাদের গল্পস্থানের অদূরে নীরবে দাঁড়িয়ে শোনা প্রস্তাবগুলোর সারমর্ম যতদূর মনে পড়ছে তা হচ্ছে, যুদ্ধবিরতির পর ঢাকায় পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী, তাদের সহযোগী আধা-সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা, মুক্তিবাহিনীর প্রতিশোধ প্রবণতা ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের শিকার হওয়া থেকে পাকিস্তান সমর্থক বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা, আহতদের চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব নাকি ঢাকা থেকে দিল্লীতে জেনারেল শ্যামের (জেনারেল শ্যাম মানেকশ) কাছে এসে গেছে।

মিত্রবাহিনীর ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার একটু রসিকতার সঙ্গে বললেন, আমাদের শ্যাম সাপুড়ে যে বাঁশী বাজাচ্ছেন তাতে কিছু কাজ হচ্ছে। পাকিস্তানী বিষাক্ত সাপগুলো বের হয়ে আসছে। তবে তারা সিকিউরিটি চাচ্ছে। কিন্তু জেনারেল শ্যাম এতে সেটিসফাইড নন, শ্যাম চাচ্ছেন কমপ্লিট সারেন্ডার।

তিনি আরো জানালেন যে, ভারতীয় বাহিনীর মিস্টার নাগরা নামক একজন মেজর জেনারেলকে ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে আলোচনা করে সারেন্ডারের বিষয় ঠিক করার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দুর্ধর্ষ জেনারেল নাগরা সে সময় নাকি টাঙ্গাইলের দিক থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়ার পর মুজিবনগর সরকারের দফতরে লোকজনের মুখে জজবা হয়ে উঠেছিলো—কে যাবেন ঢাকায়, কার কাছে পাকিস্তানীরা সারেন্ডার করবে?

এ সম্পর্কে এ সময় মন্ত্রিসভা কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেনারেল ওসমানীর কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক হতে দেখিনি।

মুক্তিযুদ্ধের এই শেষ দিনগুলোর সময় জেনারেল ওসমানীর এডিসি ছিলেন বঙ্গবন্ধু তনয় শেখ কামাল। এতো ভেতরের খবর রাখার মতো অবকাশ তাঁর ছিল না। এরই মধ্যে একদিন নাকি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জেনারেল ওসমানীকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন তাঁর সঙ্গে। অন্য কেউ কাছে ছিল না। তবে সরকারের বাইরের লোকজন ঘোরাফেরা করছিলো প্রধানমন্ত্রীর দফতরের লবিতে। এ সময় নয়াদিল্লী থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চাঞ্চল্যকর নতুন নতুন খবর আসছিলো কলকাতায়। এর মধ্যে কিছু যে গুজবও ছিল না, তা নয়।

পরিবেশ পরিস্থিতিটা সে সময় এমনই ছিল যে, গুজবও যেন সত্যি খবর বলে মনে হতো। অনেকে সুবিধা মতো মনগড়া খবর ছেড়ে দিয়ে নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার মতলব আঁটতেন। এমন দৃঢ়তায় এসব ব্যক্তি খবর বলতেন, যেন তিনি ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত ছিলেন, কিংবা দিল্লী ও বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ নেতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের কলকাতাস্থ কার্যালয়ের ব্যারাকে বসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের একজন লিয়াজোঁ অফিসার বলছেন, দিল্লীতে সারেন্ডারের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের দফতরের আশপাশ এলাকায় কোন কোনো বাঙালি নেতার মুখে খবর সারেন্ডার-সুরেন্ডার কিছুই নয়। এটা পাকিস্তানীদের একটি কৌশল মাত্র। ওরা এখন একটা বিপদে পড়ে সারেন্ডারের ভান করছে, যুদ্ধ থামাবার কৌশল আঁটছে। চীন থেকে সৈন্য আসবে। চীনের সৈন্য না আসা পর্যন্ত নানা কলাকৌশল ও ছলেবলে যুদ্ধ থামিয়ে রাখবে পাকিস্তান। এর মধ্যে তারা আরো পুনর্গঠিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। গোলা-বারুদ, রসদ জোগাড় করছে।

বাংলাদেশের এমন কিছু লোক মুক্তিযুদ্ধের এই শেষলগ্নে কলকাতায় গিয়ে এমন কথাও বলেছেন যে, তিনি সদ্য ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছেন। তিনি জেনে এসেছেন পাকিস্তানী বাহিনী সারেন্ডার করবে না। তারা নতুন নতুন কৌশল ও বুদ্ধি-

ফন্দি আঁটছে। ঢাকায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, দু'এক দিনের মধ্যে চীনের সৈন্য নামবে পাকিস্তানী সৈন্যদের পক্ষে।

পাকিস্তানীদের পতনের মুখে ঢাকায় মানুষের মনোবল জোরদার ও যে উৎসাহ প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিলো, চীনা সৈন্য আগমনের খবর বিজয়ের আনন্দঘন মুহূর্তটিকে চরম হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলো। পাকিস্তানীদের সৃষ্ট নারকীয় অবস্থা থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভের ও স্বস্তির নিশ্বাস্ ফেলার জন্যে অবরুদ্ধ মানুষ যখন প্রহর গুণছিল, সে মুহূর্তে এ ধরনের খবর যেন তাদের জন্যে মৃত্যুর ঘণ্টা হিসেবে নতুন করে বেজে উঠেছিলো। দীর্ঘ নয়টি মাস যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বুকে চেপে ধরে রেখেছিলো, চীনা সৈন্য আগমনের খবরে সেই আশা ও স্বপ্ন যেন চোখের সামনে থেকে অপসৃয়মান হয়ে গিয়েছিলো। ঢাকায় স্বাধীনতার সূর্য ওঠার রক্তিম আকাশটা যেন আবার ঘন কালো মেঘের আবছায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এসব খবরই আমরা শুনছিলাম কলকাতায় বসে পাকিস্তানীদের পতনের মুহূর্তে।

॥ সাতান্ন ॥

ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে কে উপস্থিত থাকবেন—এ নিয়ে যখন নানা গুজব ও কানাঘুষা চলছিলো, সে সময় জেনারেল ওসমানী কলকাতায় অনুপস্থিত। তিনি কোথায় গেছেন বা কোথায় ছিলেন, তাও কেউ ভালো করে জানে না। এমনকি, আমিও জানতাম না যে জেনারেল সাহেব তাঁর সদর দফতরে নেই। তাঁর দফতরের কোনো সামরিক কর্মকর্তাও এ সম্পর্কে মুখ খুলছেন না, সবাই রহস্যজনকভাবে না জানার ভান করছেন। কিছু বলতে চাচ্ছেন না। এটা নিয়েও গুজবের অন্ত ছিল না।

কোনো কোনো বিষয়ে জেনারেল ওসমানীর একগুঁয়েমি সম্পর্কে তাঁর পরিচিতজনদের অবগতি ছিল। মুক্তিযুদ্ধের এমন এক ক্রান্তিলগ্নে মুজিবনগর থেকে তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান বিভিন্ন মহলে অনেক গুজব ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিলো। ভালো লেখাপড়া জানা এই লোকদের কেউ কেউ বললেন, ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়া "হ্যামলেট" নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছাড়া ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী সারেন্ডার হবে কেমন করে? কার কাছে পাকিস্তানী বাহিনী সারেন্ডার করবে? বাঙালি সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর (সে সময় ওসমানী সাহেবের সামরিক পদমর্যাদা ছিল কর্নেল) কাছেই সারেন্ডার করতে হবে। মার্শাল রেস বলে দম্ভকারী পাকিস্তানী সেনাপতি ও সৈনিকদেরকে বাঙালি সেনাপতি ও সৈনিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে তাদের মার্শাল রেসের দম্ভ ও অহংকার গুঁড়িয়ে দিতে হবে। পাকিস্তান সরকার এই সুযোগ্য বাঙালি সেনা অফিসারকে প্রমোশন না দিয়ে সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর প্রদান করেছিলো। তাই পাকিস্তানী জেনারেলদের আজ এই বাঙালি কর্নেলের কাছেই সারেন্ডার করতে হবে। জোরালো দাবি।

আবেগপ্রবণ লোকগুলো এ দাবিতে আরো আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। বোধহয় এ সময় জেনারেল ওসমানী সাহেবকে সামনে পেলে তারা তখনই তাঁকে নিয়ে মিছিল

করতো আর স্লোগান দিতো—ওসমানীর কাছে পকিস্তানী বাহিনীকে সারেন্ডার করতে হবে, ওসমানী ছাড়া সারেন্ডার মানি না, মানবো না।

উচ্ছ্বাসে আপ্লুত লোকজনের হাবভাব দেখে আমি রীতিমত ভীত হয় পড়েছিলাম এই ভেবে যে, না জানি ওরা মিছিল করে স্লোগান দিয়ে বসে আট নম্বর থিয়েটার রোডে। আমাদের সেনা-অফিসাররাও লোকজনের মারমুখী আচরণে কিছুটা বিরক্তবোধ করেছিলেন।

লোকজনের আচার-আচরণ কেবলমাত্র আবেগ-উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সীমিত থাকলে ভালো হতো। কিন্তু এখানে-সেখানে জটলা পাকিয়ে যেসব গুজব ও মনগড়া কাহিনী তারা ছড়াচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের এই শেষলগ্নে এসব বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ছিল খুবই ক্ষতিকর ও আত্মঘাতী। বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী-একটি প্রচারণা ছিল নিম্নরূপঃ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জেনারেল ওসমানী সাফ সাফ বলে দিয়েছেন যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ওসমানী সাহেব নিজে ঢাকায় গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করাবেন। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী এতে রাজী হচ্ছে না। ভারতীয় বাহিনী চাচ্ছে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন' ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে নাখোশ করতে চান না। প্রধানমন্ত্রী কোনো পক্ষকেই মানাতে পারছেন না। এখানে কার জিত থাকবে এ নিয়ে টানাটানি চলছে। এ অবস্থা দেখে জেনারেল ওসমানী রাগ করে কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন তা কেউ বলতে পারে না।

আবার অন্য এক গ্রুপের প্রচারণা ঘটনা এটা নয়। আসল ঘটনা এর বিপরীত। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব জেনারেল ওসমানী সাহেবকে ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর সারেন্ডার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন। জেনারেল ওসমানী এতে রাজি হননি। কারণ সেখানে ভারতীয় বাহিনী থেকে কে যাবেন তা এখনো স্থির হয়নি।

ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ ঢাকায় গেলে সামরিক পদমর্যাদার ক্ষেত্রে এত আকাশ-পাতাল ব্যবধান নিয়ে অর্থাৎ কর্নেলের ব্যাজ লাগিয়ে ওসমানী সাহেব জেনারেল শ্যাম মানেকশর সঙ্গে সারেন্ডার অনুষ্ঠানে ঢাকায় যেতে রাজি হচ্ছেন না।

এরপর প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন, তাহলে জেনারেল মানেকশর পরিবর্তে জেনারেল অরোরাকে পাঠাই। তাঁর সঙ্গে ঢাকায় যান।

ওসমানী সাহেব এ প্রস্তাবেও রাজী হননি। কারণ জেনারেল অরোরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি আঞ্চলিক বাহিনীর কমান্ডার বা অধিনায়ক মাত্র। আর ওসমানী সাহেব হচ্ছেন একটি দেশের পুরো সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। মর্যাদার দিক থেকে ওসমানী সাহেব ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশর সমপর্যায়ের। ওসমানী সাহেব ভারতীয় বাহিনীর একটি আঞ্চলিক কমাণ্ডের অধিনায়কের বাদী হতে পারেন না। সারেণ্ডার অনুষ্ঠান শেষ হলে ওসমানী সাহেব কলকাতায় ফিরবেন। এটা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।

তৃতীয় গ্রুপের খবর ঢাকা হচ্ছে ওসমানী সাহেবের বাড়ি। জেনারেল মানেকশই হোক আর জেনারেল অরোরাই হোক, ওসমানী সাহেব তাঁদেরকে ঢাকা নিয়ে গিয়ে

বসাবেন কোথায় এবং সাদর সমাদরই করবেন কোথায়? ঢাকায় এসব মেহমানদেরকে নিয়ে গিয়ে যদি সম্মান-সমাদর না করতে পারেন তাহলে ওসমানী সাহেবের কোনো ইজ্জতই থাকবে না ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধানদের কাছে। কিন্তু ঢাকার যে অবস্থা তাতে তো ওসমানী সাহেবেরই ঢাকায় গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই—তাঁদেরকে সমাদর করবেন কিভাবে? এসব ভেবেই ওসমানী ঢাকায় সারেন্ডার অনুষ্ঠানে যেতে চাচ্ছেন না। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কথা না রেখেও পারবেন না। তাই নিজেই গা-ঢাকা দিয়েছেন কিছু সময়ের জন্যে।

এ ধরনের কাল্পনিক ও মনগড়া পরস্পরবিরোধী কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে কলকাতা নগরীর এখানে সেখানে মুজিবনগরী বাঙালিদের আড্ডাখানাগুলোতে। এসব প্রচারণার পরিণামের কথা না ভেবে কিছু লোক মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে এমন সব খবর প্রচার করে, নিজে সব কিছুই জানে এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলে নিজের গুরুত্ব সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা মুজিবনগর সরকারের সদর দফতর, এমনকি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ইষ্টার্ন হেডকোয়ার্টার ফোর্ট উইলিয়াম এলাকায় সদাবিচরণ করা সত্ত্বেও এ ধরনের কোনো খবর ঘুণাক্ষরেও পাই না, আর কলকাতায় আশ্রিত ঢাকার এসব সবজান্তা শমসেরাগণ কোথায় পেলেন এমন সব খবর? এসব খবর না জানার কারণে মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজের কাছে কখনো অবিশ্বস্ত মনে হয়েছে, কখনো নিজের এই অযোগ্যতার কারণে লজ্জাবোধ করেছি।

মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে, বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পিআরও হয়েও এ খবর না জানার জন্যে পিআরও হিসেবে আমার যোগ্যতা নিয়েও যে প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়।

মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের ওসি, সাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ মেজর, জেনারেল ওসমানীর বিশ্বস্ত বন্ধু মেজর এম. আর. চৌধুরী সাহেব একদিন আমাকে সিলেটি ভাষায় বললেন, কি পিআরও সাহেব, বাইরে লোকজন এসব খিতা বলে বেড়াইতেছে। আপনি খিছু হুনছ না?

ভদ্রলোক একজন খিটখিটে মেজাজের লোক বলে তাঁকেও এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য দেয়া ঠিক হবে না। আমি বললাম, স্যার (জেনারেল) কলকাতায় নেই, কোথায় গেছেন, কখন বা কোনদিন ফিরে আসবেন এ খবর গোপন থাকার সুযোগে এসব গুজব রটনা করা হচ্ছে।

উপস্থিত কোনো একজন সামরিক ব্যক্তি বললেন, যুদ্ধের সময় কত অপপ্রচার করা হয়। এটা তো কিছুই নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস কি কম গুজব ছেড়েছিলো নাকি? এক এক সময় এক একটা গুজবে মানুষের মাথা ঘুরপাক খেতো।

মেজর চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা তা নয়। এধরনের কথাবার্তায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্যে বলছি।

এসব কথার ফাঁক দিয়ে তিনি বলে ফেললেন যে, জেনারেল ওসমানী কোনো অভিমান বা রাগ করেননি। সিলেট মুক্ত হয়েছে। তানী এখন সিলেট গেছুন। আগরতলা হয়ে সিলেট যাবেন।

আমার মনের সব বিভ্রান্তি ও খটকার অবসান হলো এতক্ষণে। সহজ কথায় জেনারেল ওসমানী আগরতলা গেছেন। সেখানে থেকে তিনি তাঁর নিজ জেলা সিলেট সফর করবেন। সিলেট সম্পর্কে নিজে খোঁজ-খবর নেবেন। আর এটা নিয়েই কিসব গুজবের ঘুড়ি উড়ানো হলো কলকাতার আকাশে। কত সব রহস্যকাহিনী বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো!

॥ আটান্ন ॥

এ সময় ঢাকা থেকে খুব ভয়ানক দুঃখজনক খবর আসতে লাগলো মুজিবনগরে। ঘাতক পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসর্পণের মুহূর্তে তাদের দোসরদের সহায়তায় ঢাকায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসাবিদ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রকৌশলীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে *ইত্তেফাকের* তৎকালীন নির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে হত্যা করার খবর শুনে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। সিরাজউদ্দিন হোসেনের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি প্রায়ই বলতেন, সিরাজউদ্দিন হোসেনকে মুজিবনগর সরকারের বড় প্রয়োজন ছিল। মুজিবনগরে তাঁকে পাওয়া যায়নি। ঢাকায় গিয়ে তাঁকে পাবেন এ আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। কিন্তু তাঁর হত্যার খবর শুনে তিনি মনে করেছিলেন যেন পাকিস্তানী ঘাতকরা তাঁর একটি বাহু দেহ থেকে ছেদ করে দিয়েছে।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ঢাকায় বাঙালি বুদ্ধিজীবী ম্যাসাকারের খবর পেয়ে পরম আক্ষেপের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, যাঁদের লেখনী ও কর্মকাণ্ডের ফলে একটি জাতি আপন জাতিসত্তার ব্যাপারে আত্মসচেতন হলো, যাঁরা বাঙালিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন, জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালে, স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যারা প্রেরণা যোগালেন, স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার জন্যে যাঁদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, ঘাতকরা তাঁদের হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করতে চাচ্ছে।

বস্তুত ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর মুক্তির ঊষালগ্নে মুজিবনগরের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে বেদনা ও বিষাদের ঘন কালো ছায়া ফেলেছিলো। ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ছিল পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের জন্যে চরম ক্রান্তিকাল। দখলীকৃত বাংলাদেশের সব অঞ্চলে পাকিস্তানী বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ কিংবা মৃত্যুর প্রহর গুণছিলো।

মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ঢাকা মহানগরী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। ঢাকার আকাশে মিত্রবাহিনীর বোমারু বিমানগুলো বিকট গর্জনে উড়ে উড়ে হানাদার বাহিনীর বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে তুলছে। মাঝে মাঝে রেডিওতে ঘোষিত হচ্ছে জেনারেল শ্যাম মানেকশর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের কঠোর নির্দেশ, আত্মসমর্পণ করো, না হয় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করো। আত্মসমর্পণ করলে তোমাদের সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনের ঘোষণা অনুযায়ী ভালো ব্যবহার করা হবে। সমস্ত পরিস্থিতি মিলিয়ে পাকিস্তানীদের জন্যে ঢাকা মহানগরী হয়ে পড়েছিলো এক জ্বলন্ত বয়লার।

ঘনায়মান মহাবিপদের লাল সংকেত অনুধাবন করে ঢাকায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী বিচলিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। একটু নিরাপত্তা, একটু শান্তি ও ভরসার অন্বেষণে তিনি উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতেন ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সালের কাছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের কর্তৃপক্ষের সেক্টর থেকে কোনো বিজয়ের উদ্দীপনাময় খবরই আসেনি। যে খবর পেয়েছে তাতে তাদের একটির পর একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ পতনের দুঃসংবাদ এসেছে। পাকিস্তানের পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধের খবরও তাদের জন্যে সুখবর ও প্রেরণাদায়ক ছিল না। ঢাকার আকাশে ভারতীয় মিগ বিমানগুলোর আকাশ বিদীর্ণ করা আওয়াজ, ঘন ঘন আনাগোনায় ভীত পাকিস্তানী সেনাদের মনোবলের দুর্গ ভেঙে খান খান হয়ে পড়েছিলো। দিকে দিকে কেবল পতন আর পতনের খবর। পশ্চিম রণাঙ্গনেও তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী অগ্রসরমান দুর্ধর্ষ ভারতীয় বাহিনীর প্রচণ্ড হামলা ও আগ্রাসন সামাল দিতে পারছিলো না। এ কারণে পিন্ডি কর্তৃপক্ষ তাঁদের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্ট অর্থাৎ তাঁদের সাধের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাননি। যুদ্ধে নাস্তানাবুদ, পাকিস্তানের চারদিক থেকে পতনের খবর এবং মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সম্মুখভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঢাকার দিকে তাঁদের অধীনস্থ সৈনিকদের পালিয়ে আসতে দেখে হেডকোয়ার্টারে সেক্টর কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী ও তাঁর সহকর্মীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকার আকাশের বুক চিড়ে ভারতীয় মিগ বিমানগুলোর ঘন ঘন আনাগোনায় ঢাকায় অবরুদ্ধ পাকিস্তানী জেনারেলদের বুক প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিলো।

এরই মধ্যে ঢাকা মহানগরীর পাড়া, মহল্লা ও অলিগলিতে মুক্তিযোদ্ধারা এসে অস্ত্রশস্ত্রসহ অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। সমগ্র ঢাকা শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড তৎপরতা আর আকাশে ভারতীয় মিগ বিমানগুলোর আগ্রাসী হুমকিতে দিশেহারা পাকিস্তানী জেনারেল ও তাঁদের সহযোগীদের ঢাকায় তিষ্টে থাকা শুধু অসহনীয় হয়েই ওঠেনি, অসম্ভবের সীমাও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

বিশেষ করে ১২ ডিসেম্বর তদানীন্তন গভর্নর ভবনের (বর্তমান বঙ্গভবন) ভারী মজবুত ছাদ ভারতীয় মিগ বিমানের হামলায় গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানের পা-চাটা পুতুল গভর্নর ডাক্তার এম. এ. মালেক ও পাকিস্তানী বীর জেনারেলদের মন থেকে পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ডুবন্ত জাহাজের কাণ্ডারী গভর্নর ডাক্তার মালেক ও ঢাকায় নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী চীফ সেক্রেটারী মোজাফফর হোসেনসহ বেসামরিক কর্মকর্তারা তাঁদের পাকিস্তানের চাকরিতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে লিখিতভাবে ইস্তফা দিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান হোটেল শেরাটন) আন্তর্জাতিক রেডক্রস স্থাপিত নিরপেক্ষ জোন-এ গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন এবং আশ্রয় নিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি আঁচ করতে পেরে পিন্ডির হেডকোয়ার্টার থেকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমর উপকরণ প্রয়োজনবোধে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে, যাতে এগুলো 'শত্রুর' হাতে না পড়তে পারে।

কলকাতায় ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দফতরের জনসংযোগ বিভাগে নিয়মিত যুদ্ধের দিন থেকেই একটি সামরিক মনিটরিং সেল স্থাপন করা হয়েছিলো। শক্তিশালী এই মনিটরিং সেল ঢাকায় পাকিস্তানীদের অবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করত। এই সেল থেকে প্রতিদিন আমরা ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের শোচনীয় বিপর্যকর অবস্থার খবর পেতাম এবং এই খবরকেই আরও ফলাও করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করে স্বাধীনতাপ্রেমিক বাঙালিদের মনোবলকে চাঙ্গা করে তুলতাম। পাকিস্তানীদের বিপর্যয় ও বিধ্বস্ত হওয়ার খবর শুনে আমরা কলকাতায় চাঙ্গা হয়ে উঠতাম এবং আনন্দিত হতাম স্বাভাবিক কারণেই। পাকিস্তানীদের বিপর্যয়কর অবস্থার কাহিনী আরও রংচং মাখিয়ে প্রচার করে মনে মনে পুলকিত হতাম এবং এতে আনন্দ পেতাম প্রচুর।

ইস্টার্ন কমান্ডের মনিটরিং সেল সূত্রে জেনেছিলাম যে, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের কূটনীতিকরা ঢাকায় পাকিস্তানীদের এই বিপর্যয়কর ও করুণ অবস্থার গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইষ্টার্ন কমান্ডের মনিটরিং সেলকে নিয়মিত ফিড করতেন। সে সময় বিশ্বের সব দেশেই অবস্থানরত ভারতীয় কূটনীতিকদের চোখ-কান খোলা রাখা এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সক্রিয় রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো। সেদিন ভারতীয় কূটনিতিকরাও বাংলাদেশের পক্ষে কূটনীতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলো পাকিস্তানের প্রতি বৈরী হয়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে বিবিসি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে খবর ও প্রতিবেদন রচনা করে তা প্রচার করতো। এরই মধ্যে বিবিসি একদিন খবর প্রচার করলো যে, ঢাকায় পাকিস্তানী সেনা অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী তাঁর বাহিনীকে বিপদে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন। যদিও এটা ছিল একটি আজগুবী খবর তবু সাময়িকভাবে পাকিস্তানীদের মনোবলের উপর খুবই ক্ষতিকর। খবরটি ঢাকায় জেনারেল নিয়াজীকেও তাজ্জব বানিয়েছিল। ঢাকায় তাঁর উপস্থিতিকে প্রমাণ করার জন্যে তাঁকে হোটেল শেরাটনে সশরীরে গিয়ে হাজির হতে হয়েছিলো বিদেশীদের সামনে।

অন্য একদিন ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতরে মনিটরিং সেলে গিয়ে একটি খবর শুনলাম। মনিটরিং সেলের লোকজন জানালেন, তোমাদের জন্যে খুব মজার খবর আছে। খবরটি বের করেছে তোমাদের একজন বাঙালি ওয়েটার। গভর্নর ভবনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন জেনারেল নিয়াজী ও তাঁর পদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা। বাঙালি ওয়েটার চা-কফি ও শুকনো খাবার নিয়ে বৈঠকস্থলে ঢুকেছিলো। সে গিয়ে দেখেছে, জেনারেল নিয়াজী ফুপিয়ে কাঁদছেন। গভর্নর মালেক নিয়াজীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন গায়ে হাত বুলিয়ে। এ সময়ে বৈঠকস্থলে প্রবেশ করার জন্যে গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী এই ওয়েটারকে খুব বড় ধরনের ধমক দিয়েছিলো। বাঙালি ওয়েটার ভীষণ চটে যায়। সে তখন তার সহকর্মীদের কাছে বলে যে, বৈঠকে গভর্নর ও জেনারেলরা জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি করছেন ভেতরে। সামনে ভয়ানক বিপদ তাই কান্নাকাটি। জেনারেল সাহেবরা মুক্তিবাহিনীকে ঠেকাতে পারছেন না। রাওয়ালপিন্ডি থেকে এ জন্যে বড় ঠেলা দেয়া হয়েছে। যাও এবার গিয়ে এটাকে ভালো একটা তাজা খবর বানাও এবং তোমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সারাদিন প্রচারের ব্যবস্থা কর।

আমি আমার কার্যালয়ে গিয়ে এ খবর ছড়িয়ে দিলাম। এটাকে নিয়ে সেখানে হাস্যকৌতূহলের ঝড় উঠলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের এম. আর. আখতার মুকুল সাহেব ঢাকায় পাকিস্তানীদের এই চরম দুর্দশার খবর রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করেন।

সাবেক গভর্নর মোনেম খানকে তাঁর বনানীস্থ বাসভবনে হত্যা এবং গভর্নর ভবনে জেনারেলদের কান্নাকাটি—এ দুটি খবর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভয়ানক প্রেরণা সৃষ্টি এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিলো। কলকাতার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরাও খবরটি লুফে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা এবার গভর্নর ভবনে ঢুকে পড়েছে। কেউ কেউ এমন গল্পও বানিয়ে গুজবের বাজারে ছাড়লেন যে, বাঙালি যে ওয়েটারটি বঙ্গভবনে জেনারেলদের বৈঠকে চা-কফি ও বিস্কুট নিয়ে ঢুকেছিলো, সেও কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা। বেটারা চিনতে পারেনি এখনও বাঙালিদেরকে। বাংলার ছেলেরা সাপ। সাপ যেমন লোহার সিন্দুকে ঢুকে লখিন্দরকে ছোবল মেরেছিলো, বাংলার ওই দুর্ধর্ষ ছেলেও তেমনি বঙ্গভবনে ওয়েটার হয়ে ঢুকে পাকিস্তানীদের আহাজারীর খবর বের করে এনে দিয়ে কেমন মাত করে দিলো!

॥ উনষাট ॥

রজনী যত গভীর হয়, প্রভাত তত এগিয়ে আসে। নিয়তির এই অমোঘ নিয়মের পথ ধরে বাংলার এই কোমল মাটিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর পাষণ্ড পাকিস্তানীদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিভীষিকাময় কালো অমানিশার অবসান হয়ে মুক্তির লাল সূর্য এই দুর্ভাগা বাঙালির ভাগ্যাকাশকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলো। মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত দুর্বার আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত দখলদার বাহিনীর নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। প্রাণভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো তারা। এই কাপরুষেরা এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে ঢাকাস্থ রুশ-মার্কিন ও চীনা দূতাবাসে ধরনা দিতে শুরু করে। অবশেষে ঢাকায় মার্কিন কন্সাল জেনারেলের মাধ্যমে তাঁদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ওয়াশিংটন ঘুরে দিল্লীতে জেনারেল শ্যাম মানেকশর কাছে পৌঁছে ১১ ডিসেম্বর। জেনারেল শ্যাম মানেকশ ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির জবাব পাঠান। জেনারেল মানেকশর জবাবপত্রে ছিল যুদ্ধবিরতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং লিপিতে (পাকিস্তানীদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের চিঠি) উল্লিখিত লোকজনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে—শর্ত এই যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে আমার অগ্রবর্তী সৈনিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতর কলকাতার বেতার তরঙ্গেও এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো—যাতে ঢাকায় পাকিস্তানীদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্যে যোগাযোগ করা যায়। জেনারেল মানেকশর এই বার্তা রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এদিকে পশ্চিম ফ্রন্টেও দুর্ধর্ষ ভারতীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পিন্ডির যুদ্ধউন্মাদ সামরিক জান্তা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধবিরতির জন্যে তাদের ভেতরে আহাজাবী শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এমতাবস্থায় পিন্ডি ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকাকে সবুজ সংকেত দেয় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের ব্যাপারে। পিন্ডির চিঠিতে ঢাকাকে বলা হয়—

শর্তসমূহ যদি আপনাদের প্রয়োজন মেটায় সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের পরামর্শ দেয়া গেলো—ব্যবস্থাটি সম্পন্ন হবে স্থানীয়ভাবে দুই কমান্ডের মধ্যে। তবে জাতিসংঘে যে সমাধান কামনা করা হয়েছে তার সঙ্গে যদি বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এটাকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

পিন্ডির এ ধরনের অস্পষ্ট নির্দেশে ঢাকায় তাদের সেনা অফিসারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো। সদর দফতরে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের এই চিঠির মূল দিকনির্দেশনা নির্ণয় নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

মধ্যসমুদ্রে ডুবন্ত জাহাজের অসহায় নাবিকের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় জেনারেল নিয়াজী বিপদের ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধে নিজেদের অক্ষমতা আঁচ করতে পেরে পিন্ডির এই অস্পষ্ট চিঠিকে পজিটিভ বলে ধরে নিতে বাধ্য হন। অবশেষে স্থির করা হয় যে, ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি পালন করা হবে। যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থাবলী চূড়ান্ত করার জন্যে পরে যুদ্ধবিরতির সময়সীমা ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পিন্ডি থেকে জেনারেল নিয়াজীকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিলো যে, পিন্ডি যুদ্ধবিরতির শর্ত গ্রহণ করেছে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থাপনায় চিঠি পাঠিয়ে দেন যুদ্ধবিরতি পালনের জন্যে।

জেনারেল নিয়াজী তাঁর এক অফিসারকে নির্দেশ দেন পশ্চিম পাকিস্তানী কয়েকজন নার্স ও কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা ত্যাগ করার জন্যে। জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশ মোতবেক একজন পাকিস্তানী অফিসার ১৫ ডিসেম্বর রাতেই হেলিকপ্টার নিয়ে চট্টগ্রামের উপর দিয়ে বার্মা হয়ে করাচী চলে যান। তবে নার্সদের নেয়া হয়নি। তাঁদের ফেলে রেখে যায় যার জান নিয়ে তাঁরা পালিয়েছেন ঢাকা থেকে।

জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় টঙ্গীর কাছে পাকিস্তানীদের ট্যাংকের গোলার মুখোমুখি হয়। অতঃপর তাঁরা ঢাকা-টঙ্গী পথ ছেড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে মানিকগঞ্জের পথ ধরে ঢাকা-আরিচা সড়কে গিয়ে ওঠেন। মানিকগঞ্জ-ঢাকা সড়ক ধরে তাঁরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ১৫ ডিসেম্বর রাতে। ১৬ ডিসেম্বর ভোর হওয়ার আগে তাঁরা মিরপুর ব্রীজের কাছাকাছি হলে ব্রীজের ওপার হতে ব্রীজ প্রহরারত পাকিস্তানী সৈনিকদের গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হন বলে ভোরে কলকাতায় খবর পৌঁছে। বিজয়ের মুখে ঢাকার উপকণ্ঠস্থ মিরপুর ব্রীজের কাছে পাকিস্তানীদের গোলাবর্ষণে মিত্রবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য নিহত এবং দুটি সামরিক যান পাকিস্তানীদের হস্তগত হওয়ার সংবাদে আট নম্বর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে বিজয়ের আনন্দ-উল্লাসে ভাটা পড়ে। অনেকটা শোকের ছায়া নেমে আসে বিজয়ের মুহূর্তে পরাজয়ের এই দুঃসংবাদ পেয়ে।

বেসরকারি বিশ্লেষকগণ মিরপুর ব্রীজের কাছে মিত্রবাহিনীর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেন। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এ ধরনের অশুভ ঘটনায় পাকিস্তানীদের

আত্মসমর্পণ পিছিয়ে যেতে পারে বলে বিশ্লেষকমহল খবর ছড়িয়ে দেন। আমাদের কার্যলয়ে হতাশা আর বিষাদের ছায়া নেমে আসে। সবার মুখ কালো হয়ে যায়। চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা—তা হলে এখন কি হবে? পাকিস্তানীরা কি তাহলে আত্মসমর্পণ করবে না? তারা কি তাহলে আবার নতুন করে যুদ্ধ করবে? মিত্রবাহিনী কি পিছু হটে গেছে? ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন সবার মুখে। কিন্তু কেউ কোনো সঠিক খবর বলতে পারে না। তবে যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ প্রধানমন্ত্রীর ঘরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ভেতর থেকে বের হয়ে এলে সবাই গিয়ে তাঁকে গিরে ধরে জানতে চায়, খবর কি?

খুলনার আওয়ামী লীগ নেতা সালাহউদ্দিন ইউসুফ প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে বের হয়ে এসে কৌতূহলী লোকজনকে জানালেন, আত্মসমর্পণ হবে। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার সাহেব ঢাকায় যাবেন জেনারেল অরোরার সঙ্গে। চারদিক থেকে মিত্রবাহিনী ট্যাংক নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছে। ঢাকার পতন অবশ্যম্ভাবী। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সবাই মোটামুটি আশ্বস্ত হলো। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে ১৬ ডিসেম্বর আট-নটার দিকে জানা গেলো, ঢাকা থেকে সংকেত এলেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ফ্লাই করবেন জেনারেল অরোরার সঙ্গে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার সাহেবকে রেডি হয়ে থাকার জন্যে বলা হয়েছে।

এদিকে আমাদের সিগন্যাল কোরের মেজর বাহার সাহেব ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সূত্রের বরাত দিয়ে জানান যে, গুজব ছড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। জেনারেল নাগরার অগ্রবর্তী বাহিনী পিছু হটেনি। নাগরা মিরপুর ব্রীজের কাছে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি এরই মধ্যে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং জেনারেল নিয়াজী মিরপুর ব্রীজের কাছ থেকে জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর দফতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

আমার কাছে এটাই সর্বশেষ খবর। জেনারেল নাগরা গিয়ে জেনারেল অরোরার সঙ্গে তাঁদের আত্মসমর্পণের যাবতীয় পদ্ধতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। নাগরার কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া গেলেই জেনারেল অরোরা ফ্লাই করবেন ঢাকায়। আমরা ঢাকার গ্রীন সিগন্যালের অপেক্ষায় আছি। কতক্ষণ পরপরই কৌতূহলী মানুষ ভিড় জমাতো বাহার সাহেবের রুমে পরবর্তী তাজা খবরের জন্যে।

ঢাকায় অবরুদ্ধ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা ঢাকায় শত্রুবাহিনীর মধ্যে যাওয়া খুব নিরাপদ বোধ করছিলেন না। ঢাকা থেকে বিশেষ দূত জেনারেল নাগরার গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে জেনারেল অরোরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একটি হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় রওনা হয়ে গেলেন। যুদ্ধপর্যুদস্ত পাকিস্তানী সৈন্যদের শত্রুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণের কোনো সুযোগ-সুবিধা তাদের ছিল না। অরোরার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খন্দকারও ঢাকায় গিয়েছিলেন।

॥ ষাট ॥

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে (বর্তমানে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) নিজে গিয়ে জেনারেল অরোরা, তাঁর পত্নী ও অন্যান্য সফর সঙ্গীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। নিয়াজী তাঁকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিলেন এবং করমর্দন করলেন। এছাড়া মুক্তিপাগল বিরাট বাঙালি জনতা তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এলাকায় ছুটে গিয়েছিলো মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। সেখানে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়।

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের তৎকালীন জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দীক সালিক, তাঁর লেখা *উইটনেস টু সারেন্ডার* নামক গ্রন্থে এই মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'বিজয়ী এবং বিজিত দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাশ্যে বাঙালিদের সামনে। আর বাঙালিরা অরোরার জন্যে তাদের গভীর ভালোবাসা এবং নিয়াজীর জন্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে কোনোরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে না।'

১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। কথিত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও বীরযোদ্ধা পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের এই বিরল দৃশ্য দেখার জন্যে সেদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঢাকা ও আশপাশের লাখ লাখ জনতা জমায়েত হয়েছিলো। পাকিস্তানী ইস্টার্ন কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দীক সালিক তাঁর *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইতে উল্লেখ করেছেন যে, রেসকোর্স ময়দানে সেদিন দশ লাখ লোক জমায়েত হয়েছিলো।

আমরা যারা মুজিবনগর অর্থাৎ কলকাতায় ছিলাম, তাদের সৌভাগ্য হয়নি পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের এই ঐতিহাসিক দুর্লভ দৃশ্য দেখার। আমরা কেবল কলকাতায় থেকে ছটফট ছটফট করছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকায় যাওয়ায় মাঝে মাঝে আমরা সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল—এ. কে. খন্দকারের পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখার মধ্যে দিয়েই যেন আমাদেরও ঢাকায় আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখা হয়ে গিয়েছিলো।

শুনেছি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সেদিন বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (পরে মেজর জেনারেল) ও তাঁর কিছু মুক্তিযোদ্ধা সহকর্মী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ভারতের দূরদর্শন (টেলিভিশন) থাকলে হয়তো আমরা ঢাকার এই আত্মসমর্পণের দৃশ্য কলকাতায় বসে দেখার সুযোগ পেতাম। মনে মনে ভারতকে গালমন্দ পাড়লাম তাদের দেশে টেলিভিশন চালু না করায়।

আশায় বুক বেঁধে বসে রইলাম গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খন্দকার ঢাকা থেকে ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার জন্যে। কিন্তু খন্দকার সাহেব ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভীষণ চাপা ধরনের মানুষ। তিনি কি সব কথা খুলে বলবেন, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র কি তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরবেন

ইত্যাদি ভাবনায় মন ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। ঢাকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র পাওয়ার জন্যে তবু এ. কে. খন্দকার সাহেবই একমাত্র ভরসা বলে ধরে নিয়ে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তবে শুনেছি ইস্টর্ন কমান্ডের জনসংযোগ দফতর ঢাকা থেকে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণের তাজা খবর তাদের সামরিক রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে। মাঝে মাঝে ইস্টার্ন কমান্ডে টেলিফোন করে কর্নেল রিখীর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতো। মাঝে মাঝে কর্নেল রিখী বিরক্তি প্রকাশ করে বলতেন, আচ্ছা বাছা তোমরা এত অধৈর্য হয়ে গেলে কেন? সবকিছু তো ঢাকায় ঠিকঠাক মতো হচ্ছে। তোমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ তো জেনারেল অরোরাজির সঙ্গে ঢাকায় গেছেন। তিনি ফিরে এলেই সব জানতে পারবে তাঁর কাছ থেকে।

আমাদের গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ঢাকা থেকে ফিরে এলে তাঁর কাছে শুনেছি, পাকিস্তানী সেনাপতি নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মাসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল অরোরার সম্মানে সুসজ্জিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দিয়ে গার্ড অব অনারের আয়োজন করেছিলেন।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসে পরদিন সকালে আট নম্বর থিয়েটার রোডে চায়ের টেবিলে বসে তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদুভাষ্যে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনেছিলাম। জেনারেল নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লাখ লাখ লোক ও দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। পরে ঢাকা হস্তান্তরের নিদর্শনস্বরূপ কোমর থেকে রিভলবার বের করে জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লাখ লাখ লোক পাকিস্তানীদের নিন্দাসূচক স্লোগানে গর্জে উঠেছিলো।

পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের তৎকালীন জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দীক সালিক তাঁর বিখ্যাত *উইটনেস টু সারেন্ডার* গ্রন্থে লিখেছেন, রিভলবারের সাথে জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন জেনারেল অরোরার হাতে।

আমাদের কলকাতাস্থ দফতরে বসে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারের কাছে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণের সে বিবরণ শুনছিলাম কান পেতে। কিন্তু সে সময় আমার কল্পনার নয়নে ভেসে উঠেছিলো পাকিস্তানী উদ্ধত জেনারেলের আত্মসমর্পণের অন্য এক দৃশ্য। সে দৃশ্য এ রকম :

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী নিজ কোমর থেকে রিভলবার খুলে শুধু রিভলবারই জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেননি, সে সময় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং নিজ হাতে চাঁনতারা খচিত পাকিস্তানের জুলুমের পতাকা নামিয়ে তাও লুটিয়ে দিলেন ভারতীয় শিখ সেনাপতির কাছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী রাজত্বের লাশের কফিনের ওপর যেন শেষ পেরেক মেরে দিলেন, পাকিস্তানের এই দাম্ভিক মুসলিম সেনাপতি। তিনি আত্মসমর্পণের কিছুদিন আগে ঢাকা এয়ারপোর্টে বিদেশী সাংবাদিকদেরকে দম্ভের সঙ্গে বলেছিলেন, আমি শেষ মানুষটি এবং সর্বশেষ গুলিটি নিয়ে লড়াই করবো। ঢাকার

পতন একমাত্র আমার মৃতদেহের উপরই হবে। তাঁর সেই দম্ভ ও দর্প টেকেনি। শেষ মানুষটি নয় বরং নিজেকেসহ তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী এবং শুধু তাঁর রিভলবারের শেষ গুলি নয়, বরং তাঁদের সব সামরিক সরঞ্জাম বিনা শর্তে ভারতের সেনাপতি জেনারেল অরোরার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন। শুনেছি কাঁধের সামরিক ব্যাজ ও কোমরের রিভলবার নিজ হাতে খুলে অবনত মস্তকে তুলে দেয়ার সময় জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর ওপর দিয়ে যেতে হয়নি, বরং পাকিস্তানের ট্যাংকই জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এতকালের কল্পিত শক্তি-সাহস শৌর্য-বীর্য নিমিষের মধ্যে বাংলার মাটিতে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফানুসের মতো উড়ে গেলো। এতকাল পাকিস্তানের এই কাপুরুষরাই দেশপ্রেমের ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ভারতীয় দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করার কথা বলে বাংলাদেশের সরল সহজ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্বের দম্ভ বাংলার মাটিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

জেনারেল নিয়াজী পরাজয়ের গ্লানি আর অপমানে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। জেনারেল অরোরার হাতে নিজ সামরিক ব্যাজ ও রিভলবার তুলে দেয়ার সময় তাঁর চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরেছিলো তা কি বাংলার কঠিন মাটিকে সিক্ত করতে পেরেছিলো? নয়টি মাসব্যাপী বাঙালির রক্তে যে মাটিকে পাকিস্তানীরা সিক্ত করেছিল জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর অশ্রুতে বাঙালির সেই রক্তের দাগ কি ধুয়ে মুছে যাবে? জেনারেল নিয়াজীদের চোখের অশ্রু বাঙালিদের রক্তের সেই ঋণ শোধ করতে পারবে কিনা ইতিহাস তা নির্ণয় করবে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক মিত্রবাহিনীর সৈন্য না পাওয়া পর্যন্ত ঢাকা গ্যারিসনকে মুক্তিবাহিনীর আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। ঢাকা গ্যারিসন ১৯ ডিসেম্বর বেলা এগারোটায় ক্যান্টনমেন্টের গলফ ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলো। ঢাকার বাইরের পাকিস্তানী সৈনিকদের স্থানীয় কমান্ডারদের সুবিধামতো ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে অস্ত্রসংবরণপর্ব সম্পন্ন হয়েছিলো।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা শুনে তাদের স্থানীয় অবাঙালি দোসররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। এদের অধিকাংশই বাড়িঘর ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটে যায় তাদের রক্ষক ও ত্রাতা পাকিস্তানী সৈনিকদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্যে।

এদের কেউ কেউ মুক্তিবাহিনীর লোকদের রোষানল থেকে রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে খাতির গড়ার চেষ্টা করেছিলো। তাদের ঘরের টিভি, ক্যাসেট, এমনকি রিফ্রিজারেটর ও ঘরের কার্পেটসহ দামী আসবাবপত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকদেরকে উপঢৌকন দিয়েছিলো। কলকাতায় বসে শুনেছি, পাকিস্তানী সেনা অফিসাররাও তাঁদের বাসার সব দামী আসবাবপত্র ভারতীয় সেনা অফিসারদের হাতে বিনামূল্য তুলে দিয়েছেন।

অবাঙালিরা তাদের দোকানের বিক্রির জন্যে রাখা রেডিও, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি মূল্যবান বিদেশী ইলেট্রনিক দ্রব্য ভারতীয় সেনা অফিসারদেরকে উপহার দিয়েছিললো। এসব বিদেশী জিনিসের ওপর ভারতীয় সেনাদের প্রচণ্ড লোভ ছিল। ভারতীয় সেনারা এসব উপহারসামগ্রী গাড়ি বোঝাই করে ভারতে পাঠিয়েছে নিজেদের স্বজনদের কাছে।

॥ একষট্টি ॥

কলকাতায় বসে শুনেছিলাম, অবাঙালিদের দেয়া উপহারসামগ্রীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সেনা অফিসাররা পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রও সামরিক ট্রাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দেশে। গাড়ি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম দেশান্তর করার কথা নিয়ে কলকাতায় এপার বাংলার বাঙালিদের মধ্যে গুঞ্জন চলছিলো। স্বাধীন বাংলা সরকারের কর্মকর্তাদের কানে মিত্রবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী সৈন্যদের সমর্পিত অস্ত্রশস্ত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার খবর পৌঁছেছিলো। কিন্তু মুজিবনগর সরকারের কর্ণধারগণ এসব অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর বিষয় না শোনার ভান করে থাকার কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। স্বাধীন বাংলা সরকারের কর্ণধারগণ সে সময় এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও তাঁদের মধ্যে যে এ সম্পর্কে কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি তা নয়। কিন্তু তাঁদের অবস্থা ছিল উপায় নেই গোলাম হোসেনের মতো। তবে তাঁদের আশপাশের ঘনিষ্ঠরা এসব বিষয় বা কথাবার্তাকে পাত্তা দিতেন না। হেসে উড়িয়ে দিতেন। মাঝেমধ্যে প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হলে আপ্তবাক্য উচ্চারণ করতেন। বলতেন, এরকম হবেই। এখন সমগ্র বাংলাদেশই তো ওদের হাতে। এখন এসব অভিযোগ ও সামান্য বিষয় নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করার সময় নয়; বরং আল্লাহ আল্লাহ করে দেখো কোনোমতে বাংলাদেশ পাওয়া যায় কি না। কারণ পাকিস্তানী সৈন্যরা তো আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী যারা জয় করে বা জয়ী হয় তারাই বিজিত দেশ বা দেশের যাবতীয় সম্পদ পাবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভিন্ন। তবে এর সঙ্গে নৈতিকতার বিষয় জড়িত বৈকি।

এমনি হাল্কাভাবে বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া হতো। এছাড়া আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে কি এমন অস্ত্র ছিল! তেমন কোনো ভারী ও মূল্যবান অস্ত্র ছিল না। এত অস্ত্রশস্ত্রই যদি থাকবে তাহলে আত্মসমর্পণ করলো কেন? ভালো অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সরঞ্জাম থাকলে কি আর এত সহজে আত্মসমর্পণ করতো? যা ছিল—কিছু গাদা বন্দুক, কিছু চায়নীজ থ্রি নট থ্রি রাইফেল, কিছু রকেট লাঞ্চার, কিছু মেশিনগান, সাবমেশিনগান, এলএমজি হয়তো ছিল। এসব তো ছোটখাটো অস্ত্র। এসব অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী নিচ্ছে নমুনা হিসেবে। তাদের আজীবন শত্রু পাকিস্তানীদের কাছে কি কি অস্ত্র আছে এগুলো তার নমুনা। এছাড়া এসব অস্ত্র কোথায় তৈরি তা দেখার জন্যে। এসব নিয়ে এখন তর্কবিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। শত্রুপক্ষ এখন চেষ্টা করবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে বিরোধ বাধানো এবং আমাদের স্বাধীনতা ভণ্ডুল করে দিতে। এ ধরনের উস্কানিমূলক তথ্য ও বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। চিলে কান নিয়ে গেছে—অন্যের

কাছে একথা শুনে চিলের পেছনে ছুটে যাওয়া ঠিক নয়। সরকার দেশে যাক। গিয়ে দেখবে কি কি অস্ত্র পাকিস্তানীদের কাছে ছিল এবং ভারতীয় সৈন্যরা কি কি অস্ত্র নিয়ে গেছে। যদি প্রমাণিত হয় ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে, তাহলে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার দিল্লী সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে। এখন এসব নিয়ে হৈচৈ করে কোনো লাভ হবে না; বরং দু'দেশের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হবে এবং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। শত্রুরা এতে লাভবান হবে। শত্রুরা এখন নানারকম অপপ্রচার চালিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ, এই দুই মিত্রশক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে আমাদের খবু সতর্ক থাকতে হবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সমর্পিত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার এসব কথার বিপরীতে স্বাধীন বাংলা সরকারের বেসরকারি মুখপাত্রদের এসব আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য যে দুর্বল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নিজেদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা মাত্র তা কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের এই বক্তব্য সত্য হোক—এটাই সেদিন সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু ট্রাজেডি হলো, মানুষ যা চায় সব সময় তা হয় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আগেই মালপত্র সরিয়ে নিয়ে নিরাপদে রেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ঢাকা থেকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের অপসারণ কাজ শুরু হয়। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ঢাকা থেকে নিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রাখা হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল রাও ফরমান আলী, রিয়ার এডমিরাল শরীফ ও এয়ার কমোডর ইনাম-উলসহ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ভিআইপি যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমান তেজগাঁও বিমান বন্দর ছেড়ে আকাশে ওড়ে '৭১-এর ২০ ডিসেম্বর।

॥ বাষট্টি ॥

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বন্দীশিবিরে বসে পাকিস্তানী জেনারেলদের শক্তি-সামর্থ্যের হিসেব-নিকেশ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে পাকিস্তানী সামরিক সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলো। জেনারেল নিয়াজীসহ ঢাকায় আত্মসমর্পণকারী অসংখ্য সামরিক অফিসার একান্ত মনে বসে অপেক্ষা করছেন তদন্ত কমিশনের কাছে জবাবদিহি করার জন্যে। মাঝারি পদমর্যাদার পাকিস্তানী সেনা অফিসাররাও, যাদের কোনোদিন সেনাপতি জেনারেল নিয়াজীর সামনাসামনি হওয়ার সুযোগ হয়নি কিংবা স্যালুট দেয়া ছাড়া সেনাপতির কাছে কিছু বলার সুযোগ হয়নি—শুধু চোখ বুজে নত মস্তকে হুকুম পালন করেছেন, এখন শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করায় তারা সবাই প্রায় একই পদমর্যাদার অধিকারী আর তা হলো যুদ্ধবন্দী। এছাড়া তাদের আর কোনো পদমর্যাদার পরিচিতি ছিল না। মাঝারি ও তার চেয়ে অধস্তন পদমর্যাদার সেনা অফিসারদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল—কেন নিজ দেশের ভেতরেই নিজেদের বিরুদ্ধে এই রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত কেন যুদ্ধে গ্লানিকর পরাজয় বরণ করে এখন শত্রুর হাতে বন্দী। এর জন্যে কে দায়ী? এ প্রশ্ন আগুনের ফুলকি হয়ে বন্দী পাকিস্তানী মাঝারি ও অধস্তন পদমর্যাদার সেনা অফিসারদের

মনে ধিকিধিকি জ্বলছিলো। এখন ফোর্ট উইলিয়ামের বন্দীশিবিরে সেনাপতি জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে সামনে পেয়ে তাদের পুঞ্জীভূত প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রশ্ন হয়ে জেনারেল নিয়াজীকে তীরের মতো বিদ্ধ করছিলো। বন্দী সেনা অফিসারদের প্রশ্নে জর্জরিত জেনারেল নিয়াজীরও ছিল ড্যাম কেয়ার-এর মতো অবস্থা। তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনার বিন্দুমাত্র লক্ষণ ছিল না। কারণ তাঁর অধীন বন্দী মাঝারি পদমর্যাদার সেনা অফিসারদের যত না ক্ষোভ ছিল তাঁর ওপর, তার চেয়েও বেশী বিক্ষুব্ধ ছিলেন জেনারেল নিয়াজী তাঁর পিন্ডির উর্ধ্বতন সেনানায়কদের উপর। তাঁদের এই অপমানকর পরাজয়ের জন্যে তিনি সরাসরি দায়ী করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তাঁর চারপাশের উর্ধ্বতন অফিসারদের। তাঁদের এই বিপর্যয়ের দায়িত্ব নিতে জেনারেল নিয়াজী সরাসরি অস্বীকার করেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী অধস্তন সেনা অফিসারদের কাছে।

আট নম্বর থিয়েটার রোডে বসে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী পাকিস্তানী সেনাদের সম্পর্কে প্রতিদিন নানা ধরনের মুখরোচক খবর গল্প-গুজবে পেতাম। জেনারেল নিয়াজী তাঁর অধস্তন সেনা অফিসারদের জবাবদিহিমূলক বিতর্ক এবং সওয়াল জবাব যেন তাঁদের সামনাসামনি বসেই শুনছিলাম। এক এক সময় এমন মনে হতো।

একজন ক্ষুব্ধ বন্দী সেনা অফিসার বন্দীব্যাঘ্র জেনারেল নিয়াজীর কাছে জানতে চাইছেন আপনি কখনো ইয়াহিয়া খান কিংবা জেনারেল হামিদ খানকে এ কথা জানিয়েছিলেন, যে সমরসম্ভার আপনাদের দেয়া হয়েছে তা আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্নের জন্যে যথেষ্ট নয়?

ক্ষুব্ধ নিয়াজী সরাসরি জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মারলেন— কেন, তাঁরা কি বেসামরিক ব্যক্তি? তাঁরা কি জানতেন না মাত্র তিনটি পদাতিক ডিভিশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত বিপদ মোকাবিলা সম্ভব কি না?

অধস্তন ক্ষুব্ধ এই সেনা অফিসার সাহস করে জেনারেল নিয়াজীর সামনেই মন্তব্য করলেন ব্যাপারটি যা-ই হোক, রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর রক্ষায় আপনার এই অক্ষমতা একটি কলংক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যদিও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দুর্গ রক্ষা-কৌশল সাধ্যায়ত্ত ছিল তথাপি আপনি ঢাকাকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেননি। সেখানে সৈন্যও ছিল না।

জেনারেল নিয়াজী কোনো রাখঢাক কিংবা কোনো ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি জবাব দেন এর জন্যে দায়ী রাওয়ালপিন্ডি। তাঁরা আমাকে মধ্য নভেম্বরে আটটি ব্যাটালিয়ন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পাঠিয়েছেন মাত্র পাঁচটি। বাকি তিনটি ব্যাটালিয়ন তখনও আসেনি। শুধু তাই নয়, আগে আমাকে কিছুই না জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্ট খুলে দেয়া হয়। আমি বাকি তিনটি ব্যাটালিয়ন ঢাকা রক্ষার জন্যে রাখতে চেয়েছিলাম।

সেনা অফিসার ৩ ডিসেম্বরের পর আপনি যখন জানলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কিছুই আসতে পারছে না, তখন নিজস্ব সম্পদ থেকে রিজার্ভ বাহিনী গঠন করলেন না কেন?

নিয়াজী কারণ, একই সঙ্গে সব সেক্টরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই সৈনিকদের সবখানেই নিয়োজিত রাখতে হয়েছিলো। কাউকেও অব্যাহতি দেয়ার মতো অবস্থা ছিল না।

সেনা অফিসার আপনার কাছে ঢাকায় অল্প পরিমাণ যা-ই কিছু ছিল তা দিয়ে আপনি অন্তত আর কয়েকদিনের জন্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে পারতেন।

জেনারেল নিয়াজী : কি জন্যে? সেটা আরো মৃত্যু আর ধ্বংসকেই ডেকে আনতো। ঢাকার নর্দমা আটকে যেত। রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তূপ সৃষ্টি হতো। নাগরিক-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। প্লেগ এবং অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটতো। এরপরও ফলাফল একই হতো। নব্বুই হাজার বিধবা কিংবা পাঁচ লাখ অনাথের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বরং নব্বুই হাজার জীবিত যুদ্ধবন্দীকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবো। এ আত্মত্যাগটি এর চেয়ে মূল্যবান নয়?

সেনা অফিসার শেষটা একই রকম হতো। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস ভিন্নতর হতো। সামরিক অপারেশনের ইতিহাসে সেটা একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকতো।

জেনারেল নিয়াজীর জবান বন্ধ হয়ে গেলো। একদম লা-জবাব হয়ে গেলেন তিনি। কারণ, চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারীর মতো ইতিহাস তৈরির মন-মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলা হয়নি। গণহত্যা, ধ্বংস, হিংসা, বিদ্বেষের মনমানসিকতা দিয়ে তৈরি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলংকজনক অধ্যায় সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক এবং এক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। মানবতাকে দুমড়িয়ে মারা, মানবতার মূল্যবোধকে বুটের তলায় মিশিয়ে দেয়া, হিংসাত্মক হিটলারী মূলমন্ত্র ও দর্শন দিয়ে গঠিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণহত্যাকে মহত্ত্ব মনে করা ছাড়া আর কি কাজকে মহত্ত্ব মনে করবে? দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধের পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষের মূলমন্ত্র দিয়ে দীক্ষিত সেনাবাহিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনমানসিকতায় মানবতাবোধের আলো জ্বালবে, এরকম আশা করা যেতে পারে না। অবিভক্ত ভারতকে শাসন-শোষণ এবং দাবিয়ে রাখার দীক্ষা দিয়ে বৃটিশরা সেনাবাহিনী গঠন করেছিলো একদিন ভারতে। তখন তাদের শিক্ষা ছিল মাতৃভূমির চেয়ে প্রভুভক্তি বেশি প্রয়োজনীয়। প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দাও, দাবিয়ে দাও—এটাই ছিল বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র ও দীক্ষা। আর তারই বিশ্বস্ত উত্তরাধিকারী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। হিংসা-বিদ্বেষের কালো আঁধারে আচ্ছন্ন আকাশে দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধের সূর্য উঁকি দেয়ার সুযোগ কোথায়?

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশ শুরু হয়েছিলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বন্দী শিবিরে।

॥ তিষট্টি ॥

সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে আমরাও কিন্তু পিছিয়ে থাকিনি। কলকাতা মহানগরীতেই মুজিবনগর সরকারের সদর দফতরে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ব্যর্থতা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ বিতর্ক শুরু হয়েছিলো। তবে এ বিতর্ক সরকারি পর্যায়ে ছিল না, এ বিতর্ক চলছিলো কলকাতায় আশ্রিত রাজনৈতিক মহলে; বিশেষ করে, মুক্তিবাহিনীর মহান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর কাছে কেন পরাজিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো না, জেনারেল ওসমানী কেন ঢাকায় গেলেন না—এসব কথাবার্তা

নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্কে মুজিবনগর সরকারের সদর দফতর বলতে গেলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণপর্ব শেষ হওয়ার দু'দিন পর জেনারেল ওসমানী বিক্ষুব্ধ-উত্তপ্ত মুজিবনগরে সরকারের সদর দফতরে ফিরে আসেন। ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তাঁর অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি মুজিবনগর সরকারের জন্যে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে, ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতির কারণে জেনারেল ওসমানীকে ঘিরে যেসব খবর, যেসব গুঞ্জন ও অপপ্রচার চলছিলো তা মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের জন্যে সুখকর ছিল না। এসব গুজব ও প্রচারণা ছিল তিক্ততা ও হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ। এ ধরনের হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ গুজব-গুঞ্জরন স্বাধীন বাংলা সরকারের নেতৃবৃন্দের জন্যেও এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জেনারেল ওসমানীর মুজিবনগরে অনুপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা সরকারের নেতৃবৃন্দও কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন জেনারেল সাহেবের উপর। স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতরে পা রেখে জেনারেল ওসামনী উত্তাপ কিছুটা টের পেয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে এ ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় জেনারেল ওসমানীও কম বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ হননি।

জেনারেল ওসামানীর এডিসি জেনারেল সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁকে ঘিরে কে কি মন্তব্য করেছে সব কথা তাঁর কাছে সবিস্তারে রিপোর্ট করেন। তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় জেনারেল ওসমানী রেগে আগুন হয়ে যান। পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অবহিত হওয়ার জন্যে জেনারেল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান তাঁর কক্ষে। আমার জন্যে এটা ছিল এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর অবস্থা। কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলি। এমনই দমফাটা অস্বস্তি নিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতেই জেনারেল সাহেব তাঁর কোটর থেকে দুটি বড় বড় চোখ বের করে আমার উপর তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, দেখুন পিআরও সাহেব, সময় খুবই খারাপ এখন। আমাকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার নেই। আপনার কোনো মতামত কিংবা কোনো বাড়তি শব্দ যোগ না করে আমার অনুপস্থিতিতে এখানে কি ঘটেছে তা আপনার কাছে জানতে চাই।

খুব ধীরস্থির হয়ে বসে জেনারেল ওসমানীকে জানালাম, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আপনার অনুপস্থিতি নিয়ে এখানে আমাদের রাজনৈতিক মহলে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। নানারকম গুজব ও বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করা হয়েছে। গুজব প্রচার করা হয়েছে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করুক, এটা আপনি চাননি। আপনি চেয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীর কাছে তারা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু দিল্লীর চাপে স্বাধীন বাংলা সরকার বাধ্য হন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণে রাজী হতে। এতে রাগ করে আপনি মুজিবনগর ছেড়ে চলে গেছেন। স্বাধীন বাংলা সরকারের কোনো কোনো নেতা মনে করেন, এ সময় মুজিবনগরে আপনার অনুপস্থিতির কারণে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর গুজব ও অপপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মুজিবনগরে আপনার উপস্থিতিই সব গুজব

ও অপপ্রচারের জবাব হতে পারতো, ইত্যাদি। তাহলে সরকারকে এমন বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো না।

এতক্ষণ আমার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনে ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা টেনে জেনারেল ওসমানী কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, দেখুন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখ হলো স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে কোনো চেতনা এখনও জন্ম হয়নি। আমাকে নিয়ে রিউমার ছড়ানোর সুযোগটা কোথায়? কোনো সুযোগ নেই। তার অনেক কারণ রয়েছে। নাম্বার ওয়ান পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করবে তা আমি আগে জানতাম না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এসেছে।

নাম্বার টু ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, এই সশস্ত্র যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের অধীনে হলেও যুদ্ধের অপারেটিং পার্টের পুরো কমান্ডে ছিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল শ্যাম মানেকশ। সত্য কথা আমি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানও নই। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। কারণ বাংলাদেশ জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ নয়।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল মানেকশকে রিপ্রেজেন্ট করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল মানেকশ গেলে তাঁর সঙ্গে আমার যাওয়ার প্রশ্ন উঠতো। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আমার অবস্থান জেনারেল মানেকশর সমান। সেখানে জেনারেল মানেকশর অধীনস্থ আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার সফরসঙ্গী আমি হতে পারি না। এটা কোনো দেমাগের কথা নয়—এটা প্রটোকলের ব্যাপার। আমি দুঃখিত, আমাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আত্ম-মর্যদাবোধের বড় অভাব।

ঢাকায় ভারতীয় বাহিনী আমার কমান্ডে নয়। জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল অরোরার কমান্ডের অধীন ঢাকার ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে যৌথ কমান্ডের অধীনে ভারতীয় বাহিনীর কাছে। আমি সেখানে (ঢাকায়) যাবো কি জেনারেল অরোরার পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখার জন্যে? হাও ক্যান!

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করবেন জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আর পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে জেনারেল নিয়াজী। এখানে আমার ভূমিকা কি? খামোখা আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে।

জেনারেল ওসমানী বললেন, প্রটোকল সম্পর্কে আমাদের লোকদের কোনো ধারণা নেই, তাই এই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। লোকজনকে এ সম্পর্কে আপনারা কিছু বুঝিয়ে বলুন। দেখবেন লোকজন এ সব বুঝলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সত্যি কথা বলতে কি, সামরিক রীতিনীতি, প্রটোকল ইত্যাদি ব্যাপার-স্যাপারে আমার নিজেরই কোনো ধারণা ছিল না। না বুঝে কথা বলে আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ি এ ভাবনা সব সময়ই মনের কোণে বিরাজ করতো সক্রিয়ভাবে। তাই এসব ব্যাপারে

চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম। জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে প্রটোকল সম্পর্কে ব্যাখ্যা শুনে মোটামুটি একটি ধারণা পেলাম।

জেনারেল সাহেবকে আরও জানিয়ে ছিলাম যে, পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিবাহিনীর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে কেন আত্মসমর্পণ করেছে এটা নিয়েও প্রশ্ন এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালিরা চায় পরাজিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালির বীর সন্ত ান মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক।

এ সময় সিলেটের আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী জেনারেল সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি আমার কথা শুনতে পেয়ে আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন। দেওয়ান সাহেব বললেন, পিআরও সাহেব ঠিকই কইছুন। মানুষ চায় পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করুক।

জেনারেল সাহেব দেওয়ান ফরিদ গাজীর উপর তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর উদ্দেশে বললেন, তোমরা লোকজনকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছো। দুনিয়ার রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষকে কিছু জানতে দাও।

তিনি বললেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেভা কনভেনশনের আন্তর্জাতিক নীতিমালা আছে। জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি ব্যাপারে এ নীতিমালা মানতে বাধ্য। আমরা, মানে বাংলাদেশ জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নই। এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাই বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হবে না। কারণ তাদের ধারণা, আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমরা তাদের সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী আচরণ করবো না। যেহেতু আমরা জেনেভা কনভেনশনের আওতায় পড়ি না, তাই জেনেভা কনভেনশনের নীতিমালা মানতে আমরা বাধ্যও নই। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী পরাজিত আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদেরকে হত্যা করা কিংবা কোনো রূপ নির্যাতন করা যায় না। তাদের নিরাপত্তা আইনি প্রটেকশন দিতে হয়, সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এবং উন্নত খাবার-দাবারসহ নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। বন্দীকালীন সময়ে নিরস্ত্র অবস্থায় এক্সারসাইজ, খেলাধুলা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। কিন্তু আমরা তো এখনও ভারতের মাটিতেই রয়ে গেছি। বাংলাদেশই তো এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণের পর এখন বাংলাদেশ কার্যত ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। আমাদের কোনো সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো নিয়মিত সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী নেই। ক্যান্টনমেন্টগুলো কি অবস্থায় আছে তা আমরা কিছুই জানি না। এমন কি, পুলিশ বাহিনীও তো নেই। দেশে গিয়ে পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন, নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন এবং সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন গঠন করতে হবে। এ সম্পর্কে আইন-কানুন নীতিমালা তৈরি করতে হবে। আইন-আদালত, কোর্ট-কাচারী, ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে হবে। এই অবস্থায় নব্বুই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমরা তাদেরকে রাখবো কোথায়? তাদেরকে প্রটেকশন দেবো কিভাবে? এ নব্বুই হাজার পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে সামরিক রীতিনীতি

অনুযায়ী তিন বেলা উন্নতমানের খাবার-দাবার দেবো কোথা থেকে? দেশে গিয়ে তো আমরাই খাবার পাবো না। সরকারি গুদামে চাল-ডাল তো বোধ হয় কিছুই নেই। ব্যাংকগুলো হয়তো শূন্য হয়ে আছে। দেশে রাস্তাঘাট নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ব্রীজ-কালভার্ট সব তো ধ্বংস করা হয়েছ। রেল কমিউনিকেশন সম্পূর্ণ ডিজপারেড হয়ে গেছে। বললেই হলো, কেন পাকিস্তানী সৈন্য আমাদের কাছে আত্মসমপর্ণ করলো না? এটা খামখেয়ালীর বিষয় নাকি? স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্বের সঙ্গে সব কিছু চিন্তা করতে হবে।

দেশে ওষুধপত্র, চিকিৎসাসামগ্রী কিছুই তো নেই। নিয়মিত আটক যুদ্ধবন্দীদের হেলথ চেকআপ করতে হবে। এসব আমরা করবো কিভাবে? ব্যারাক ম্যানেজমেন্টই করতে পারবো না। আমাদের সুসংগঠিত লোকবল নেই। এ সময় ভারত এই নব্বুই হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে বরং ভালোই করেছে। আমরা বড় রকমের দায়দায়িত্ব অর্থাৎ ন্যায়নীতি থেকে বাঁচলাম। আমাদের দেশে গিয়েই হয়তো ভারতের কাছে হাত পাততে হবে খাদ্য ও অর্থের জন্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যও সব বন্ধ।

দেওয়ান ফরিদ গাজী বললেন, নব্বুই হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করায় এবং ভারত তাদেরকে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়ায় এর বিনিময়ে ভারত হয়তো পাকিস্তানের কাছ থেকে ফায়দা আদায় করবে।

জেনারেল ওসমানী রাগে গড়গড় করে দেওয়ান ফরিদ গাজীর উদ্দেশে বললেন, ভারত পাকিস্তানী সৈন্যকে জবাই করে তাদের গোশত খাক। তাতে আমাদের কি আসে যায়? আমাদের দেশে গিয়ে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন খাড়া করতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত বিদায় করে দিয়ে দেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি না পেলে আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও আমদানী-রফতানী ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্যে স্ট্রং ডিপ্লোমেটিক লবিং করতে হবে। দেশে সবকিছু নতুন করে গঠন করতে হবে। আমাদেরকে এসব নিয়ে দিনরাত কাজ করতে হবে, ব্যস্ত থাকতে হবে। পাকিস্তানী আটক মেহমানদের খেদমত করার সময় ও সুযোগ কোথায় আমাদের? ভারত তাদের দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে বরং আমাদেরকে বিরাট বোঝার চাপ থেকে রেহাই দিয়েছে। খামখা বাড়তি ঝামেলা। আমাদের এখন এসবের সময় নেই। নিয়মিত সেনাবাহিনীর গঠন করতে হবে। ক্যান্টনমেন্টগুলো পরিষ্কার করে সৈনিকদের বাসোপযোগী করে তুলতে হবে। ক্যান্টনমেন্টগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বিধিবিধান তৈরি করতে হবে।

যুদ্ধে মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। এসব লাঘব করতে হবে। দেশে প্রবল হাহাকার সৃষ্টি হবে। এই হাহাকার কিভাবে দূর করা যাবে—তা নিয়ে ভাবতে হবে। ভারত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে কি স্বার্থ হাসিল করবে সেটা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান গিয়ে ভাবুক। এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই। আমাদের চিন্তা-ভাবনা এখন একটিই। আর সেটা হলো তাড়াতাড়ি ভারতীয় বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত পাঠানো এবং দেশের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করা। তা না হলে

স্বাধীনতার পূর্ণতা অর্জিত হবে না। বেশি দিন ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করলে আমাদের সোসিওইকোনমিক অবস্থার বড় রকমের ক্ষতি হবে। যা কোনোদিন পূরণ হবার নয়।

তোমরা রাজনৈতিক নেতা। তোমরা জনগণকে সব কথা বুঝিয়ে বলো। জনগণকে মটিভেট করো। ভারত পাকিস্তানী সৈন্যদের হাড়-মাংস চিবিয়ে খাক, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের ক্ষতি হবে ভারতীয় বাহিনী বেশিদিন বাংলাদেশে থাকলে। কাজেই আমাদেরকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে ভারতীয় বাহিনী তাড়াতাড়ি প্রত্যাহৃত হয়। তা না হলে দীর্ঘ ২৫ বছরের সংগ্রাম, নয় মাসের যুদ্ধ, সব ত্যাগ-তিতিক্ষা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের হাড়-মাংস খেতে চাই না। আমরা চাই ভারতীয় বাহিনী তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ থেকে উইথড্র করুক। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করি। মনে করো না যে আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। মোটেই কিন্তু তা নয় এখনও। এক দেশের সৈন্যের পরিবর্তে এখন আরেক দেশের অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যের দখলে চলে গেছে বাংলাদেশ। যেদিন একটি ভারতীয় সৈন্যও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে থাকবে না, সেদিনই আমরা পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন হবো—স্বাধীনতার তৃপ্তি পাব।

॥ চৌষট্টি ॥

দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো। পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো, ভারতীয় বাহিনীও বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু আমাদের বিরোধ-বিতর্কের শেষ হলো না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পান থেকে চুন খসলেই আমরা যারা এটা নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছি, তোলপাড় করেছি বিদেশের মাটিতে বসে, তাদের অনেকে একথা মনে করতে পারিনি, কিংবা মনে করিনি যে, এটা কোনো সাধারণ যুদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠিত দেশের ও সুসংগঠিত সরকারের অধীন কোনো সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত, শক্তিশালী ও বিত্তশালী দেশের সুসংগঠিত সুদক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংগঠিত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ বেসামরিক লোকের এক অপরিকল্পিত যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নিরুপায় অসহায় মানুষের শেষ অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার শেষ কৌশল বা প্রয়াস। পার্শ্ববর্তী একটি বৃহৎশক্তির আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার এক দুঃসাহসিক প্রয়াস ছিল মুক্তিযুদ্ধ। না ছিল অস্ত্র, না ছিল অর্থ, না ছিল বহির্বিশ্বের সক্রিয় সমর্থন। অস্ত্র চালনার ট্রেনিংও ছিল না। সম্বল ছিল স্বাধীনতা ও মুক্তির এক দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, তীব্র বাসনা, সবার জীবন দেয়ার এক উদগ্র নেশা। যায় যাক জীবন যাক, তবু দেশ মুক্ত করবো—এই অগ্নিশপথই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রাণশক্তি। আর সম্বলের মধ্যে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আসা কিছুসংখ্যক বাঙালি ইপিআর-এর কিছু বাঙালি জওয়ান আর কিছু পুলিশ বাহিনীর লোক। তাদের হাতে ছিল সীমিত সংখ্যক গাদা বন্দুক, থ্রীনট থ্রী রাইফেল। কয়েকটি মেশিনগান, এসএমজি, এলএমজি ইত্যাদি সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেটা ছিল সেটা ছিল জনসমর্থন।

হাতের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে যা পাওয়া গিয়েছিলো তাই নিয়ে আমাদের লড়াই মুক্তিযুদ্ধ। জনগণ অকাতরে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই সম্বল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। এরপর পাওয়া গিয়েছিলো ভারতের সাহায্য ও সমর্থন। সহজ কথায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার শেষ প্রয়াসের নাম ছিল মুক্তিযুদ্ধ। আজ স্বাধীন দেশে মুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে বসে মুক্তিযুদ্ধের কিংবা যুদ্ধ পরিচালনাকারী নেতাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি আবিষ্কার করে সমালোচনা করা সহজ। মুক্তিযুদ্ধ সঠিক হয়েছে না বেঠিক হয়েছে, ভুল হয়েছে না শুদ্ধ হয়েছে—এ প্রশ্নের অবকাশ ছিল না তখন। প্রশ্ন ছিল মাত্র একটিই, সেটা আমরা বেঁচে থাকবো না মরবো। প্রশ্ন ছিল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকতে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবো কি না—এটাই ছিল সেদিন বড় চ্যালেঞ্জ। এটাই ছিল সেদিন বড় প্রশ্ন। নিজেদের যোগ্যতার প্রশ্ন ছিল সেদিন।

লাখো মানুষের রক্তের সাগর ছাপিয়ে একটি নতুন ভূখণ্ড জেগে উঠেছে—তার নাম বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন দেশের চিত্র স্থান পেয়েছে–উদ্ভব হয়েছে এক নতুন জাতির—তার নাম বাঙালি জাতি। এটাই তো ঐতিহাসিক সত্য। ভুলভ্রান্তি, অশুদ্ধ কিছু হলে তো এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। যারা সেদিন দূরে থেকে সমালোচনা করেছে এবং নতুন নতুন প্রশ্নও সৃষ্টি করেছে, বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্ট করেছে—তারা কিন্তু সেদিন তাদের এত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নিয়ে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই এ বিতর্ক ও বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিলো। এমন কি, আল্লাহর আদম সৃষ্টি নিয়েও ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলো এবং তারা আল্লাহর আদম সৃষ্টি মেনে নেয়নি। এ জন্যে আল্লাহ এসব অবাধ্য ফেরেশতাকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করে ত্যাগ করেছেন। আল্লাহর দুনিয়ায় তারা শয়তান হয়েই থাকবে। মানুষের মধ্যে বিভেদ, ভুল বোঝাবুঝি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী শয়তানেরা তেমনি—বাংলাদেশের সৃষ্টি তথা মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও নানারকম প্রশ্ন, বিতর্ক ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এ বিতর্কের কোনোদিন শেষ হবে না। তবে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন দেশ ও একটি নতুন জাতি হিসেবে সকলকে ভুল ভাঙ্গাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করবে। এসব বিতর্ক ও সব প্রশ্নের নিখুঁত জবাব জীবন্ত সত্য এই বাংলাদেশ—এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ও ভুল-ভ্রান্তি আবর্জনাকে রক্তের সাগরে ডুবিয়ে জেগে উঠেছে এক রক্তিম সূর্য বাংলাদেশ। এটাই পরম সত্য ও বাস্তবতা হিসেবে সব প্রশ্নের ও বিতর্কের জবাব দেবে অনন্তকাল। সুযোগ, সঠিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের পিরামিড হয়ে থাকবে এই বাংলাদেশ। বাঙালির পরম কামনার ধন বাংলাদেশ।